আমার ছবি • খুদে প্রতিভা • আমার ইচ্ছেমতো

আনন্দমেলা

বিশেষ গল্প সংখ্যা

দু'টি উপন্যাস

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্রলেখা দাশ

চারটি জমজমাট গল্প

তিলোত্তমা মজুমদার

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

বাসুদেব মালাকর

জয় সেনগুপ্ত

অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

সত্যজিৎ রায়ের কাহিনি নিয়ে সম্পূর্ণ শঙ্কু কমিক্‌স
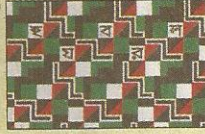
মহাকাশের দূত

বিশেষ গল্প সংখ্যা

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ শঙ্কু কমিকস ৫৩
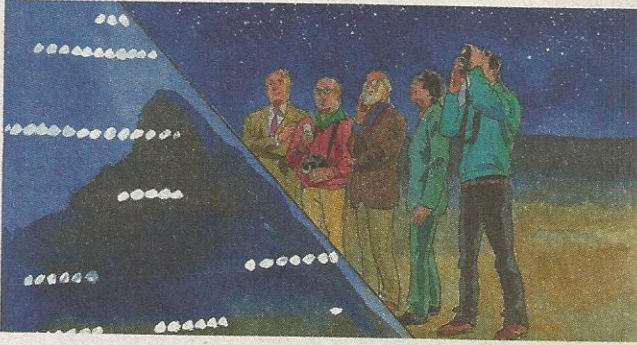
মহাকাশের দূত

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

পটভূমি মিশর। পাঁচ হাজার বছর আগে পাওয়া এক প্যাপাইরাসে অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এতে বলা হয়েছে টেলিভিশন, কম্পিউটারের বর্ণনা। রয়েছে ভিনগ্রহীদের পৃথিবীতে আসার কথাও। সেই প্যাপাইরাসটার কথা জানতে পারল শঙ্কু। এর পর জমে উঠল আসল ঘটনা। কীরকম?

দু'টি টানটান উপন্যাস

রহস্যে অতীতের ধ্বনি
সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ১৪

কসবার এক ফ্ল্যাটে খুন হয়ে পড়ে রয়েছে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। সে কে, কীভাবে ফ্ল্যাটের ভিতর ঢুকল, কেউ জানে না। রহস্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন দীপকাকু। এবার কোথায় পাড়ি দিলেন তাঁরা?

অপারেশন সুরলহরী
চিত্রলেখা দাশ ১১৪

একটি বাংলা চ্যানেলে গানের প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী টাবুন। হঠাৎই সে নিরুদ্দেশ হয়। সবাই হতবাক। কোথায়, কেনই বা উধাও হল সে। কীভাবে শেষ পর্যন্ত তার খোঁজ মিলল?

সূচিপত্র

জমজমাট চারটি গল্প

নিয়মিত বিভাগ

দাম: পঞ্চাশ টাকা

প্রচ্ছদ: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে
প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড কলকাতা ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর দশ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

৫ জানুয়ারি ২০১৬

আমার কুইজ়

এখানে ছ'টি প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এই সংখ্যারই লেখার মধ্যে। বাকি ছ'টি তোমাদের সাধারণজ্ঞানের পরীক্ষা।

1 প্রথম আকাশে উড়েছিল কোন প্রাণী?

2 ১৯৬৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শতবার্ষিকী বছরে সত্যজিৎ রায় ছবিটা করার কথা ভাবেন। এটা কোন ছবি ?

8 '... সেই সঙ্গে এল দু'হাজার যোলো/ যিশুর দু'হাজার পনেরোটা বছর পূর্ণ হল।' বলতে পার ছড়ার এই লাইনদুটো কোথা থেকে নেওয়া? কার লেখা?

9 ঐতিহাসিক হাম্পি শহর বর্তমানে ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?

10 বিরামপুরের পক্ষীরাজ গল্পে পক্ষীরাজ ছাড়া আর-একটি ঘোড়ার কথা আছে। তার নাম কী?

11 গোয়েন্দা দীপকাকুর ভাল নাম কী?

12 সম্প্রতি শেষ হওয়া আই এস এল টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পেয়েছেন কোন দলের কোন খেলোয়াড়?

সুদেষ্ণা বসু

3 আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন একজন রসায়নবিদ। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' ওষুধের সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা জিনিস তৈরি করত, যা বাঙালির প্রিয় পানীয়। সেটা কী?
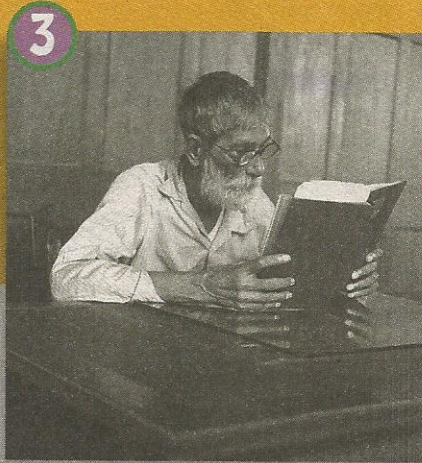
4 দেখতে অনেকটা ছোট্ট টিয়ার মতো। রঙের বাহারই এদের মূল আকর্ষণ। কোন পাখি?

5 বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন শব্দের কাঁপুনি সেকেন্ডে কতবারের কম হলে মানুষ আর তা কানে শুনতে পায় না? কতবার?

6 ক্রিকেটের সম্রাট সচিন তেন্ডুলকরের টেস্ট অভিষেক হয় পাকিস্তানে, মাত্র ১৬ বছর বয়সে। কোন সালের, কোন তারিখে এই খেলা হয়েছিল?

7 'রবিবার সকালবেলা পড়ে উঠে দাবার বোর্ড সামনে পেলে আমি সবচেয়ে খুব খুশি হই'। এমন কথা কে বলেছিল? কেন সে খুশি হয়?

৫ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

১. 'সখা' ও 'মুকুল'।
২. মধুচন্দ্রা চক্রবর্তী।
৩. বসন্ত আর শরৎ।
৪. ২০ বছর বয়সে।
৫. মদনমোহন তর্কালঙ্কার।
৬. 'ঘন্টুদার আবিষ্কার' গল্পের ঘন্টুদার কথা।
৭. ময়ূর, ভারতের জাতীয় পাখি।
৮. ইল।
৯. দু'আনা।
১০. মেরি।
১১. নাগাল্যান্ড।
১২. সাতকড়ি সান্যাল, জগবন্ধু চাকলাদার, নরেন চক্কোত্তি।

সঠিক উত্তরদাতা

অনুষ্কা দত্ত
সপ্তম শ্রেণি, *বি ডি এম ইন্টারন্যাশনা[ল]* *গড়িয়া।*

উত্তর পাঠাও ১৩ জানুয়ারির মধ্যে। আমাদের ঠিকানা 'আনন্দমেলা আমাদের কুইজ়' বিভাগ। ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
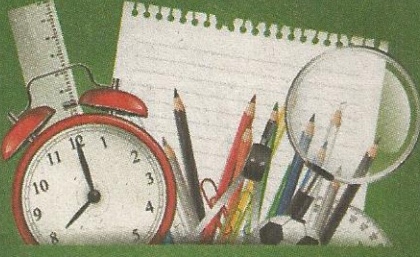
বেগম রোকেয়া স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়

সল্টলেকের সি জে ব্লকে এই স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ছাত্রীদের পছন্দের অন্যান্য বিষয় নিয়েও সমান যত্নবান দিদিমণিরা। লিখেছেন **জয়দীপ চক্রবর্তী**

সল্টলেকের সি জে ব্লকের উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা বাড়ি। বলে না দিলে, বোঝা যাবে না এখানে এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশে একটা সম্পূর্ণ সরকারি স্কুল রয়েছে। প্রি-প্রাইমারি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ানো হয় এখানে। প্রাইমারি বিভাগ সকালে। ফাইভ থেকে উচ্চমাধ্যমিক দুপুরে। ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৭৫০। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুমিত্রা সেনগুপ্ত জানালেন, "২০০০ সালে আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। সমাজ সংস্কারক এবং সাহিত্যিক বেগম রোকেয়ার নামে এই স্কুলের নাম রাখা হয়।"

স্কুলের লেখাপড়ার মান খুবই ভাল। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে সকলেই ভাল-ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করে। গত বছর মাধ্যমিকে, বিধাননগর সাব ডিভিশনে মেয়েদের মধ্যে প্রথম (নেহা বিশ্বাস), দ্বিতীয় (নাতাশা ঘোষ এবং অঙ্কিতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং তৃতীয় (কেয়া বিশ্বাস) হয়েছে এই স্কুলেরই চারজন ছাত্রী। কোনও ছাত্রী ফেল করেনি। রেজ়াল্ট দেখেই বোঝা যায়, দিদিমণিরা স্কুলের পঠনপাঠনের দিকে কতটা যত্নবান। এখানে ডিসিপ্লিনের কড়াকড়ি আছে, বাড়াবাড়ি নেই। প্রচারের আলো থেকেও নিজেকে সরিয়ে রাখে এই স্কুল।

সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ হোক বা কুইজ়, গানের প্রতিযোগিতা বা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সবেতেই স্কুলের ছাত্রীদের সেরার শিরোপা পেতে সাহায্য করেছেন দিদিমণিরা। ২০১৫ সালে রাজ্যস্তরের যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্রী মৌমিতা দাস দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। শীতকালে পিকনিক করতে যাওয়া, শেক্সপিয়ারের জন্মদিন 'ইংলিশ ডে' হিসেব পালন করা হয় এই স্কুলে। দিদিমণিদের উৎসাহ আর সাহায্য ছাড়া এসব কি সম্ভব?

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা এবং ইংরেজি নাটক, নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করে ছাত্রীরা। আর স্পোর্টস তো আছেই। 'ডিজ়াস্টার্স ম্যানেজমেন্ট' ট্রেনিংও করা আছে স্কুলের ছাত্রী এবং শিক্ষিকাদের। এখন ক্যারাটে ট্রেনিং শুরু হয়েছে। এক কথায়, স্কুলজীবনের সব না-ভুলে যাওয়া মুহূর্তগুলো যেন আপন নিয়মেই বয়ে চলেছে এই স্কুলে।

ফোটো: জয়দীপ চক্রবর্তী
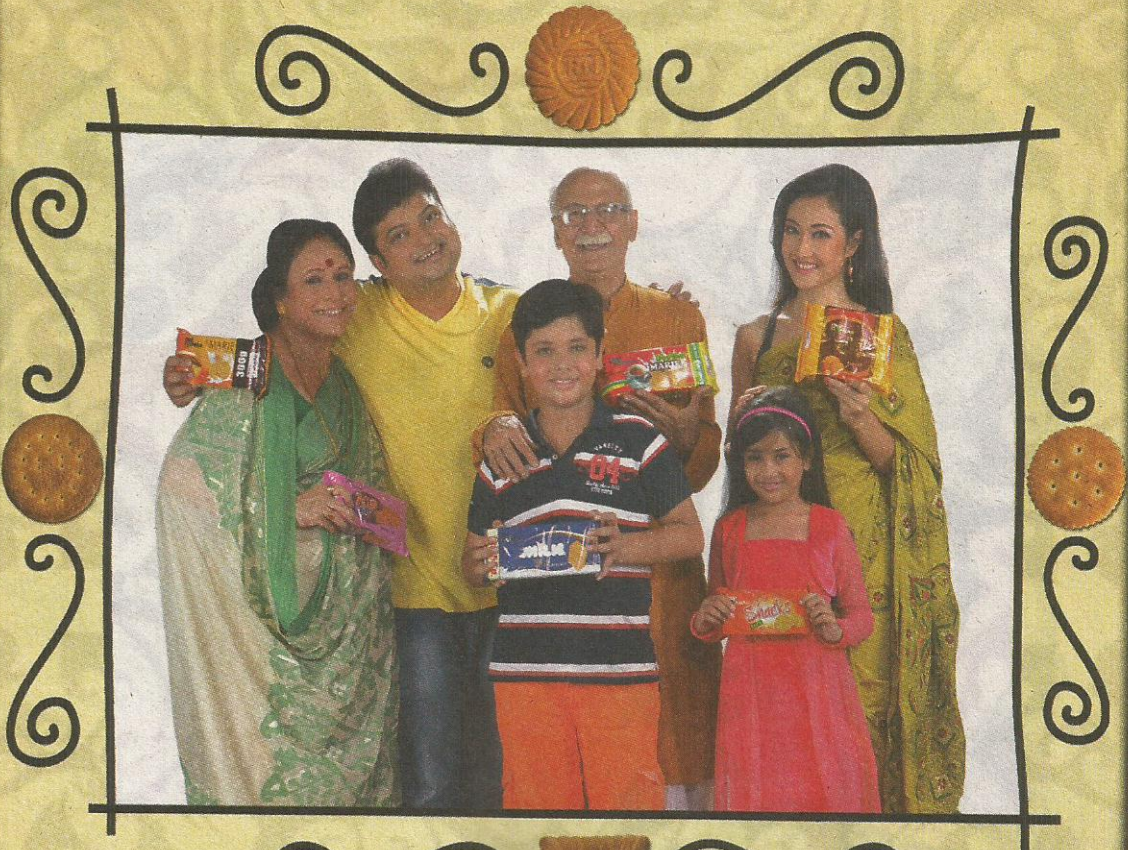
ওরা ও চোরুদা

তিলোত্তমা মজুমদার

ঘোতন, বিশু, পানু, বাপ্পা, অরুণ লামা, মদনা, সকলেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেল। স্টেশনপট্টির গুটলে-বিটলেও তাদের সঙ্গে একই ক্লাসে। আর-এক সপ্তাহ পরে ক্লাস শুরু। সবারই বই, খাতা কেনা হয়ে গিয়েছে। কালীদি, মিলিদি শিখিয়ে দেবে কী করে বইয়ে মলাট দিতে হয় আর দিস্তে কাগজ সেলাই করে পছন্দমতো সাইজের খাতা বানানো যায়।

বড়বঙ্কা বলে দিয়েছে, প্রথম কয়েকদিন ইস্কুলে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকতেই হবে। খাতা, বই সব যেন নিখুঁত মলাট দেওয়া থাকে। আর মলাটে যেন সিনেমার নায়কের ছবি না থাকে। উঃ যা শাস্তি

জুটবে না তা হলে!

বিটলে বিশু ফিচেল হেসে বলল, "সেসব কালীদি, মিলিদি শেখাবে। তুই বলার কে? ফেল্টুস। ল্যাদাভুজ। ল্যাগব্যাগে লম্বা। রবিবার ভাত খায়, দুধ খায় সোমবার।"

"যা-যা দেখব তোরা কত পাশ করিস।"

বড়বঙ্কা এবারেও ফেল। নীলু, ঘন্টু সিংহ, ছোটবঙ্কা, বুধু পাশ করে চতুর্থ শ্রেণিতে উঠে গেল। এই ইশকুলে আর ভাল লাগে না বড়বঙ্কার। কিন্তু মালখানপুরে এই একটিই প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর এখানকার হেডমাস্টারমশাই খুব কড়া মানুষ। বাবা-মায়েরা তাঁর হাতে বাচ্চাদের সঁপে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত। ল্যাংড়াপানুর কথা ভেবে বড়বঙ্কার খুব দুঃখ হয়। হেডমাস্টারমশাই আবার পানুর দাদু। এমন একজন কড়া দাদু বাড়িতে থাকলে না জানি কী কষ্ট! কিন্তু পানু দিব্যি আছে। প্রায়ই সর্দি হয়, তখন নাক দিয়ে ফোঁটা গড়িয়ে নামে, আর পায়ে ঘা। সব নিয়ে আনন্দেই থাকে।

পরীক্ষার ফল বেরনোর দিন সকাল থেকে বেলতলায় ঠাকুরমার গোল পাথরের শিবে কতবার পেন্নাম ঠুকল, তবু হেডমাস্টারমশাই তার নাকের ডগায় পরীক্ষার ফলাফল লেখা নীলচে বইখানি নাচাতে-নাচাতে বললেন, "কী? আজীবন তৃতীয় শ্রেণিতেই থাইক্যা যাইবা? নড়বা না? আর কয়দিন পর তো গোঁফ উঠব, তহনও থ্রি? বাপের ফ্রি হোটেল পাইছ, ল্যাখাপড়া আর ভাল্লাগে না? খালি আওন, যাওন আর খাওন। বই বগলে আহে আর যায়। ফাইনালি কইয়া দিলাম, এই বৎসর লাস্ট চান্স।"

আড়াল বলে কিছু নেই। ইশকুলে যা হয় সব খোলাখুলি। বড়বঙ্কা না দেখেও বলে দিতে পারে তার দুর্দশা দেখে সহপাঠী বন্ধুরা ঠ্যাং দুলিয়ে ফিকফিক করে হাসছে। তার চোখ দিয়ে টুপটুপ জল পড়তে লাগল। পাশ করার জন্য কত চেষ্টাই না করেছে। শুধু তো বেলতলার শিব নয়, বাগানে আপনাআপনি গজিয়ে ওঠা ফণীমনসা গাছের কাছেও কম দরবার করেনি। মনসা জাগ্রত দেবী। প্রতি বছর ঘটা করে পুজো হয়। পাঁচমাথাওয়ালা সাপের মূর্তি। 'শ্রাবণ মাসে যে পূজে দেবী মা মনসা/ ধনে, জনে, সুখে ভরা থাকে তার বাসা।'

কোথায় সুখ? বড়বঙ্কার বেলায় সব লবডঙ্কা।

একদিন কাঁটাওয়ালা গাছটার কাছে সে যখন নতজানু, চোরুদা যাচ্ছিলেন সাইকেল চেপে। বললেন, "কী রে, পাশ করিয়ে দিতে বললি?"

সে ভারী অবাক। চোরুদা কী করে জানলেন!

"আমারও একদিন তোর মতো বয়স ছিল। লেখাপড়ায় ফাঁকি দিলে ভগবান খুব রাগ করে কিন্তু। মন দিয়ে পড়েছিস তো এবার?"

"মন দিয়েই তো পড়ি, কিছুতেই মনে থাকে না।"

"মন দিয়ে পড়লেই পাশ।"

সে তো সবাই বলে। কিন্তু পড়তে বসলেই তার কান কটকট করে, হাই ওঠে, খিদে পায়। পোষা বিড়াল টুম্পার সঙ্গে খুনসুটি করতে ইচ্ছে করে। একথা জানে টুম্পা আর বড়পিসিমা। পরীক্ষার বিফলতা হাতে ক্রুদ্ধ হেডমাস্টারমশাইয়ের সামনে ভয়ে কাঁদতে-কাঁদতে আর কাঁপতে-কাঁপতেও তার মনে হচ্ছিল বড়পিসিমা যদি হেডমাস্টারমশাই হতেন। প্রধান শিক্ষকসুলভ মোটা গোঁফওয়ালা বড়পিসিমা কেবল আচার, পাঁপড়, বড়ি আর মোরব্বা নিয়ে মেতে থাকতেন! চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা তো আছেই, কিন্তু মনটা মোরব্বার মতো নরম আর মিষ্টি।

সেদিন বাড়ি ফিরে, ফেল করার লজ্জায় ভাতের থালায় প্রায় মাথা ঠেকিয়ে আহার করল সে। তারপর দক্ষিণে দোতলার বারান্দায় বড়পিসিমার গা ঘেঁষে বসে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল। আঁচলের কোণ মুখে পুরে চিবোচ্ছে।

পিসিমা বললেন, "আহা দ্যাখো মুখ শুকনো করে আছে। লজ্জা কী! ছেলেবেলায় অনেকেই ফেল করে।"

"পিসিমা, ভগবান কি সত্যিই আছে?"

"ভগবানই জানেন।"

"বলো না, তুমি তো জান।"

"কখনও মনে হয় জানি, এই তো তাঁকে দেখলাম। কখনও মনে হয় ভুল দেখলাম বুঝি।"

"সে তো ভূত। এই আছে, এই নেই।"

"তা ঠিক। সব মানুষ, সব প্রাণীর মধ্যে ভগবান আছেন, এমনটাই ভাবতে হয়।"

"ফণীমনসা গাছে?"

"হুঁ! কণ্টকরূপেণ সংস্থিতা। কাঁটার মধ্যে ভগবান, ভুল করেছ কী খোঁচা খাবে।"

"হি হি হি! পায়েও ফুটে যাবে, তখন সেট্টিপিন দিয়ে বের করতে হবে।"

"সেট্টিপিন না বাবু, ওটা সেফটিপিন। আয়, একটু চেখে দ্যাখ নতুন আচার করেছি।"

"পিসিমা, তুমি আমাদের হেডমাস্টারমশাই হলে কী ভাল হত!"

"কী হত বল দেখি?"

"পাশফেল কিছু থাকত না। পড়লেও হয়, না পড়লেও। শুধু খেলা, শুধু মজা, বছর ঘুরলেই নতুন ক্লাস।"

"তা হলে ইশকুল তুলে দিলেই হয়। আমার বাপু মাস্টারি একদম ভাল্লাগে না।"

"না-না! ইশকুল থাক! মাস্টারের দরকার নেই।"

এসব কথা কেবল বড়পিসিমাকেই বলা যায়। বাড়ির আর সব্বাই রাগে-দুঃখে আছেন। সকলেই জানেন বড়বঙ্কার ভবিষ্যৎ নিরতিশয় অন্ধকারে ডুবে আছে। কী করে তা সম্ভব, বড়বঙ্কা বুঝতে পারে না। শুধু ঠাকুরমা বলেন যে, যেখানে যাই হোক না কেন, চন্দ্রসুয্যি উঠবেই। সূর্য উঠলে আবার অন্ধকার কীসের?

কুহু কুহু কোকিল ডাকছে বাগানে। পলাশ গাছ, লালে লাল। আর ক'দিন পরেই বাংলার শুভ নববর্ষ। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানানোর জন্য কার্ড আঁকতে হবে। কী আঁকা যায়? পাখি? গোলাপ ফুল? প্রজাপতি? কুমির আঁকলে কেমন হয়?

সাড়ে তিনটে বাজতে না-বাজতেই বন্ধুদের গলা পেল সে। ঝলমল করছে রোদ্দুর। ইশকুল শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাড়াতাড়ি খেলতে আসা যাবে। বড়বঙ্কা দেখল, ভীমের গদার মতো কাঁধে একখানা বড়দের ক্রিকেট ব্যাট চাপিয়ে ছোটবঙ্কা, তাকে ঘিরে অন্য সবাই। এতকাল তারই একমাত্র বড়দের ব্যাট ছিল। ক্যাম্বিস। মাঝে-মাঝে বের করে। সহজে কাউকে ধরতে দেয় না। বাকিদের ব্যাট তো পাতি। মালখানপুরের একমাত্র ছুতোর মধু সূত্রধরের বানানো তক্তা কাটা ব্যাট। চ্যাপ্টা, কাঠের রোঁয়া বের করা। বড়বঙ্কা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দলে ভিড়ে গেল।

মাঠে সকলেই ছোটবঙ্কাকে ঘিরে দাঁড়াল। ঘোতন সগর্বে ঘোষণা করল, "ছোটবঙ্কার বড়মামা দিয়েছে। স্টাম্প, বেল, ছ'টা বল।"

পানু বলল, "এটা কিন্তু ডিউজ় ব্যাট। খুব দামি। আমরা সবাই খেলতে পারব। ছোটবঙ্কা সব্বাইকে দেবে। না রে বঙ্কা?"

বড়বঙ্কা খিঁচিয়ে উঠল, "ছোটবঙ্কা দেবে! ব্যা-ব্যা-ব্যা! তোর তাতে কী? ল্যাংড়া কোথাকার।"

বড়বঙ্কা দেখল, ভীমের গদার মতো কাঁধে একখানা বড়দের ক্রিকেট ব্যাট চাপিয়ে ছোটবঙ্কা, তাকে ঘিরে অন্য সবাই। এতকাল তারই একমাত্র বড়দের ব্যাট ছিল। ক্যাম্বিস। মাঝে-মাঝে বের করে। সহজে কাউকে ধরতে দেয় না।

ঘোতন শাসাল, "পানুকে ল্যাংড়া বলবি না বলে দিলাম।"

পানু: বলুক গে যাক। আমি খোঁড়া। ভগবান আমাকে অমনি করে দিয়েছেন। বড়বঙ্কা শোন, তুই তো ফেল মারলি। এদিকে ছোটবঙ্কা সব বিষয়ে সব্বার চেয়ে বেশি, তাই ডিউজ় ব্যাট পেল, হি হি!

ঘন্টু সিংহ: দে না রে ভাই, ব্যাটটা একবার হাতে নিই। আমাদেরও দিবি তো? আমরা তো স্টেশনপট্টি।

ছোটবঙ্কা: তাতে কী! তোরা তো বন্ধু! নে না, নে।

ঘন্টু সিংহর দেখাদেখি সকলেই ব্যাটখানা ছুঁয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। শুধু বড়বঙ্কা মুখ ফিরিয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে রইল, যেন দূরে ওই তাল গাছ, যার মাথায় রসের হাঁড়ি বাঁধা, এছাড়া বিশ্বে আর কিছুই দেখার নেই। তার খুব কান্না পাচ্ছিল। ছোটু তাকে সবার আগে ব্যাটখানা দেখাতে পারত, অন্তত একটু সাধাসাধি করতে পারত ধরে দেখার জন্য। একে তো সে পাশ করতে পারেনি, একটা ডিউজ় ব্যাটও কেউ তাকে উপহার দেয়নি!

মদনা বলল, "এই বড়বঙ্কা, হাত দে না, ব্যাটটায় হাত দে। কী মোলায়েম। যেন মাখন। কী ভারী রে! এটাই হল আসল ক্রিকেট ব্যাট।"

বড়বঙ্কা: তোরা দেখ। আমি অমনি অনেক দেখেছি।

মদনা: কোথায় দেখেছিস? মিথ্যুক।

বিটলে: মিথ্যে কথা বড় দোষ, নাকের ডগায় বিস্ফোট।

গুটলে: মিছে বলে সটকায়, ভূতে ঘাড় মটকায়।

বড়বঙ্কা: মিথ্যে বলব কেন? আমার মামাবাড়ি নিশিগঞ্জে গোয়ালঘরের মাচায় কাঁড়ি-কাঁড়ি অমন ব্যাট পড়ে থাকে।

বুধু: কেন রে? তোর মামারা কী ছপটির বদলে ব্যাট দিয়ে গোরু তাড়ায়?

বিশু: না-না। নিশিগঞ্জে তো সব ভাঙা হাড় জুড়তে যায়। তোর মামারা কি ব্যাট দিয়ে হাড় জোড়ে?

ঘন্টু: ওর মামার বাড়িতে গোরুরা ক্রিকেট খেলে আর মামারা মাঠে চরতে যায়। হি হি হি।

অরুণ লামা: বঙ্কা তুই ব্যাট আর চ্যালাকাঠ গুলিয়ে ফেলিসনি তো?

বড়বঙ্কা: জানতাম বিশ্বাস করবি না। খেলতে-খেলতে যে ব্যাট আর কাজে লাগে না, মামারা সেগুলোই মাচায় জমিয়ে রাখেন আর মাইমা তাই দিয়ে মুড়িঘন্টু রাঁধেন।

ঘন্টু সিংহ: ওটা মুড়িঘন্টু নয় হাবা কোথাকার। ওটা হল ঘণ্ট। মুড়িঘণ্ট।

ঘোতন: তোর মামারা কি ব্যাট

দিয়ে গদাযুদ্ধ করেন যে, মাচায় পাঁজা-পাঁজা ব্যাট জমে? যত্তসব!

পানু: বল না বাবা, তোর আগেই ছোটবঙ্কা ডিউজ় ব্যাট পেয়ে গেল, তাই হিংসে হচ্ছে।

বড়বঙ্কা: যা-যা, হিংসে করতে আমার বয়েই গিয়েছে।

বিটলে পটাং পটাং করে দুটো ডিগবাজি খেয়ে বলে উঠল, "বঙ্কা পঙ্কা পায় লবডঙ্কা!"

সঙ্গে-সঙ্গে গুটলে বিটলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবার দু'জনে জড়াজড়ি করে ঘাসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেউ দেখলে ভাবতে পারে মারামারি। কিন্তু না। এটা আহ্লাদ। মনের মিল হলে গুটলে-বিটলে দুই ভাই নানা উপায়ে আনন্দ প্রকাশ করে। অনেকটা ব্যাঘ্রশাবকের কামড়াকামড়ি, আঁচড়াআঁচড়ি বা ছাগলছানার ঢুসোঢুসির মতো! গুটলে হি হি করে হাসছে আর বিটলে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে। হাত-পা ছুড়ছে। দু'জনেই প্যাংলা। লিকলিকে হাত-পা। কোঁকড়া জট পাকানো চুল, দুষ্টু চঞ্চল চোখ। এবারে গুটলে বলে উঠল, "বঙ্কা টঙ্কা খায় কাঁচালঙ্কা। কাঁচালঙ্কা হি হি হি হি! কাঁচালঙ্কা হো হো হো!"

"বড়বঙ্কা কি বুল্টাদার টিয়াপাখি যে কাঁচালঙ্কা খাবে? ওর পিছনে লাগছিস। ওদের তেঁতুল গাছে ভূত আছে তা জানিস না?" নিলু চেঁচিয়ে উঠল। ভাল ছেলে নিলুর খেলার সময় কম। তারই একমাত্র গৃহশিক্ষক আসেন। বিকেল ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে বাড়ি ফিরতে হয়। মায়ের কড়া নজরদারি। এবারে ছোটবঙ্কা সব বিষয়ে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় নিলু মায়ের কাছে পিটুনি খেয়েছে। কেউ সেকথা জানে না। ভারী বিষাদ এখন নিলুর। সে বলছে, "শুধুমুদু সময় নষ্ট করা। ব্যাট আছে, বলও আছে, খেলা শুরু করলেই হয়। এই মদনা পুরনো স্টাম্প তো তোদের বাড়িতে। নিয়ে আয়।"

বুধ: সত্যিকারের ডিউজ় ব্যাট, বল, বেল, স্টাম্প, একটা পিচ না হলে চলে?

বাপ্পা: আমি আজই বাবাকে বলব। পিচ বানিয়ে দেবে।

নিলু: সে যখন পিচ হবে তখন। এখন তো এমনিই খেলি।

বড়বঙ্কা: আমার ফার্স্ট ব্যাটিং।

ঘন্টু: কেন? ছোটবঙ্কার ব্যাট, ফার্স্ট ব্যাটিং ও করবে। বাকিটা লটারি। এই মদনা, যা না, স্টাম্পের সঙ্গে একটা কাগজ-পেনসিল আনবি।

অরুণ লামা: চল মদনা, আমি সঙ্গে যাই।

বড়বঙ্কা: আমি ফার্স্ট ব্যাটিং, ব্যস! তুই না বলার কে? তুই তো স্টেশনপট্টি। ব্যাটও তোর না। আমি বাবুপাড়ার। ছোটু আমার কথা শুনবে, না রে ছোটু?

বুধু: খেলায় আবার বাবুপাড়া-স্টেশনপট্টি কী? ম্যাচ হলে তখন। এখন আমরা সবাই বন্ধু।

ঘোতন: ঘন্টুর কথাই ঠিক। ছোটবঙ্কার এত দামি নতুন ব্যাট, তবু ও সবাইকে ধরতে দিচ্ছে। ও-ই ফার্স্ট ব্যাটিং পাবে।

পানু: বঙ্কা তুই ব্যাটটা বাড়িতেই রেখে আয়। শেষ পর্যন্ত বড়রাই এটা নিয়ে খেলবে আর আমাদের সব ফিল্ডিংয়ের নামে বল কুড়োতে পাঠাবে।

ঘন্টু সিংহ: বড়রা চাইলেই আমরা দেব কেন? সব্বাই তো ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আমরা কি আর ছোট আছি নাকি যে যা ইচ্ছে করবে?

বিটলে: আমাদেরও ক্লাব করা উচিত। মাসে দশ টাকা চাঁদা।

গুটলে: নাম দেব নটু কোম্পানি।

ছোটবঙ্কা: তোর মাথা আর মুন্ডু। আমরা কি যাত্রার দল? আমরা অ্যাথলিট, প্লেয়ার।

ঘোতন: নাম পরে ভাবা যাবে। দশ টাকা চাঁদা হলে মাসে কত হয় রে?

ছোটবঙ্কা: সোজা হিসেব। আমরা তেরোজন। গুণ দশ। একশো তিরিশ।

ঘোতন: এত? মাঝে-মাঝে রমেশকাকার দোকানে চপ, শিঙাড়া খুব খাব।

বিটলে: না-না খাওয়া-দাওয়া হবে সরস্বতী পুজোয়। চাঁদা তুলে পুজো করব আমরা। টিকি নাটিং

টিক্কি নাটিং।

গুটলে: বাজার থেকে চাঁদা তুলব। অনেক টাকা। হাজার-হাজার টাকা। নারকেল তেলের কৌটো ফুটো করে ঝমর ঝমর খুচরো বাজাব। সরসত্তি পুজো-সরসত্তি পুজো, তারপর ফিস্টি।

পানু: ক্লাব করলে ক্লাবঘরও লাগবে। মালখানপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের যেমন আছে।

মাঠের পাশে পাকা রাস্তায় একটি-দু'টি গাড়ি যাচ্ছে। মোটা গুঁড়িওয়ালা শিরীষ, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, মিঞ্জিরি, গামার, ময়না, নাগচম্পার সারি। পশ্চিমে ঢলতে থাকা সূর্যের আলো তাদের ফাঁকে-ফাঁকে চেলে দিচ্ছে আনন্দের সোনালি কিরণ। দিদির খাতার পাতা ছিঁড়ে এনেছে মদনা। তার ফুলুদিদির খাতা, ফুলুদিদির পেনসিল। টের পেলে কান মুলে দেবে। কিন্তু মদনার খাতা যে আনকোরা নতুন। ছিঁড়তে মায়া লাগে না? আবার বন্ধুদের জন্য কিছু করতে পারলেও ভারী ভাল লাগে। সে ঘন্টু সিংহর হাতে কাগজ -পেনসিল দিল। ক্লাবের আলোচনা চলছে। একটা ঘর দরকার। একটা নাম।

বড়বঙ্কা অনেকক্ষণ চুপচাপ। তাকে যেন আজ পাত্তাই দেওয়া হচ্ছে না। সে নিলুকে বলল, "দ্যাখ, তোকে যেন ডাকছেই না। তু-ই তাড়া দিলি।"

নিলু বলল, "ডাকবে। লটারি হবে তো। আচ্ছা বঙ্কা, তুই যে আবার ফেল করলি, তোর মা তোকে মেরেছেন?"

বড়বঙ্কার পাশ করতে না পারা এবং তার নিজের কোনও বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর না পাওয়া নিলুর কাছে একাকার হয়ে গিয়েছে। বড়বঙ্কা অত বুঝল না। বলল, "মারেননি। শুধু বললেন, 'তোর উপর আমার বড় আশা বাবু। ভাল করে না পড়লে যে জীবনে দাঁড়াতে পারবি না।'"

"আমার মা হলে মেরে পিঠ ফাটিয়ে দিতেন। কিংবা কে জানে, জীবনে দাঁড়ানোর জন্য দু'পা আস্তই রাখতেন না।"

নিলুর কথা ভাল করে শুনলই না বড়বঙ্কা। চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যাই, আমি বাবুপাড়ার ক্যাপ্টেন, আমি লটারি করব।"

ঘন্টু বলল, "কেন? আমরা করতে পারি না? রোজ-রোজ তুই করবি?"

বড়বঙ্কা কাগজ ধরে ফেলল, "দে, দে বলছি।"

> কিন্তু মদনার খাতা যে আনকোরা নতুন। ছিঁড়তে মায়া লাগে না? আবার বন্ধুদের জন্য কিছু করতে পারলেও ভারী ভাল লাগে। সে ঘন্টু সিংহর হাতে কাগজ -পেনসিল দিল। ক্লাবের আলোচনা চলছে। একটা ঘর দরকার। একটা নাম।

ঠিক এভাবেই সে পোষা বিড়াল টুম্পার কান ধরে। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে টুম্পা বলে, 'ম্যাশ! অ্যাঁও!'

কিন্তু ঘন্টু সিংহ তার পদবির জন্য গর্বিত। সে বলল, "হাত সরা।"

বড়বঙ্কা: দে বলছি।

ঘন্টু: হাত সরা বঙ্কা।

বড়বঙ্কা: আমি লটারি চালব।

ঘন্টু: হাত সরা, শেষবার বলছি। আমার মারামারি ভাল্লাগে না রোজ-রোজ।

বড়বঙ্কা: দে আমাকে। আমার শেষ কথা।

ঘন্টু: বঙ্কা..

ফ্যাচ!

একটানে বঙ্কা কাগজ ছিঁড়ে ফেলল। ঘন্টু কিছু বলার আগেই অবশিষ্ট কেড়ে নিল বড়বঙ্কা। কুচিকুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল।

মদনা চিৎকার করে উঠল, "আমার কাগজ ছিঁড়লি কেন? আমার দিদির খাতার কাগজ! আমার ফুলুদিদির।"

বড়বঙ্কা: লটারির জন্য কি ছিঁড়তে হত না?

মদনা: পাজি, শয়তান, বদমাশ।

পানু: ব্যাটটা একবার ধরলি না পর্যন্ত। কাগজ ছিঁড়ে দিলি, তোর কী ব্যাপার রে?

বড়বঙ্কা: আমি কিছু শুনিনি? ক্লাব করা হচ্ছে! চাঁদা, ঘর চাই। সরসত্তি পুজো! ফিস্টি! সব আমাকে বাদ দিয়ে, তাই না? 'যখন তোমার কেউ ছিল না ছিলাম শুধু আমি, এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছি আমি'।

ঘন্টু: আহা হা হা হা! জল পড়ে পাতা নড়ে, বঙ্কার কথা মনে পড়ে...কেঁচো কোথাকার!

ঘোতন: যা নিজের বাড়ি থেকে কাগজ নিয়ে আয়।

বড়বঙ্কা: আনব না, কী করবি? আমি ক্যাপ্টেন, আমি ফার্স্ট ব্যাটিং করব ব্যস!

ঘোতন: কচু ক্যাপ্টেন। ফ্যাতরা ক্যাপ্তেন।

ঘন্টু: 'আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়'।

বড়বঙ্কা: লজ্জা করে না বাবুপাড়ায় খেলতে আসিস? হ্যাংলা বাঁদর! কুচুটে! যা ভাগ!

বুধু: এই, অকারণে গাল দিস না।

বড়বঙ্কা: ও যে আমায় কেঁচো বলল!

ছোটবঙ্কা: তুই কেন মাঠ নিয়ে বললি? মাঠ সবার। তুই ওদের তাড়ানোর কে? ধুস! খেলার মেজাজটাই নষ্ট করে দিলি।

বড়বঙ্কা: আমি ক্যাপ্টেন কিনা বল ছোটু। আমাকে প্রথম ব্যাট করতে দিলে কি তোর ব্যাট ক্ষয়ে

যাবে?

ছোটবঙ্কা: নে যা। তুই ফার্স্ট ব্যাটিং কর।

ঘন্টু সিং: না। এটা ঠিক না। ও যা বলবে তাই সবাইকে মানতে হবে নাকি?

ঘোতন: চলবে না, চলবে না। আমাদের দাবি মানতে হবে। ভুতুক-ভুতুক নিপাত যাক, ভুতুক ভুতুক করে পুকার।

"খেলব না, যা।"

বড়বঙ্কা ছোটবঙ্কার হাতের ব্যাটে লাথি মারল। ছোটবঙ্কা খুব কষ্ট পেল। সে ভাবতেও পারেনি কেউ এমন করবে। তার প্রিয় উপহার। কত আকাঙ্ক্ষার জিনিস। গা থেকে জামা খুলে তাই দিয়ে ব্যাট মুছতে লাগল। তার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়ল ব্যাটে। ঘোতন প্রচণ্ড রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "ভুক্তা কোথাকার। এই জন্যই তুই বছর-বছর ফেল করিস। বিদ্যায় পা দেওয়া? কোনওদিন পাশ করবি না, এই বলে দিলাম।"

ঘণ্টু: তোরা যখন ক্লাস থ্রি-তে উঠবি, তখনও ও থ্রি-তেই থাকবে।

বড়বঙ্কা: ব্যাট কি বিদ্যা হয়? বাবা আমাকে ইংলিশ মিডিয়ামে দেবে। হাসিমারায় মিলিটারি স্কুলে। তখন দেখবি। টাই-কোট পরে ইশকুলে যাব। গ্যাট ম্যাট স্যাট ইংলিশ বলব।

বিটলে: বাংলাতেই কাত, ইংলিশে করবে বাত।

গুটলে: ব্যাট তো বিদ্যাই। ব্যাট কি খেলনা? বিদ্যায় পা দিয়েছিস, তোর পা প্যাকাটি হয়ে যাবে। কাঠের গাড়িতে বসে, 'এক রুপাইয়া দে-দে বাবু, ভুখ লাগে,' বলে ভিক্ষে করবি।

হঠাৎ নিলু কেঁদে ফেলল। সবাই তাকে ঘিরে ধরল।

"কাঁদছিস কেন? তোর কী হল? তুই-ও কি বিদ্যায় পা দিয়েছিস?"

নিলু দু'হাঁটু মুড়ে তাতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদল, অনেকক্ষণ। পানু তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বিটলে বিশু হাত ধরল। বাপ্পা বলতে লাগল, "জল খাবি? জল আনব?"

...সবাই ব্যথিত বিস্মিত মুখে দেখছে। বন্ধুকে কাঁদতে দেখলে কষ্ট হয়।

নিলু মুখ তুলল। হাতের পিঠে চোখ মুছে সামান্য ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, "কত ভাল ব্যাট এল, কত ভাল খেলতে পারতাম, তোরা শুধু ঝগড়া করছিস। বড়বঙ্কা ফেল করেছে তো কী হয়েছে? সবাই কি পাশ করে? সবাই কি ফার্স্ট হয়? সবাই কি সব কিছু পারে?"

কেউ কোনও কথা বলছে না। সকলেই দেখছে, পাকা সড়ক থেকে চোরুদা হেঁটে আসছেন। তাল গাছের মতো লম্বা, রোগা, কালো, খাঁড়ার মতো নাক, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। কত বয়স তাঁর? নামই বা কেন এমন? চোরু? তারা জানে না। সবাই তাঁকে চোরুদা বলে, তারাও। তিনি মাঠে এলে খেলা থেমে যায়। সবাই তাঁকে ঘিরে বসে। চোরুদা গল্প বলেন। কার লেখা গল্প? কোন বইয়ে পাওয়া যায়? জিজ্ঞেস করলে চোরুদা অল্প হাসেন। আশ্চর্য সুন্দর গল্পগুলো তাঁর পরিবেশনের গুণে একেবারে সত্যির মতো হয়ে যায়।

তিনি বললেন, "গল্প শুনবি নাকি?"

"শুনব-শুনব।"

"নতুন ব্যাট বুঝি?"

"ছোটবঙ্কার বড়মামা দিয়েছে। সত্যিকারের ডিউজ ব্যাট।"

"বাহ! আয়, আজ তোদের একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের গল্প বলি।"

চোরুদা বসলেন। বাকিরাও বসল তাঁকে ঘিরে। শুধু নিলু উঠে দাঁড়াল। চোরুদা বললেন, "কীরে বোস।"

নিলু বলল, "বাড়ি যাই চোরুদা, দেরি হয়ে যাবে।"

"আরে বোস না। মাকে বলিস, চোরুদার গল্প শুনছিলি। ব্যস।"

"আমাকে যেতেই হবে চোরুদা। গল্পের মাঝখানে উঠতে ইচ্ছে করে না।"

নিলু চলে যাচ্ছে। তাল গাছের তলা দিয়ে। বড়বঙ্কাদের গ্যারেজের পাশ দিয়ে ওই চলে গেল ইশকুলবাড়ির আড়ালে। চোরুদা তার গমন পথের দিকে চেয়ে ছিলেন। এবার চাপা শ্বাস ফেলে বললেন, "ক্রিকেট খেলোয়াড়ের গল্প আর-একদিন হবে। আজ অন্য একটা বলি।"

"কার গল্প চোরুদা?"

"একটা ছোট্ট ছেলের গল্প। এই তোদের মতো। ক্লাসে ফার্স্ট হতে না পারলে যাকে মা মারত।"

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ
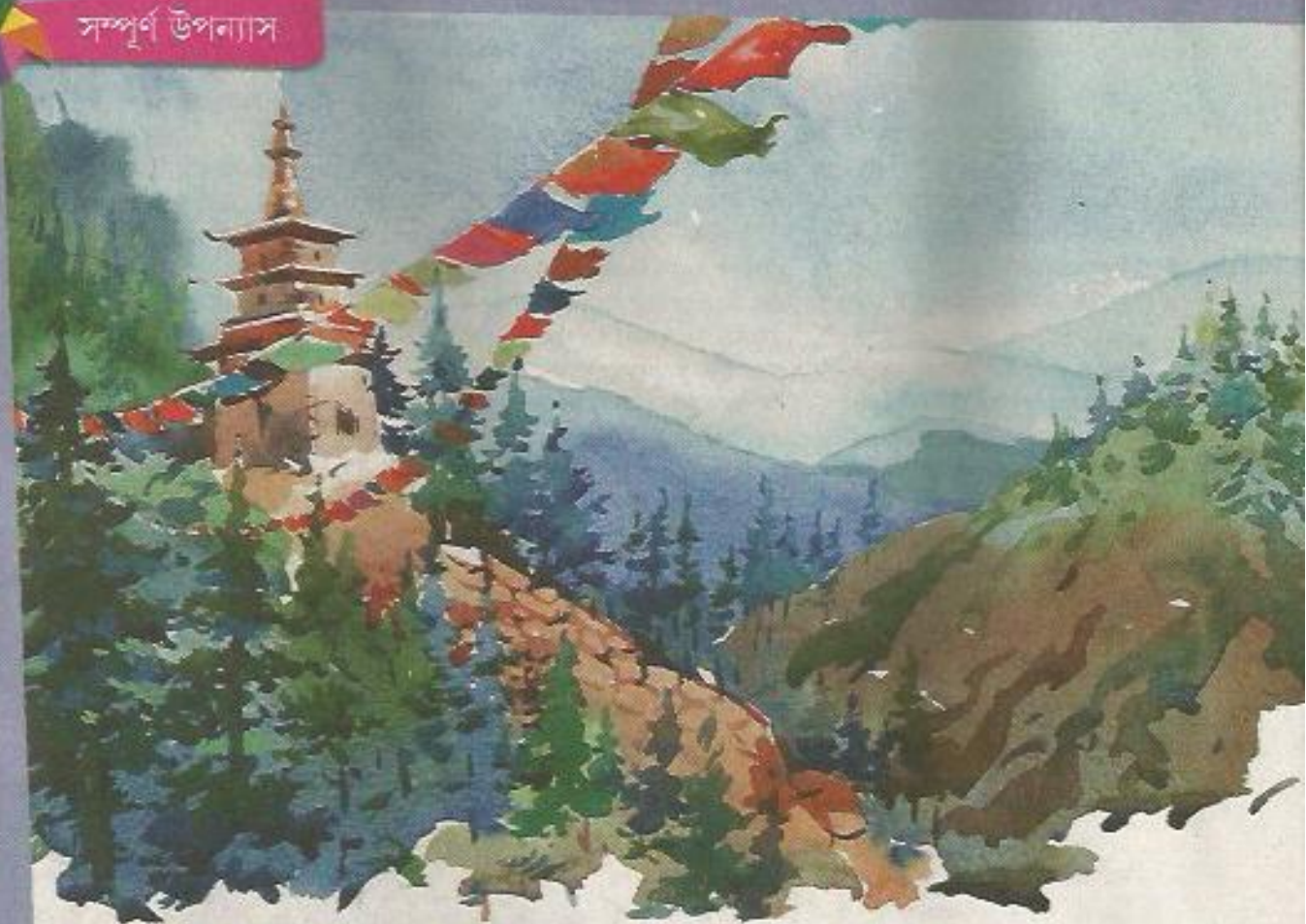
রহস্যে অতীতের ধ্বনি

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

দীপকাকুর সঙ্গে বাইকে করে ঝিনুক চলেছে কসবার দিকে। শীতের সকাল। ন'টা মতো বাজে। রাস্তায় ব্যস্ত ট্রাফিক। সকলের অফিস যাওয়ার তাড়া। সাড়ে সাতটা নাগাদ দীপকাকুর কল এসেছিল ঝিনুকের মোবাইলে। সে তখন রোজকার মতো পাড়ার জিমে ওয়ার্কআউট করছে। দীপকাকু বললেন, "জলদি রেডি হয়ে নাও। আধঘণ্টার ভিতর তোমাদের বাড়ি পৌঁছচ্ছি। পিকিউলিয়ার একটা খুনের ঘটনা ঘটেছে।"

ঝিনুক জিমে আর সময় নষ্ট করেনি। প্রায় দৌড়ে চলে এসেছিল বাড়িতে। অনেকদিন পর খুনের কেসে দীপকাকুকে অ্যাসিস্ট করতে চলেছে। সদ্য কলেজে পা রাখা ঝিনুককে খুনের মতো বীভৎসতার সামনে আনতে চান না দীপকাকু, তার উপর সে আবার মেয়ে। এতদিনে দীপকাকু বোধ হয় মনে করছেন ঝিনুক এখন যথেষ্ট ম্যাচিওরড।

দীপকাকুর বন্ধু রঞ্জনকাকু, যিনি লালবাজার কন্ট্রোলে আছেন, সকালে দীপকাকুকে ফোন করে জানান কসবার এক ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সের ছ'তলায় ড্রয়িংরুমে এমন একজন খুন হয়ে পড়ে আছে, যাকে ফ্ল্যাট-মালিক কোনওদিন দেখেননি। নিহত ব্যক্তির থেকে পাওয়া যায়নি কোনও আইডেন্টিটিপ্রুফ। লোকাল থানার পুলিশ ইনভেস্টিগেশনে গিয়েছে। রঞ্জনকাকুর ইচ্ছে দীপকাকুও যেন একবার ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষ করে আসেন, মনের খোরাক পাবেন। দীপকাকু যাচ্ছেন, ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে বলে রেখেছেন রঞ্জনকাকু।

মানে যা দাঁড়াল, দীপকাকু শুধুই দর্শক। ব্যাপারটা বাবার পছন্দ হয়নি। বলেছিলেন, "তুমি একজন প্রোফেশনাল ডিটেকটিভ, তদন্তকার ছাড়া তোমার ওখানে যাওয়া ঠিক দেখায় না। দর কমে যাবে।"

দীপকাকুর বক্তব্য ছিল, রহস্যটার টানেই উনি ওখানে যাচ্ছেন।

কসবা অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে ঝিনুকরা। ইস্টার্ন বাইপাসের কাছাকাছি এসে বাঁ হাতি রাস্তা ধরতেই ঝাঁ চকচকে ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সের বিশাল গেট। মাথার উপর লেখা 'আকৃতি প্লাজা'। গেটের কাছে একজন পুলিশ, দু'জন সিকিউরিটি গার্ড। পিছনে সিকিউরিটি রুমটা বেশ বড়। রীতিমতো ফার্নিশ্‌ড। কম্পিউটার, ফোন। দীপকাকু গার্ডদের সামনে বাইক থামিয়ে জানতে চাইলেন, "কোন বিল্ডিংয়ে ঘটেছে ঘটনাটা?"

কমপ্লেক্সে ছ'টা বহুতল। থমথমে মুখে একটার দিকে আঙুল তুলল একজন গার্ড। বাইকের স্টার্ট চালুই ছিল, গতি বাড়িয়ে এগিয়ে চললেন দীপকাকু।

কমপ্লেক্সের বিল্ডিংগুলো দশতলা। নির্দিষ্ট বহুতলের লিফটে চেপে ছ'তলায় এসে দেখা গেল চারটে ফ্ল্যাট। একটার দরজায় থিকথিকে ভিড়। দীপকাকু কর্তৃত্বব্যঞ্জক এবং গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, "সরুন। সরে দাঁড়ান। ভিতরে যেতে দিন।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভিড় দু'ভাগ হয়ে গেল। প্রয়োজনে ছোটখাট চেহারাতেই দীপকাকু অনায়াসে এমন ব্যক্তিত্ব এনে ফেলেন, বাঘা-বাঘা লোক পর্যন্ত থতমত খেয়ে যায়।

দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন এক কনস্টেবল। দীপকাকু তাকে বললেন, "অফিসারকে বলুন দীপঙ্কর বাগচি এসেছেন। লালবাজারের রঞ্জন..."

বাকিটা বলতে হল না, ভিতর থেকে সম্ভবত ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বলে উঠলেন, "রেফারেন্স দিতে হবে না। আপনাকে আমরা চিনি। আপনার কাজকর্ম নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়।"

পথ ছেড়ে দিলেন কনস্টেবলরা। ড্রয়িংরুম বিশাল বড়। এতজন পুলিশের উপস্থিতিতেও ফাঁকা লাগছে। অফিসার দীপকাকুর দিকে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুঠাম চেহারা, বয়স আন্দাজ বত্রিশ-চৌত্রিশ। দীপকাকুর থেকে খানিক ছোটই হবেন। ঝিনুকের এবার চোখ গেল মেঝের দিকে, ভীষণ চমকে উঠল। মেঝেয় চিৎ অবস্থায় একটা বডি। বুক ফুটো হয়ে বেরনো রক্তের দাগ। তবু ভাল মৃতদেহের মুখ উলটো দিকে ফেরানো। দীপকাকু আর অফিসারের মধ্যে কেস নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়ে গিয়েছে। দীপকাকু জানতে চাইছেন, "খুনটা কী-কী কারণে বিস্ময়কর মনে হচ্ছে আপনার?"

অফিসার বলতে থাকেন, "এক নম্বর, মৃত ছেলেটির থেকে আমরা পার্স বা মোবাইল কিছু পাইনি। ফলে পরিচয় জানা যাচ্ছে না। ফ্ল্যাটের লোকজনও চিনতে পারছে না একে।"

"সেকেন্ড থিং হল, ছেলেটা এখানে কীভাবে এল, যে একে গুলি করেছে সেই বা কোন উপায়ে ঢুকল ফ্ল্যাটে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে এই ফ্ল্যাটের কেউ যদি খুন করে থাকে, আলাদা কথা। তার প্রমাণ অবশ্য এখনও পাওয়া যায়নি।"

দীপকাকু অফিসারের কাছে জানতে চাইলেন, "বডিটা এখানে কীভাবে এল? মানে দরজা-জানলা সব বন্ধ ছিল?"

"সব বন্ধ। এমনকী, ওদিকের গ্রিলও কাটা হয়নি," বলে অফিসার যেদিকে তাকালেন, কাচের স্লাইডিং দরজা। বাইরের বারান্দাটা পুরো গ্রিল দিয়ে ঘেরা। কাচের দরজার সামনের পরদাটা সরানো।

দীপকাকু বলে উঠলেন, "বডিটা এখানে কী করে এল, সে না হয় পরে দেখা যাবে। গুলিটা এখানেই করা হয়েছে, তার কি কোনও প্রমাণ আছে? মৃত্যুর পর এখানে এনে ফেলা হয়নি তো?"

"খুন এখানেই করা হয়েছে। ফায়ার করা বুলেটের খোল এখানেই পেয়েছি আমরা," বলে বাঁ দিকের দেওয়ালের কাছাকাছি ফ্লোরের উপর সাদা চকের গোল দাগ দেখালেন অফিসার। ফের বললেন, "আশপাশের ফ্ল্যাটের লোক জানিয়েছে ফায়ারিংয়ের আওয়াজ পেয়েছে। এ ফ্ল্যাটে যারা ছিল তারা তো পেয়েইছে, বলছে ফায়ারিং হয়েছে এই ঘরেই।"

দীপকাকু বললেন, "সবটাই সাজানো হতে পারে। বডিটা এখানে এনে ফেলল, স্লাইডিং দরজাটা ঠেলে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করল বাইরে। বুলেটের খোলটা পড়ে থাকতে দিল ঘরে।"

ঝিনুকের এবার চোখ গেল মেঝের দিকে, ভীষণ চমকে উঠল। মেঝেয় চিৎ অবস্থায় একটা বডি। বুক ফুটো হয়ে বেরনো রক্তের দাগ। তবু ভাল মৃতদেহের মুখ উলটো দিকে ফেরানো। দীপকাকু আর অফিসারের মধ্যে কেস নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়ে গিয়েছে।

"এরকম করার কারণ?" প্রশ্নটা না করে পারল না ঝিনুক।

দীপকাকু বললেন, "খুনের দায়টা এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের ঘাড়ে ফেলা যাবে।"

আশঙ্কাটা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সহমত প্রকাশ করে অফিসার নতুন সূত্র যোগ করলেন, "ফায়ারের পর বুলেটের খোল যে ওখানেই পড়ে ছিল, তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। আমাদের আসার আগে এখানে প্রচুর লোকজন জমা হয়ে গিয়েছিল। কারও পায়ে লেগে বুলেটের খোল ওখানে চলে যেতে পারে।"

"লোকজন ঢুকে পড়ার কারণে আপনারা মৃতের এবং খুনির ফুট প্রিন্ট পাননি, বডিটা বাইরে থেকে টেনে এনে এখানে ফেলা হয়েছে কিনা, তারও কোনও প্রমাণ পাচ্ছেন না।"

দীপকাকুর কথার পিঠে অফিসার বললেন, "এগজ্যাক্টলি। কিন্তু তার আগে তো আমায় বুঝতে হবে বডিটা এখানে ঢুকল কীভাবে?"

দীপকাকু বললেন, "কার্তুজের খোলটা একবার দেখতে পারি?"

"শিওর, শিওর। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের জন্য রেখে দিয়েছি। ওঁরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন," বলার পর অফিসার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলকে ইশারায় বুলেটের খোলটা আনতে বললেন।

ট্রান্সপারেন্ট ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেটে রাখা খোলটা নিয়ে এসে অফিসারের হাতে দিল কনস্টেবল। উনি সেটা দীপকাকুকে দিলেন। প্লাস্টিক প্যাকেটটা তুলে, ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে দীপকাকু বললেন, "নাইন এম এম ফায়ার করা হয়েছে নাকি দূর থেকে? বডিতে ইনজুরি দেখে কী বুঝলেন? গুলি পিঠে করা হয়েছে, সেটা বুকের স্পট দেখে বোঝা যাচ্ছে।"

"ঠিক ধরেছেন, পিঠেই গুলি করা হয়েছে। তবে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক থেকে, নয়তো গোল পোড়ার মতো দাগ থাকত। কতটা দূর থেকে ফায়ার করা হয়েছে ফরেনসিক এক্সপার্টরাই ভাল বলতে পারবেন," বললেন অফিসার।

বুলেটের খোল রাখা প্লাস্টিক প্যাকেট কনস্টেবলের হাতে দিয়ে দীপকাকু চিৎ হয়ে থাকা মৃতদেহের দিকে এগোলেন। মৃত ছেলেটির বয়স চব্বিশের বেশি হবে না। মঙ্গোলিয়ান মুখ। মাথার চুল খুব ছোট করে কাটা। চোখ বোজা। শান্তিতে ঘুমোচ্ছে যেন।

ছেলেটার আপাদমস্তক জরিপ করছেন দীপকাকু। বলে উঠলেন, "আচ্ছা মিঃ রায়, ছেলেটার প্যান্ট-জামার স্টিকার দেখে বোঝা যাচ্ছে না কোন অঞ্চলের?"

'মিঃ রায়' সম্বোধনটা অফিসারের উদ্দেশে। পুরো নাম তাপস রায়। ওঁর বুকপকেটের উপরে নেমপ্লেটে লেখা আছে নামটা। অফিসার বললেন, "আজকালকার দিনে বেশির ভাগ লোকই ব্র্যান্ডেড ড্রেস পরে, এর শার্ট ট্রাউজার্সও তাই। কলকাতায় কেনা, না গুয়াহাটিতে বোঝার কোনও উপায় নেই।"

উবু হয়ে বসা অবস্থায় দীপকাকু মুখ তুললেন অফিসারের দিকে। বললেন, "ছেলেটার চেহারায় নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়ার ছাপ আছে, গুয়াহাটি সেই কারণেই বললেন, তাই না?"

মাথা উপর-নীচ করে সম্মতি জানালেন অফিসার। দীপকাকু ফের মন দিয়ে মৃতদেহটা পর্যবেক্ষণ করছেন। প্যান্টের পকেট থেকে বের করলেন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস। ছেলেটার মুখ, বুকে গুলির ক্ষত, জামার কলার, কোমরের বেল্ট, সবই দেখছেন ঘাড় কাত করে, শরীর বেঁকিয়ে। বডি ছুঁচ্ছেন না। নিয়ম নেই। ফরেনসিক টিমের কাজ ব্যাহত হবে। ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া থাকে। প্রথমে এসে তাঁকেই তো দেখতে হয় দেহে প্রাণ আছে কিনা? তাপস রায়কে মৃতদেহটিকে পাশ ফিরিয়ে পিঠের ক্ষতটা দেখতে হয়েছে। শার্ট আর ট্রাউজার্সের স্টিকার দেখছেন।

উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু। মৃতদেহের উপর চোখ রেখে খানিক ধন্দের গলায় বললেন, "মিঃ রায়, একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছেন? ছেলেটার হাতে রাবারের গ্লাভস, পায়ে মোজা। কিন্তু জুতো নেই। কেন?"

"এতে আশ্চর্যের কী আছে! হাতে-পায়ের ছাপ লুকনোর জন্য ওগুলো পরেছে," বললেন অফিসার।

দীপকাকু বললেন, "জুতো পরে থাকলেও তো ফুটপ্রিন্ট পাওয়া যেত না। জুতোটা তা হলে খুলে রাখল কেন?"

উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না অফিসার। দীপকাকু বললেন, "কারণ তো একটা থাকবেই। খুঁজে বের করতে হবে। ডেডবডিটা প্রথমে কে দেখে, তারপর কী-কী হয়, আমাকে একটু বলতে পারবেন?"

"ডেডবডি প্রথমে দেখেন এই ফ্ল্যাটের কর্ত্রী। এমনই সেটব্যাক হয়েছে তাঁর, কথা বলার অবস্থায় নেই। ওঁর হাজব্যান্ড মানে ফ্ল্যাট মালিকের সঙ্গে কথা বলে আপনি গোটা ঘটনাটা জেনে নিতে পারবেন," বলে অফিসার সোফায় বসা বিধ্বস্ত মানুষটিকেই নির্দেশ করলেন।

ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে বসলেন দীপকাকু। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নাম কী? বাই প্রফেশন কী করেন?"

"সুপ্রিয় পাল। মার্কসম্যান কোম্পানির কলকাতার অফিসে আছি। চিফ ইঞ্জিনিয়ার," নিচু এবং ক্লান্ত স্বরে কথাগুলো বললেন ফ্ল্যাটের মালিক। ঝিনুক সোফায় বসেনি। সিটিং এরিয়ার কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে নোটবুক, পেন বের করেছে। দীপকাকু বললেন, "ঘটনাটা গোড়া থেকে বলুন দেখি। কখন টের পেলেন আপনার ফ্ল্যাটে বডিটা পড়ে আছে?"

চশমার উপর দিয়ে দীপকাকুর মুখটা একবার দেখে সুপ্রিয় পাল বলতে শুরু করলেন, "অফিসের কাজে কাল আমার চেন্নাই যাওয়ার কথা ছিল। রাত একটায় ফ্লাইট। ডিনার সেরে দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরলাম, প্লেন ছাড়তে তখন চল্লিশ মিনিট বাকি। জানিয়ে দেওয়া হল বিশেষ কারণে ফ্লাইট ক্যানসেল। সকাল ছ'টার ফ্লাইটে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। কিন্তু তাতে আমার কোনও কাজ হবে না। চেন্নাইয়ে অফিসের মিটিং শিডিউল সকাল ন'টায়। বাড়ি ফিরে আসব বলেই স্থির করলাম।"

"এয়ারপোর্ট থেকে বাড়িতে ফোন করে জানাননি, ফিরে আসছেন," নিশ্চিত হয়ে বললেন দীপকাকু।

সুপ্রিয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না, জানাইনি। আমার স্ত্রী, মেয়ে ততক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবলাম, দু'বার করে ঘুম ভাঙিয়ে কী লাভ। আমি ফিরে এলে ওদের উঠতেই হবে। ফ্ল্যাটে এসে ডোরবেল টিপেছি, হয়তো তিরিশ সেকেন্ড ভিতরে গুলির আওয়াজ। প্রথমে আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, ভাবছি ঠিক শুনলাম কি? তারপরই আমার স্ত্রীর প্রচণ্ড ভয় পাওয়া চিৎকার! বুঝতে পারছি ভিতরে মারাত্মক কোনও বিপদ ঘটেছে। দরজা ধাক্কা দিচ্ছি, সোমা, সোমা বলে ডাকছি, আমার স্ত্রীর নাম সোমা।"

"এক মিনিট," সুপ্রিয়বাবুকে থামালেন দীপকাকু। বললেন, "আপনি ডোরবেল টিপলেন কেন? ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি আপনার কাছে ছিল না?"

"ছিল। সোমা দিয়ে রেখেছে। হামেশাই টুর করতে হয় আমাকে। কাল ওদের ঘুম না ভাঙাতে চেয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকতেই পারতাম, মাথায় আসেনি কথাটা। ফ্ল্যাটে ফিরে বেল টেপাটা এমন অভ্যেসের মতো হয়ে গিয়েছে..."

"তারপর কী হল বলুন?"

সুপ্রিয়বাবু বলতে থাকলেন, "দরজা মেয়ে খুলে দিল। ঘরে পা দিয়ে দেখি, ছেলেটা ওখানে ঠিক ওইভাবে পড়ে আছে, সোমা পড়ে আছে এই কারপেট এরিয়ায়। মেয়ে থরথর করে কাঁপছে। কোনও কথাই বলতে পারছে না। আমার মনে হয়েছিল সোমাও মারা গিয়েছে। নাকের কাছে আঙুল নিয়ে গিয়ে দেখলাম শ্বাস পড়ছে। তার মানে সেন্সলেস। ছেলেটার বুকে গুলির ফুটো দেখে বুঝলাম, শেষ।"

"তারপর আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকদের ডাকলেন?" বললেন দীপকাকু।

সুপ্রিয়বাবু জানালেন, "ডাকতে হয়নি। গুলির আওয়াজ কোথা থেকে এল, খুঁজতে বেরিয়ে আমার ফ্ল্যাটে চলে এসেছিল কমপ্লেক্সের অনেকেই। ওরা আমাকে সাহস জোগাল। বলল, লোকাল থানায় ফোন করতে।"

দীপকাকু জানতে চাইলেন, "আপনার মেয়ের বয়স কত?"

প্রশ্নটা আদৌ কতটা প্রাসঙ্গিক, ধরতে পারে না ঝিনুক। তার ধারণা দীপকাকু ছাড়া এধরনের আর কেউই বলতে পারবে না কেন তথ্যটা জানতে চাওয়া হচ্ছে? সুপ্রিয়বাবু কিন্তু বাধ্য ছাত্রের মতো উত্তর দিলেন, "বারো বছর। ক্লাস

সিক্ষে পড়ে।"

"তার মানে যথেষ্টই ম্যাচিওরড। ওর কাছ থেকেও তো ঘটনার কিছু বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। যা হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। কথা বলা যাবে ওর সঙ্গে?"

এবার বোঝা গেল বয়স জানতে চাওয়ার কারণ। সুপ্রিয়বাবু খানিক ইতস্তত্র সঙ্গে বললেন, "তোর্সা মাকে নিয়ে ভীষণ টেন্সড। মাথার কাছে বসে রয়েছে। এই সময় কি ওর সঙ্গে কথা বলা ঠিক হবে?"

"আচ্ছা, আপাতত থাক," বলে দীপকাকু অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "গোটা ফ্ল্যাটটা নিশ্চয়ই আপনাদের সার্চ করা হয়ে গিয়েছে?"

হ্যাঁসূচক ঘাড় কাত করলেন অফিসার। ফের দীপকাকু সুপ্রিয়বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কাছে কি বন্দুক রাখার লাইসেন্স আছে?"

"না, নেই। সত্যিকারের রাইফেল বা পিস্তল আমি কোনওদিন হাতে নিয়ে দেখিনি," নিরীহ গলায় জানালেন সুপ্রিয়বাবু।

প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো নোটবুকে লিখে নিচ্ছে ঝিনুক। সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন দীপকাকু। তাপস রায়কে বললেন, "আমি একবার ফ্ল্যাটটা ঘুরেফিরে দেখি? যদিও আপনারা সবই দেখেছেন। বাই এনি চান্স কোনও ক্লু পেয়ে যেতে পারি।"

"যদি পান, প্লিজ় জানাবেন। কেসটা ভোগাবে মনে হচ্ছে," কথার পর অফিসার এক কনস্টেবলের উদ্দেশে বললেন, "বাইরে গিয়ে একটু চায়ের ব্যবস্থা করো তো। মাথা একেবারে ধরে যাচ্ছে।"

স্লাইডিং ডোর ঠেলে দীপকাকু পৌঁছলেন গ্রিল ঘেরা বারান্দাটায়। ঝিনুকও এল। এখান থেকে কমপ্লেক্সের পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে, প্রায় দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল। তার উপর কাঁটাতারের বেড়া। পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব, যদি না বাউন্ডারির কোনও অংশে বড় গাছটাছ থেকে থাকে। কসরত করে সেটায় উঠে ঘরে পড়ে থাকা ছেলেটা পাঁচিল টপকাতে পারে, নতুবা মেনগেট দিয়েই আসতে হয়েছে তাকে।

দীপকাকু গ্রিল ধরে টানাটানি করে দেখছেন, কাটা হয়েছে কিনা। পুলিশের কথাই ঠিক, কাটা হয়নি গ্রিল।

দীপকাকু ফের ঘরে ঢুকলেন। চলে গেলেন সিটি এরিয়ার অপোজ়িটে দেওয়ালজোড়া সুদৃশ্য কাঠের ক্যাবিনেটের সামনে। ডান দিকের দেওয়ালে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমে কাচবসানো ওপেন র‍্যাক। তাক জুড়ে শুধুই শোপিস। দেওয়ালের ফাঁকা অংশে ঝুলছে বিভিন্ন ধরনের মুখোশ। জাপানি পাখা, কাগজ বা কাপড়ের উপর আর্টওয়ার্ক। এসবের নীচের ফ্লোরে বড় বড় ফুলদানি, বাঁকুড়ার ঘোড়া, কালো কাঠের নানা সাইজ়ের বাক্সের উপর পোড়ামাটি, ডোকরার বিভিন্ন মূর্তি বা মোটিফ। বোঝাই যাচ্ছে শুধু ঘর সাজানোর জন্য জিনিসগুলো এখানে রাখা হয়নি। কালেকশনের ঝোঁক কাজ করেছে। রুমাল বের করে বাঁ হাতে জড়িয়েছেন দীপকাকু, ডান হাতে নিয়েছেন পেনসিল টর্চ।

ক্যাবিনেটের কাচের পাল্লা সরানোর চেষ্টা করছেন রুমাল জড়ানো হাতে, কোনওটা খুলছে, কোনওটা না। লক করা আছে। পাল্লার এমন জায়গায় রুমালসমেত আঙুল রাখছেন দীপকাকু, সচরাচর সেখানে হাত দিয়ে কেউই পাল্লা খুলবে না। অর্থাৎ কিনা কাচের পাল্লায় যে সব হাতের ছাপ আছে, অটুট রাখতে চাইছেন। তাতে ফরেনসিক টিমের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে না।

ক্যাবিনেটের কাচের পাল্লা সরানোর চেষ্টা করছেন রুমাল জড়ানো হাতে, কোনওটা খুলছে, কোনওটা না। লক করা আছে। পাল্লার এমন জায়গায় রুমালসমেত আঙুল রাখছেন দীপকাকু সচরাচর সেখানে হাত দিয়ে কেউই পাল্লা খুলবে না।

কালেকশনের আইটেম দেখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে ঝিনুকের! প্রত্যেকটা র‍্যাকে আলাদা-আলাদা বিষয় রাখার চেষ্টা হয়েছে। এলোমেলো হয়ে রয়েছে একটু। কেউ হয়তো এক র‍্যাক থেকে জিনিস তুলে দেখে ভুল করে রেখেছে অন্য র‍্যাকে। বিভিন্ন ধরনের চাবির রিং, চামচ, সচরাচর দেখা যায় না এমন আকারের পট, নানান ডিজ়াইনের ঘন্টা, সামুদ্রিক শাঁখ, সেরামিক এবং অন্যান্য ধাতুর বিভিন্ন ভঙ্গির গণেশ মূর্তি, বৌদ্ধদের জপযন্ত্র, বিচিত্র সব পেপারওয়েট, নানান দেশের কয়েন, এমনকী, মথ, প্রজাপতিও কেমিক্যাল দিয়ে সংরক্ষণ করা। সংগ্রহের নির্দিষ্ট কোনও বিষয় নেই। বেশ কিছু শোপিসের সঙ্গে সাদা সুতো দিয়ে ছোট্ট চিরকুট বাঁধা, লেখা আছে জিনিসটার পরিচয়। সেগুলো পড়ে জানা যাচ্ছে এখানে বহু বিদেশের জিনিসও আছে। আন্দাজ করা যায় সংগ্রহের ঝোঁকটা সুপ্রিয় পালের। কারণ, অফিসের কাজে ট্যুরে যেতে হয়। এখন বোঝা যাচ্ছে বিদেশেও যান। ঝিনুকের কেন জানি সন্দেহ হয়, এই সংগ্রহশালার কারণেই কি এই ফ্ল্যাটে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল?

ক্যাবিনেট, ওপেন র‍্যাক, ফ্লোরে রাখা সব শোপিসই দেখা হয়ে গেল দীপকাকুর। এবার চশমার সামনে আতসকাচ নিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছেন শোপিস সংগ্রহের ঠিক সামনেটায়। পৌঁছে গিয়েছেন স্লাইডিং দরজার পরদার কাছে। পরদার নীচের ফ্লোরটা একটু বেশি সময় ধরে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। প্যান্টের পকেটে রুমাল, আতসকাচ চালান করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, কপালে চিন্তার ভাঁজ। অফিসার এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "পেলেন

কিছু?"

দীপকাকু অফিসারের দিকে তাকালেনই না। একমনে ভেবে যাচ্ছেন। কনস্টেবল চা নিয়ে এল। হাতে সুন্দর ট্রে, দারুণ ডিজাইনের সব কাপ। চায়ের রংটাও খাসা। দীপকাকুকে অফার করতে হল না। নিজেই একটা কাপ তুলে নিয়ে ডিজাইনটা দেখছেন। অফিসারের উদ্দেশে বললেন, "আপনি বাইরে থেকে চা আনতে বলেছিলেন না? কোন দোকান থেকে এত দামি কাপে চা পাঠিয়েছে?"

উত্তরটা দিল কনস্টেবল। বলল, "আমি বাইরে থেকেই আনতে যাচ্ছিলাম, পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক যেতে দিলেন না। ওঁরাই বানিয়ে দিলেন।"

কাপে চুমুক মেরে দীপকাকু বললেন, "এই ফ্ল্যাটের রুচি পাশের ফ্ল্যাটেও প্রভাব ফেলেছে দেখছি।"

অফিসারকে বললেন, "সামনের ব্যালকনিতে একবার যাব।"

"যান না। আমরাও গিয়েছিলাম। ফ্ল্যাট মালিক বলছেন ব্যালকনির দরজাটা বন্ধই ছিল। ওদিক থেকে কারও ঘরে ঢোকার সম্ভাবনা নেই। তবু একবার দেখে এসেছি। ফ্ল্যাট মালিক যে সত্যি বলছেন তার তো কোনও মানে নেই। সেরকম কোনও ক্লু অবশ্য চোখে পড়েনি।"

দীপকাকু কাপ নামিয়ে ব্যালকনির দরজার দিকে এগোলেন। ছিটকিনি খোলার আগে দীপকাকু খানিকক্ষণ দরজার দিকে চেয়ে রইলেন। দরজার দু'পাশে জানলা, কাঠের ফ্রেমে কাচ দেওয়া। ছিটকিনি দেওয়া সে দুটোতেও। দরজার ছিটকিনি খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন দীপকাকু। সঙ্গে অফিসার এবং ঝিনুক। খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে পুলিশের জুতোর ছাপ ব্যালকনি জুড়ে। শীতকাল। ধুলো ওড়ে বেশি। ব্যালকনির জমা ধুলোর কারণে বুটের ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কারও পায়ের ছাপ পাওয়া দুষ্কর। তাই হয়তো সেই চেষ্টায় না গিয়ে দীপকাকু আতসকাচ দিয়ে কোমর সমান রেলিং, তার উপরে হাত রাখার ব্ল্যাক কালারের পাইপ, ব্যালকনি সংলগ্ন বিল্ডিংয়ের দেওয়াল, গাছের টবগুলো দেখছেন। রেলিংয়ে বাঁধা একটা নাইলনের দড়ি হাতে তুলে নিয়েছেন দীপকাকু, যার শেষ প্রান্তে সাধারণ একটা বাজারের ব্যাগ। উঁচু ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা সবাই এটা করেছেন, নীচ থেকে দুধের প্যাকেট, খবরের কাগজ আরও নানান জিনিস তুলে আনার জন্য। দড়ি ছেড়ে দিয়ে দীপকাকু এখন রেলিং ধরে ঝুঁকে একবার নীচটা দেখছেন, পরের বার উপরটা। পর্যবেক্ষণ মনে হচ্ছে শেষ হল। হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে এগিয়ে আসছেন দীপকাকু। অফিসারকে বললেন, "এখানে যা দেখার, মোটামুটি হয়ে গিয়েছে। একবার ছাদটায় যাব।"

"ছাদে!" বলে থমকালেন অফিসার। ফের বললেন, "ছাদে আমরা যাইনি। আপনি যান, ঘুরে আসুন।"

ঘরের দিকে ঘুরে গিয়ে অফিসার হাঁক পাড়লেন, "ঘোষবাবু, ছাদের দরজায় তালা দেওয়া কিনা দেখুন। বন্ধ থাকলে চাবি জোগাড় করে মিঃ বাগচিকে নিয়ে যান।"

কথা শেষ করে অফিসার মুখ ঘোরাতেই দীপকাকু বললেন, "ফ্ল্যাট মালিকের মোবাইল নম্বর নিশ্চয়ই নিয়েছেন কললিস্ট চেক করার জন্য?"

"নিয়েছি। এই কেসে উনিও একজন সম্ভাব্য অপরাধী।"

"রাইট। ওঁর ক'টা মোবাইল ফোন?"

"একটা।"

একটু ভেবে নিয়ে দীপকাকু বললেন, "ওঁর স্ত্রীর মোবাইল নম্বরটাও নিন। ওটারও কললিস্ট বের করে রাখুন।"

"কেন বলছেন এ কথা?" বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন তাপস রায়।

দীপকাকু বললেন, "মনে হচ্ছে স্ত্রীর মোবাইল নম্বরটা তদন্তের কাজে লাগবে।"

"ফরেনসিক টিম এলে বলবেন কাঠের বড় ক্যাবিনেটটা একবার চেক করতে, হাতের ছাপ পাওয়া গেলেও, যেতে পারে।"

"কী করে পাওয়া যাবে? ডেডবডির হাতে তো গ্লাভস," বললেন তাপস রায়।

চোখ থেকে চশমা নামিয়ে জামার খুঁটে কাচ মুছতে-মুছতে দীপকাকু বলতে থাকলেন, "ছেলেটা একা ছিল না, খুনিও ছিল ঘরে। তার হাতে গ্লাভস ছিল কিনা আমরা জানি না। এটা যে মার্ডার, সেটা পরিষ্কার। নিজের পিঠে ওভাবে গুলি করে সুইসাইড করা যায় না।"

চশমা পরে নিয়ে দীপকাকু বললেন, "রাতে ব্যালকনির দরজা বন্ধ ছিল কিনা, সে ব্যাপারে আমরা যখন শিওর নই, তা হলে ধরে চলা ভাল অপরাধী কিংবা অপরাধীরা ঘরে ঢুকেছিল এই পথ দিয়েই। কোনওভাবে উঠে এসেছিল এখানে। ফরেনসিক টিমকে বলবেন, ব্যালকনি লাগোয়া দু'পাশের দেওয়ালও যেন পরীক্ষা করে। এখানে আসার জন্য দেওয়ালটাকে হাত এবং পায়ের সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করার কথা। আর এই পরদাটা চেক করতে বলবেন। এত দূর বেয়ে ওঠার কারণে দেওয়াল কিংবা অন্য কিছুর রং, ধুলোময়লা হাতে অথবা গ্লাভসে লেগে থাকতে পারে, যার প্রমাণ পরদাটায় রয়ে গিয়েছে।"

একজন কনস্টেবল এসে দাঁড়ালেন চৌকাঠে। অফিসারের উদ্দেশে বললেন, "স্যার, ছাদের চাবি এনেছি।"

ইনি তার মানে ঘোষবাবু। অফিসার বললেন, "চাবি কার কাছে ছিল?"

"এই বিল্ডিংয়ের প্রত্যেক ফ্ল্যাটেই ছাদের চাবি একটা করে দেওয়া আছে। এ ফ্ল্যাট থেকেই পেলাম চাবি।"

অফিসার নির্দেশ দিলেন, "যান, এঁদের নিয়ে ছাদে যান।"

ঘোষবাবুকে নিয়ে তিনজন এখন ছাদে। দরজায় তালা দেওয়া ছিল, ঘোষবাবু খুলেছেন। দীপকাকু ছাদে পা দিয়ে চলে গিয়েছেন পাঁচিলের সেই অংশে, যার নীচে বিল্ডিংয়ের ডান দিকের ব্যালকনি। যার একটা সুপ্রিয়বাবুর ফ্ল্যাটের। দীপকাকু খুঁটিয়ে দেখছেন এলাকাটা। ঝিনুক এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত গিয়ে আকৃতি প্লাজার গোটা বাউন্ডারিটা দেখার চেষ্টা করছে। দশতলার উপর থেকে ভারী সুন্দর লাগছে নীচটা। বিল্ডিংগুলোর সামনে-পিছনে নানান আকৃতির বাগান, বাচ্চাদের দুটো পার্ক, রেলিং-ঘেরা চারটে ওয়াটারবডি, যেন সুইমিংপুলের পুকুর। বাউন্ডারি ওয়ালের গায়ে কোথাও বড় গাছ নেই, ছোট মরসুমি ফুলের বাগান। মৃত ছেলেটি তার মানে মেনগেট দিয়েই ঢুকেছিল। দীপকাকুর দিকে চোখ যায় ঝিনুকের, উবু হয়ে বসে মার্কার দিয়ে পাঁচিলের নীচের ফ্লোরে হাফবাউন্ড আঁক কাটলেন।

দীপকাকু ঝিনুককে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছেন আকৃতি প্লাজায়। প্রথমেই ঢুকেছেন সিকিউরিটি রুমে। আগের বার যেদিনের ফুটেজটা দেখেছিলেন কম্পিউটার স্ক্রিনে, আবারও দেখলেন অনেকক্ষণ সময় নিয়ে।

পাশে দাঁড়ানো ঘোষবাবুকে বললেন, "এখানে কয়েকটা জুতোর দাগ দেখতে পাচ্ছি। পাচ্ছেন আপনি?"

হ্যাঁসূচক মাথা নাড়লেন ঘোষবাবু। উনি অবশ্য দেখতে পাচ্ছেন না। দীপকাকু দেখেছেন ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের সাহায্যে। উঠে দাঁড়ালেন। এবার আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন পাঁচিলের উপর হ্যান্ডরেস্টের পাইপটা বললেন, "এখানে আছে দড়ি বাঁধার দাগ, মোটা দড়ি। টান পড়েছে ভালই, পাইপের রং কিছুটা উঠে গিয়েছে। ফরেনসিক টিমকে এই দুটো জায়গা ভাল করে দেখতে বলবেন।"

"এটা আপনি স্যারকে বলে দিন।"

পকেট থেকে সেলফোন বের করে দীপকাকু বললেন, "তাপসবাবুর নম্বরটা বলুন।"

ঘোষবাবুর মুখস্থ নেই। নিজের ফোন দেখে বলতে হল। দীপকাকু অফিসারকে কল করে প্রথমে বললেন, "দীপঙ্কর বাগচি বলছি। নম্বরটা সেভ করে রাখুন আমার নামে।"

এর পর ছাদের ব্যাপারটা বললেন। সঙ্গে রাখলেন আরও একটা অনুরোধ, "আপনি কাইন্ডলি মেনগেটে সিকিউরিটি রুমে ফোন করে দিন, গতকালের সি সি টিভির ফুটেজটা দেখব আমি।"

ফোনের অপর প্রান্তে তাপস রায় কিছু বললেন। শুনে নিয়ে দীপকাকু বলে উঠলেন, "জানি, আপনারা দেখেছেন। ইট্‌স ন্যাচারাল। মৃত ছেলেটা মেনগেট দিয়ে ঢুকেছে কিনা, সেটা জানার জন্যই দেখা। ঢুকতে দেখা যায়নি ফুটেজে। গেলে, আমাকে বলতেন। তবু আমি একবার দেখতে চাই।"

দীপকাকু ফোন পকেটে পুরে ঘোষবাবুকে বললেন, "ফরেনসিককে জায়গাটা ভাল করে দেখিয়ে দেবেন। এখন যদি নীচে নামেন, ছাদের দরজায় তালা দিয়ে রাখবেন আগের মতোই।"

লিফটে করে গ্রাউন্ডে নেমে এসেছে ঝিনুকরা। সিকিউরিটি রুম লক্ষ করে গটগট করে হেঁটে যাচ্ছেন দীপকাকু। ঝিনুক পা মিলিয়েছে। মেনগেট দিয়ে 'পুলিশ' স্টিকার লাগানো একটা গাড়ি ঢুকে এল, সেলাম ঠুকল গেটে দাঁড়ানো কনস্টেবল। ঝিনুকদের ক্রস করে গাড়িটা সোজা গিয়ে থামল সুপ্রিয়বাবুদের বিল্ডিংয়ের নীচে। হাতে ব্যাগপত্র নিয়ে সিভিল ড্রেসের কয়েকজন নেমে এলেন। মনে হচ্ছে ফরেনসিক টিম এসে পৌঁছল। দীপকাকু নিশ্চয়ই খেয়াল করেননি গাড়িটাকে। একবারের জন্যও ঘুরে দেখলেন না। যেন সায়েন্সের কোনও আত্মমগ্ন প্রোফেসর, ফরেনসিকের টাস্ক দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন চলেছেন অন্য ক্লাস নিতে।

॥ ২ ॥

ছ'দিন কেটে গেল। বাবার কথা মেলেনি। আকৃতি প্লাজা থেকে ফিরে বাবাকে সব ঘটনাই বলেছিল ঝিনুক। বাবা বলেছিলেন, "এই কেসে দীপঙ্করের সাহায্য ছাড়া পুলিশ এক পা-ও এগোতে পারবে না। দেখ না, কালই হয়তো ডেকে পাঠাবে।"

ডেকে পাঠানো হয়নি। দীপকাকু আজ সকালে নিজে থেকে ফোন করেছিলেন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তাপস রায়কে। তদন্তের খবরাখবর নিয়ে, অনুমতি চাইলেন সুপ্রিয় পালকে বিশদে জিজ্ঞাসাবাদ করার এবং আরও একবার সিকিউরিটি রুমে গিয়ে সি সি টিভি ফুটেজ দেখার। অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। দীপকাকু ঝিনুককে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছেন আকৃতি প্লাজায়। প্রথমেই ঢুকেছেন সিকিউরিটি রুমে। আগের বার যেদিনের ফুটেজটা দেখেছিলেন কম্পিউটার স্ক্রিনে, আবারও দেখলেন অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। নতুন কিছু পেলেন না বলেই হয়তো পিছিয়ে গেলেন আর-একটা দিন। রিওয়াইন্ড, ফরোয়ার্ড করে দেখতে লাগলেন। দেখা যেন শেষ হয় না।

আবার একটা দিন পিছতেই ঝিনুক নিঃশব্দে সিকিউরিটি রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে। দীপকাকুর মতো অত ধৈর্য তার নেই। পার্ক, বাগান, ছোট-ছোট ওয়াটারবডি নিয়ে হাউজিংটা সত্যিই সুন্দর। এখানকার এক ফ্ল্যাটে খুনের মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গিয়েছে। পুলিশের দিক থেকে দেখলে, দীপকাকুকে তদন্তে হেল্প করার জন্য না ডেকে তারা অন্যায্য কিছু করেনি। ফরেনসিকের জন্য যে টাস্কগুলো উনি রেখে গিয়েছিলেন, তাতে পাওয়া যায়নি উল্লেখযোগ্য কোনও সূত্র। ক্যাবিনেটের কাচে নেই কোনও হাতের ছাপ। মাঝের হাফরাউন্ড পাল্লাটার হ্যান্ডেলে ফ্ল্যাট মালিকের আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে, সেটাই স্বাভাবিক। ওঁর ক্যাবিনেট, উনি তো খুলবেনই। ব্যালকনির পরদায় দেওয়ালের রং বা ওই জাতীয় কিছুর অস্তিত্ব নেই। পাওয়া গিয়েছে কয়েকটা মাথার চুল, নারী ও পুরুষের। চুলগুলো সুপ্রিয় পাল এবং তার স্ত্রী-মেয়ের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কাজের লোকদের হতে পারে। ব্যালকনিতে যাওয়া-আসার সময় পরদায় এক-দুটো রয়ে গিয়েছে। ছাদের পাঁচিলের উপর পাইপের যে অংশটা দেখিয়ে দীপকাকু বলেছিলেন, "দড়ির দাগ আছে।" ওটা দড়ির নয়, ধাতব ব্রাশ টাইপের কিছুর আঁচড়। তার নীচে জুতোর কোনও ছাপ পাওয়া যায়নি। ছাপ নেই ব্যালকনি সংলগ্ন দেওয়ালে। একদিন বাদে তাপস রায় ফরেনসিকের সমস্ত রিপোর্ট দীপকাকুকে ফোন করে জানিয়েছেন। রিপোর্টে জানা যায়, ছেলেটি রাত দুটো নাগাদই মারা গিয়েছে। ফুটপাঁচেক দূর থেকে পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছিল। দীপকাকুর কথামতো সুপ্রিয় পালের স্ত্রীর ফোন নম্বর নিয়ে কোনও লাভ হয়নি। কললিস্ট চেক করে মেলেনি কোনও ক্লু। ব্যর্থতার লম্বা লিস্ট শোনার পরও হতাশ হননি দীপকাকু। তাপস রায়কে বলেছিলেন, "পরদায় লেগে থাকা চুলগুলো কি বাড়ির লোকের সঙ্গে ম্যাচ করানো হয়েছে?"

"না, হয়নি। প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না," বলেছেন অফিসার।

দীপকাকু জানতে চেয়েছিলেন, "চুলগুলো ফেলে দেওয়া হয়নি তো?"

"ঘটনাস্থলের কোনও এভিডেন্সই আমরা ফেলে দিই না।"

তাপস রায়ের সঙ্গে দীপকাকুর ফোনালাপটা ঝিনুকের সামনে হয়নি। পরের দিন সন্ধেবেলা ঝিনুকদের বাড়ি এসে দীপকাকু গোটা ব্যাপারটা বললেন। খুবই দমে গিয়েছিলেন বাবা, ঝিনুকের অবস্থাও তাই। এর পরই দীপকাকু সঙ্গে নিয়ে আসা 'আজ সকাল' খবরের কাগজটা বের করেছিলেন। কাগজটা সেদিনের নয়, আগের দিনের। 'আজ সকাল' তাদের বাড়িতেও দেওয়া হয়। দীপকাকু শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের পাতাটা বাবার সামনে খুলে ধরেছিলেন। ঝিনুক ঝুঁকে পড়ে দেখেছিল একটা বিজ্ঞাপন লাল কালি দিয়ে গোল করা আছে। বাবার পর ঝিনুক চোখ বুলিয়েছিল বয়ানে। বোল্ড লেটারে হেডিং, 'অ্যান্টিক দ্রব্যসামগ্রী কিনতে ইচ্ছুক'। নীচে ছোট হরফে লেখা, 'দেবদেবীর মূর্তি, তালপাতার পুঁথি, লিপি এবং চিত্র উৎকীর্ণ টালির প্রতি বিশেষ আগ্রহ'। এর পর একটা মোবাইল নম্বর দেওয়া রয়েছে। বাবা প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন দেখাচ্ছ অ্যাডটা? এর মানে কী?"

পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে দীপকাকু বলেছিলেন, "এই ফোনসেটের নম্বরটাই দেওয়া আছে বিজ্ঞাপনে। কাগজে অ্যাডটা আমিই দিয়েছি। সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটটা খুঁটিয়ে দেখে আমার মনে হয়েছে কোনও অ্যান্টিক জিনিস চুরি গিয়েছে ওই রাতে। সম্ভবত কোনও পুজোঅর্চনার বস্তু। জিনিসটা যাতে চোরাবাজারে বিক্রি না হয়ে যায়, তার জন্যই বিজ্ঞাপনের নামে ওই টোপটার বন্দোবস্ত। একবার যদি হাতবদল হয়ে যায়, তা হলে জিনিসটা পাওয়া এবং চোরকে ধরা দুটোই বেশ কঠিন হয়ে যাবে।"

দীপকাকু থামতেই বাবা বলে উঠেছিলেন, "ফ্ল্যাট থেকে কোনও কিছু খোয়া গিয়েছে, একথা তো সুপ্রিয় পাল পুলিশকে জানাননি।"

"হয়তো সুপ্রিয় পাল এখনও খেয়াল করেননি, জিনিসটা নেই। অথবা পুলিশকে জানতে দিতে চান না চুরিটা।"

ঝিনুক জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন চান না জানতে দিতে?"

"কারণটা খানিক আন্দাজ করতে পারছি। তবে যতক্ষণ না শিওর হচ্ছি, উনি জেনেবুঝে চুরিটা গোপন করছেন, তার আগে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে না।"

বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "চুরিটা হল কীভাবে? চুরির সঙ্গে খুনেরও নিশ্চয়ই কোনও সম্পর্ক আছে।"

দীপকাকু বলতে থাকলেন, "খুন এবং চুরি একই ব্যক্তি করেছে, নাকি আলাদা দুটো লোক, সেটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। অজ্ঞাতপরিচয় ছেলেটি পার্স, মোবাইল ছাড়াই উপরে উঠে এসেছিল, নাকি খুন করার পর পকেট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তাও বুঝতে পারছি না। চুরি, খুন এবং পরিচয়পত্র সরানো তিনটে কাজ সুপ্রিয় পাল একাই সারতে পারেন। দেখা গেল ওই ছেলেটি ছাড়া বাইরের কেউ ঢোকেইনি ঘরে। ছেলেটিই বা কোন রাস্তা দিয়ে ঢুকল? গোটা ব্যাপারটাই জটিল একটা ধাঁধা হয়ে আছে। একমাত্র চুরি যে হয়েছে, এটা খানিকটা জোর দিয়ে বলা যায়।"

"তুমি কিন্তু একটা জায়গায় গোলমাল করে ফেলছ। মার্ডার করা, আইডেন্টিটি প্রুফ সরানো এই দুটো কাজ সুপ্রিয় পাল করলেও নিজের জিনিস নিজে চুরি করতে যাবেন কেন?" প্রশ্ন রেখেছিলেন বাবা।

উত্তরে দীপকাকু বললেন, "ঠিক চুরি নয়। হতে পারে জিনিসটার আসল মালিক উনি নন। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেই সরিয়ে রেখেছেন।"

"আপনি এমন কী দেখলেন, যা থেকে মনে হচ্ছে ওই ফ্ল্যাটের কিছু খোয়া গিয়েছে ওই রাতে?" জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

দীপকাকু বলেছিলেন, "ক্যাবিনেটের মাঝখানে যে হাফরাউন্ড কাচের পাল্লা আছে, তার ভিতর কাচের তিনটে

র‍্যাক, উপরের র‍্যাকে বেমানানভাবে খানিকটা জায়গা ফাঁকা, ধুলোর গোল ছাপ। যেহেতু পাল্লা বন্ধ থাকে, ধুলো ঢোকে কম, ছাপ খুব স্পষ্ট নয়। আমার মনে হল ওখান থেকে খুব সম্প্রতি কোনও জিনিস তুলে নেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগে তুললে, জায়গাটা ফাঁকা রাখা হত না। সামঞ্জস্য রাখতে অন্য কোনও শোপিস দিয়ে ভরাট করা হত।"

"তোমার অবজার্ভেশনটা পুলিশকে দেখালে না কেন?" জিজ্ঞেস করেছিলেন বাবা।

দীপকাকু বললেন, "ওই ছাপটা তো হাত বা পায়ের ছাপের মতো অকাট্য নয়। জিনিসটা যে কী, তাই তো জানি না। ঘণ্টার র‍্যাকটায় দু'-একটা অন্য আইটেমও ছিল। ঘটনাটা যদি চুরির হয়, তা হলে ইমিডিয়েটলি জিনিসটা আমার নাগালের মধ্যে রাখার বন্দোবস্ত করতে হবে। চোরের কাছে পৌঁছনো সহজ হবে তখন। সেইদিনই আমি বিজ্ঞাপনটা লিখে কাগজের অফিসে জমা দিই। বয়ানে পুঁথি, টালি এসব ক্যামোফ্লেজ। চোর যাতে ফাঁদটা বুঝতে না পারে।"

এসময় মা সকলের জন্য চা-স্ন্যাক্স নিয়ে ঢুকেছিলেন ঘরে। খাওয়াদাওয়াকালীন দীপকাকু যা বলেছিলেন, মোটামুটি এরকম। বিজ্ঞাপন দেওয়া নম্বরে সকাল আটটা থেকেই পরের পর ফোন আসতে শুরু করে। বাড়িতে-বাড়িতে একসময় পুজোআর্চনার চল ছিল খুব। এখন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে, লোকে বিক্রি করে দিতে চায়। এর মাঝেই ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তাপস রায়ের ফোন এসেছিল দীপকাকুর আসল নম্বরে। ফরেনসিকের রিপোর্ট দিলেন। অনুমান বিফলে গিয়েছে শুনে একটু বুঝি আত্মবিশ্বাসে টান পড়েছিল দীপকাকুর। রাত ন'টা নাগাদ বিজ্ঞাপনে দেওয়া নম্বরে এসেছিল সেই কল।

লোকটি বলল, "আমার কাছে একটা তিব্বতি ধরনার বৌদ্ধ মন্দিরের প্রাচীন ঘণ্টা আছে। কত দাম পেতে পারি?"

দীপকাকু বলেছিলেন, "ঘণ্টাটা আপনি নিয়ে আসুন। দেখি আগে।"

তাতে রাজি হয়নি লোকটা। তার বক্তব্য, জিনিসটা যে যথেষ্ট মূল্যবান, তা সে জানে। অত দামি অ্যান্টিক পিস নিয়ে ঘোরাঘুরির ঝুঁকি লোকটা নিতে চায় না। বিক্রির সময় ওই একবারই জিনিসটা নিয়ে আসবে। তার আগে ঘণ্টাটার একটা ফোটো পাঠাতে পারে। দীপকাকু বলেছিলেন, "ঠিক আছে, আমি ইমেল আইডি এস এম এস করে দিচ্ছি। ফোটো পাঠিয়ে দিন।"

লোকটা বলেছে, "আমি কম্পিউটার ভাল বুঝি না। আপনি আগামিকাল সকাল দশটায় মেট্রো সিনেমার নীচে দাঁড়াবেন। পেয়ে যাবেন ফোটো।"

দীপকাকু তখন বলেছিলেন, "কাল নয়। ওটা আপনি পরশু করুন। আগামিকাল ওই সময় আমার অন্য কাজ আছে।"

লোকটি সম্মত হয়েছিল প্রস্তাবে। দীপকাকু মাঝের সময়টা নিয়েছিলেন লোকটার ফোননম্বর ট্র্যাক করার জন্য। পরের দিন লালবাজারের রঞ্জনকাকুর সাহায্যে দীপকাকু জানতে পারলেন কোনটা এসেছে ভবানীপুরের একটা জেরক্সের দোকান থেকে। সেই দোকানে পৌঁছে গিয়েছিলেন দীপকাকু। দোকানিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "গতরাতে ন'টার সময় যে লোকটা ফোন করতে এসেছিল, তার চেহারাটা কেমন?"

দোকানি জানায়, "লোকটা চাদর মুড়ি দিয়ে এসেছিল। আমি জেরক্স করছিলাম মোটা বইয়ের।"

ক্ষীণ সূত্রের প্রত্যাশায় দীপকাকু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "লোকটা বয়স্ক, না কমবয়সি?"

জেরক্সের দোকানের লোকটা জানায়, "কাল যেরকম জব্বর ঠান্ডা পড়েছিল, সব বয়সের লোকেরাই ওভাবে চাদর মুড়ি দেবে। তবে কমবয়সি মনে হয়নি। হাঁটাচলায় ধীরস্থিরভাব। কথা বলেছিল একটাই, 'কত দিতে হবে?' সেটাও খুব আস্তে। পরনে সাদা পাজামা ছিল।"

দীপকাকুরও ফোনে কথা বলার সময় মানুষটির গলা শুনে বয়স্ক মনে হয়েছে। সমস্ত বৃত্তান্ত শোনানোর পর দীপকাকু বাবাকে বলেছিলেন, "রজতদা, আপনার একটা হেল্প লাগবে। আগামিকাল সকাল দশটায় আপনিও গিয়ে দাঁড়াবেন মেট্রো সিনেমার লাউঞ্জে।"

বাবা জানতে চেয়েছিলেন, "আমি কেন?"

দীপকাকুর বক্তব্য ছিল, "লোকটা নিজেকে অধরা রাখতে চায়। তাই কোনও মেল অ্যাড্রেস থেকে ফোটো পাঠাতে চাইছে না। ফোন করেছিল বাইরের বুথ থেকে। আমিও চাই না বিজ্ঞাপনদাতাকে সে চিনে ফেলুক। সেই কারণে অ্যাডে সুদর্শনদার (দীপকাকুর অফিসের একমাত্র স্টাফ) ফোন নম্বর দিয়েছি। লোকটা যেহেতু অপরাধী, কেসটার দিকে অবশ্যই নজর রেখেছে। তদন্ত করতে দেখেছে আমাকে। যদি দেখে সেই আমি ফোটো নিতে গিয়েছি, তা হলে ওখান থেকে পিঠটান দেবে। তাই ছদ্মবেশ নেব। আপনি থাকবেন আমার থেকে একটু দূরে। লোকটা আমাকে খাম জাতীয় কিছু একটা দেবে, যার ভিতরে থাকবে ফোটোটা। খামটা হ্যান্ডওভার করে লোকটা যখনই এগিয়ে যাবে, আপনি মারবেন ধাক্কা। সেটা যেন ইচ্ছাকৃত বলে মনে না হয়। লোকটাকে খুব করে সরিটরি বলবেন। গায়ে-মাথায় হাত বোলাবেন, যাতে ছদ্মবেশ নিয়ে থাকলে সেটা যেন খুলে যায়। লোকটাকে চিনে রাখতে পারব আমি।"

কেসটায় নিজের অবদান কমে যাচ্ছে দেখে ঝিনুক বলেছিল, "বাবাকে দরকার পড়ছে কেন?"

দীপকাকু বললেন, "কোনও মেয়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে লোকটাই সরিটরি বলতে থাকবে। সেক্ষেত্রে তোমাকে ছেলেদের মেক-আপ দিতেই পারি, ধাক্কা মারার পর কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়ে যাবে, গলার স্বর লুকোতে পারবে না। এই কেসে তদন্ত করতে আমার সঙ্গে তোমাকেও দেখেছে সে। তবে চিন্তা করো না, ওই সময় তোমার জন্যই একটা সিরিয়াস কাজ রেখেছি। আমাদের দু'জনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর লোকটা যে দিকে হেঁটে যাবে, দূর থেকে

ফলো করতে থাকবে তুমি। দেখে আসবে লোকটার গন্তব্য। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে ছদ্মবেশ থাকবে তোমার। অল্প ছদ্মবেশ রজতদাকেও নিতে হবে।"

বাবা বলেছিলেন, "আমাকে আবার কেন?"

দীপকাকু বললেন, "তদন্ত চলাকালীন লোকটা যদি কখনও আমাকে, আপনাকে একসঙ্গে দেখে নেয়, খটকা লাগবে তার। বিজ্ঞাপনটা যে ফাঁদ ছিল, ধরে ফেলতে পারে। তখনই নিজেকে আরও আড়াল করে ফেলবে।"

এত কথা শোনার পরেও ঝিনুকের মনে একটা খচখচানি রয়ে গিয়েছিল। দীপকাকুকে প্রশ্ন করেছিল, "আচ্ছা, অত ক'টা ফোন কলের মধ্যে এটাই যে চোরের ফোন, এতটা শিওর আপনি কী করে হচ্ছেন? চুরিটা যে হয়েছে, সেটাই হলফ করে বলতে পারবেন না। হাতে কোনও খাস প্রমাণ নেই। সমস্তটাই অনুমান।"

ভাবুক গলায় দীপকাকু বলেছিলেন, "অনুমানকে অত ছোট করে দেখো না। জানবে, প্রমাণের চেয়েও জোরালো বিষয় হচ্ছে অনুমান। প্রমাণ অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। যে কারণে বহু নিরপরাধ ব্যক্তি বছরের পর-বছর জেল খাটে। অনুমান চলে যুক্তির রাস্তা মেনে। প্রমাণের ভুলটা অনুমানই ধরিয়ে দেয়।"

এর পর স্বাভাবিক মেজাজে ফিরে এসে সপক্ষের যুক্তিগুলো দিয়েছিলেন দীপকাকু। উপরের র‍্যাকে ফাঁকা জায়গা আর ধুলোর গোল ছাপ দেখে চুরির ব্যাপারটা প্রথম মাথায় আসে তাঁর। লোকটি ফোন করে ঘণ্টার কথা বলেছে, ওই র‍্যাকটা ঘণ্টার জন্য নির্দিষ্ট। তিব্বতি ঘরানার ঘণ্টার কথা বলছে লোকটা, যে ছেলেটি খুন হয়ে পড়েছিল ঘরে, চেহারা মঙ্গোলিয়ান টাইপ। অর্থাৎ তিব্বতের সঙ্গে যোগ আছে। তিব্বতটা কমন হয়ে গেল। জড়িয়ে গেল চুরি আর খুন। সব শেষে লোকটা নিজেকে এতটা আড়ালে রাখার চেষ্টা করছে কেন? অপরাধী বলেই তো। এর পর কি বুঝতে বাকি থাকে ওটা চোরের ফোন? এমনকী চুরিটা যে হয়েছে, সেটাও প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। দীপকাকুর পয়েন্টগুলো শুনে সংশয় দূর হয়েছিল ঝিনুকের। পরের দিন সকাল দশটায় বাবা, দীপকাকুর মতো ঝিনুকও মেট্রো সিনেমার সামনে নিজের পজ়িশন নিয়েছিল। পরনে উলটো আঁচল করে পরা শাড়ি, আধ ঘোমটা টানা, চশমা, দু'হাতে কাচের রঙিন চুড়ি বেশ কয়েকগাছি।

বাবার ছদ্মবেশ ছিল, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, পাজামা-পাঞ্জাবি কাঁধে ঝোলা। দীপকাকুর পরনে ব্লেজ়ার, ট্রাউজ়ার্স। মাথায় সাদা চুলের উইগ, গোঁফটাও সাদা করে নিয়েছিলেন। ঝিনুকদের বাড়িতেই মেক-আপ নেওয়া হচ্ছিল। মেট্রো সিনেমার সামনে কার কোথায় পোজ়িশন হবে তখনই বলে দিয়েছিলেন দীপকাকু।

এই যে এত আয়োজন, সমস্তটাই বৃথা গিয়েছে। লোকটার টিকিটুকুও দেখা যায়নি। ফোটোটা কিন্তু সে দিয়েছে, দীপকাকুকে পুরোপুরি বোকা বানিয়ে। দশটা

পনেরোয় ফোন করে দীপকাকুর কাছে জানতে চেয়েছিল, "আপনি এসে গিয়েছেন?"

"হ্যাঁ," বলে দীপকাকুকে মাঝপথে থামিয়ে লোকটা বলে উঠেছিল, "সিনেমা হলের কোলাপসেবল গেট লাগোয়া যে অটোমেটিক ওয়েইং মেশিনটা আছে, তার পিছনে একটা খাম পাবেন। ওর ভিতরে আছে ফোটোটা। আপনি ভাল করে দেখে নিন, আমি রাতের দিকে ফোন করব।"

ইনস্ট্রাকশান শোনার পর দীপকাকু মোবাইল সেট পকেটে রেখে ওজন যন্ত্রের কাছে গেলেন, পিছন থেকে বের করলেন খামটা। ঘটনার উপর নজর রেখে বাবা, ঝিনুকের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, লোকটা ধোঁকা দিয়েছে। বাবা এগিয়ে যাচ্ছিলেন দীপকাকুর কাছে, ঝিনুকও ভাবছিল আর ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? ঘটনা কী হল দেখা যাক!

দীপকাকু কিন্তু দু'জনকেই ফোন করে কাছে আসতে বারণ করেছিলেন। কারণটা বলেছিলেন পরে। ফোটোটা কে নিল, সেটা জানার জন্য লোকটা নিশ্চয়ই আড়াল থেকে লক্ষ রাখবে। যদি দেখে প্রাপক সঙ্গে দু'জন লোক নিয়ে এসেছে, খটকা লাগবে তার।

ফোটো পাওয়ার পর পরিকল্পনামতো দীপকাকু পাতাল রেল ধরেছিল। ঝিনুক ফিরেছিল বাবার গাড়িতে। ফেরার পথে বাবা আপশোস করছিলেন নিজের বোকামির জন্য। দীপকাকুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার বোকামি নয়, তার চেয়েও বড় গন্ডগোল পাকিয়ে ছিলেন নিজের পজিশন নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই। একটা রোগাপাতলা ছেলে হ্যান্ডবিল বিলি করতে-করতে এগিয়ে আসছিল, বাবা খেয়াল করেননি। দীপকাকুর দিকেই নজর ছিল। ছেলেটা ছদ্মবেশী দীপকাকুকে একটা হ্যান্ডবিল দিতে যেই না এগিয়েছে, বাবা এসে মেরেছিলেন রামধাক্কা। বাবার ভুল দেখে ঝিনুকের তো কপালে হাত। ছেলেটা ফুটপাথ থেকে ছিটকে গিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। অজস্র হ্যান্ডবিল হাওয়ায় উড়তে-উড়তে তার উপরেই এসে পড়েছিল। ছেলেটা নাকি প্রবল বিস্ময়ে আর ভীষণ অসহায় হয়ে তাকিয়েছিল বাবার দিকে। ঝিনুকের সেই এক্সপ্রেশন দেখার সুযোগ হয়নি। বাবার মুখে শুনেছে। ঝিনুক দেখেছিল বাবা সত্যিকারের শুশ্রূষার জন্য এগিয়ে গিয়েছেন ছেলেটার দিকে। দীপকাকু খানিক দূরে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে হাসি চাপছেন। সে যাই হোক, রাতে লোকটা ফোন করেছিল দীপকাকুকে, বিজ্ঞাপনে দেওয়া নম্বরে। কোনও একটা ল্যান্ডলাইন থেকেই এসেছিল কলটা। মেট্রো সিনেমার নীচে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যে নম্বর থেকে ইনস্ট্রাকশান এসেছিল, সেটাও ল্যান্ডলাইনের। দীপকাকু ট্র্যাক করে দেখেছেন দুপুরের নম্বরটা ধর্মতলার এক ফোনবুথের দোকানের। নম্বর ট্র্যাক করে লোকটার হদিশ পাওয়া যে বেশ কঠিন তা মেনে নিয়েছিলেন দীপকাকু। আর ওইরকম রাস্তায় তিনি হাঁটবেন না ঠিক করেছেন।

রাতের ফোনালাপের আগে ইন্টারনেট সার্চ করে ফোটোর ঘণ্টার বিষয়ে জেনে নিয়েছিলেন দীপকাকু, লোকটা মিথ্যে বলেনি, ফোটোর ঘণ্টাটা তিব্বতি ঘরানার। বৌদ্ধধর্মের মহাযান ধারার। বৌদ্ধধর্মে প্রধানত দু'টি ধারা, মহাযান এবং হীনযান। তিব্বতের দিকে মহাযানের প্রসার ঘটেছে। লোকটি ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিল, "ফোটো দেখে কী মনে হল? কিনতে আগ্রহী আপনি?"

রাতের ফোনালাপের আগে ইন্টারনেট সার্চ করে ফোটোর ঘণ্টার বিষয়ে জেনে নিয়েছিলেন দীপকাকু, লোকটা মিথ্যে বলেনি, ফোটোর ঘণ্টাটা তিব্বতি ঘরানার। বৌদ্ধধর্মের মহাযান ধারার। বৌদ্ধধর্মে প্রধানত দু'টি ধারা, মহাযান এবং হীনযান।

দীপকাকু বলেছেন, "অবশ্যই আগ্রহী, তবে দেখে নিতে হবে ঘণ্টার হ্যান্ডেলে, মানে যে অংশটাকে দর্জি বলে, সেখানকার মুক্তোগুলো অরিজিনাল কিনা। তা যদি হয় অবশ্যই জিনিসটা অ্যান্টিক পিস হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।"

লোকটা আশ্বস্ত করে বলেছিল, "মুক্তোগুলো কালচার করা নয়, একদম অরিজিনাল এবং প্রাচীন। যদি কেনেন, পরীক্ষা করে নেবেন। এবার বলুন দাম দেবেন কত?"

দীপকাকু বলেছিলেন, "সব যদি ঠিকঠাক থাকে লাখচারেক দিতে পারি।"

ওপ্রান্তে লোকটা প্রায় আঁতকে ওঠা গলায় বলেছিল, "কী বলছেন আপনি! এই জিনিস মাত্র চার লাখ টাকায়? যে-কোনও কিউরিও শপে গেলে আমি অনায়াসে দশ-বারো লাখ টাকা পাব। নেহাত প্রকাশ্যে এটা আমি বিক্রি করতে চাই না বলেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে দীপকাকু প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন প্রকাশ্যে বিক্রি করতে চান না?"

ফোনের ওপার থেকে উত্তর এসেছিল, "এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার কেনার ইচ্ছে থাকে তো বলুন।"

দীপকাকু বলেছিলেন, "কিনতে অবশ্যই চাই। কিন্তু অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। বড় জোর ছ' লাখ দিতে পারি। তাও আমাকে অন্তত এক সপ্তাহ সময় দিতে হবে বাকি টাকাটা জোগাড় করার জন্য।"

লোকটা বলেছিল, "আপনি সময়টা দু' সপ্তাহ নিন, টাকাটা আট লাখ করুন।"

দীপকাকু রাজি হয়েছেন। এটাই চেয়েছিলেন, জিনিসটা যেন কিছুদিনের জন্য হাতবদল না হয়। ইতাবসরে চোরকে তিনি ধরে ফেলবেন। লোকটার দেওয়া সময় থেকে চারদিন খরচ হয়ে গিয়েছে। তদন্তে এগোবার কোনও

রাস্তাই খুঁজে পাননি দীপকাকু। ফোটোটা কত খুঁজি খাটিয়ে সংগ্রহ করেছেন, পুলিশকে জানিয়ে লাভ নেই। কেসটার সঙ্গে ফোটোটার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এই ক'দিন হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়েছে দীপকাকুকে। আজ রবিবার। ঝিনুকদের বাড়িতে দীপকাকু বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে চলে এসেছেন ঠিকই, তবে মুড পুরো অফ। দাবার বোর্ড সাজাতে-সাজাতে বাবা বলেছিলেন, "কী ব্যাপার, মুখটা এমন বেজার করে আছ কেন?"

দীপকাকু বললেন, "আজকের কাগজটা দেখেছেন?"

বাবা জানতে চেয়েছিল, "কেন, আজ আবার কী বেরল?"

খবরের কাগজ সোফার উপরে ছিল, ঝিনুক এনে দিয়েছিল দীপকাকুর হাতে। পাতা উলটে দেখালেন পুলিশের দেওয়া 'সন্ধান চাই'-এর বিজ্ঞাপন। সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটে খুন হওয়া ছেলেটির চোখবন্ধ মৃত মুখের ফোটো। পরনে যা-যা ছিল তার বর্ণনা। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে কোলের উপর রেখে দীপকাকু বলেছিলেন, "হাত ধুয়ে ফেলল পুলিশ। ফোটো দেখে কেউ যদি খোঁজ না নিতে আসে ছেলেটার, পুলিশ বডি পুড়িয়ে ফেলবে। খুনি কোনওদিন ধরা পড়বে না।"

এর পর বাবা-ই দীপকাকুকে বলেন ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে ফোন করে কেসটা আর-একবার খতিয়ে দেখবার অনুমতি নিতে। অনুমতি পাওয়ার পর দীপকাকু আকৃতি প্লাজায় এসে সেই যে সিকিউরিটি রুমে ঢুকেছেন, এখনও বেরলেন না। বাইরে পায়চারি করতে-করতে ঝিনুকের পা ব্যথা হয়ে গেল।

এবার একটু বসতে হবে। সিকিউরিটি রুমের দিকে ঘুরতে যাবে ঝিনুক, খেয়াল করে বিল্ডিং সাইড থেকে একজন হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন। সুপ্রিয় পাল। পরনে ট্র্যাকসুটের লোয়ার আর টি-শার্ট। চোখে-মুখে একটু বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। সামনে এসে বললেন, "এই তো, ঠিক আন্দাজ করেছি দূর থেকে। ইনস্পেকশনের প্রথমদিন আপনিও ছিলেন না?"

ঝিনুক চুপ করে থাকে। দীপকাকুর শিক্ষা, তদন্তের সময় কেউ কোনও প্রশ্ন করলে চট করে উত্তর দেবে না। আগে বোঝার চেষ্টা করবে, কেন প্রশ্নটা করা হচ্ছে? উত্তরের তোয়াক্কা না করে সুপ্রিয় পাল অধৈর্যের গলায় বললেন, "আপনি একা কেন? আপনার স্যার কোথায়?"

এবার ঝিনুক অর্ধেক উত্তর দিল, "উনি আছেন।"

"কোথায় আছেন? সেই কখন থেকে ওয়েট করছি। থানার আই ও বলেছেন উনি আমার কাছে আসছেন, যেন বাড়ি থাকি। এদিকে বাইরে কিছু কাজ আছে আমার। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখতে পেয়ে নেমে এলাম।"

"উনি সিকিউরিটি রুমে," বলেই ঝিনুকের মনে হল ভুল হয়ে গেল। দীপকাকু ওখানে কী খুঁজছেন, সুপ্রিয়বাবুর জেনে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

সিকিউরিটি রুম লক্ষ করে এগিয়ে যাচ্ছেন সুপ্রিয় পাল, ঝিনুক লম্বা-লম্বা পা ফেলে ওঁকে ক্রস করে দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তখনই কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা দীপকাকু টেবিলে চাপড় মেরে বলে উঠলেন, "ইয়েস, আই গট ইট!"

সি সি টিভির ভিডিয়ো ফুটেজ স্ক্রিনে পজ় দিয়ে রেখেছেন দীপকাকু। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা ইয়াং ছেলে, আকৃতি প্লাজার গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছনটাই দেখা যাচ্ছে ছেলেটার। দীপকাকুর উদ্দেশে ঝিনুক বলে ওঠে, "সুপ্রিয় পাল এসেছেন।"

"কে সুপ্রিয় পাল?" জানতে চেয়ে ঝিনুকের দিকে ঘাড় ফেরালেন দীপকাকু। এই এক মুশকিল, দীপকাকু মাঝে-মাঝে ছোটখাট ব্যাপারগুলো এমন ভুলে যান!

ঝিনুক বলল, "আমরা যাঁর কাছে এসেছি।"

দরজার দিকে তাকালেন দীপকাকু। সুপ্রিয় পালকে চিনতে পেরে বললেন, "সরি, এখানে একটু আটকে গিয়েছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।"

"আসলে বাইরে কিছু কাজ ছিল, বুঝতেই পারছেন। একটাই ছুটির দিন," বিনয়ের সঙ্গে বললেন সুপ্রিয়বাবু। বাইরের মেজাজ দীপকাকুর সামনে এসে পালটে গিয়েছে।

"কতক্ষণের কাজ?"

"ঘণ্টাখানেকের মতো।"

"সেরে আসুন, আমরা ততক্ষণ আপনার ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করব। ফ্ল্যাটে কেউ আছেন তো? আপনার মেয়ে অথবা মিসেস..."

"মেয়ে নাচের স্কুলে। সোমা আছে। আমি বলে রাখছি, আপনারা আসুন," দরজা থেকে নেমে গেলেন সুপ্রিয় পাল।

দীপকাকু প্যান্টের পকেট থেকে একটা পেনড্রাইভ বের করে সি পি ইউ-তে গুঁজলেন। সম্ভবত ভিডিয়ো ফুটেজের খানিকটা অংশ নিজের পেন ড্রাইভে লোড করবেন। পজ় দিয়ে রাখা ভিডিয়োটা চালু করলেন দীপকাকু। ছেলেটা গেট পেরিয়ে ক্যামেরা জোনের বাইরে চলে গেল। ফের পজ় দিয়ে ভিডিয়োটা ফাস্ট রিওয়াইন্ড করলেন। থামলেন, ছেলেটা যখন গেট দিয়ে ঢুকছে।

চমকে উঠল ঝিনুক, খুন হয়ে যাওয়া ছেলেটা ঢুকছে। যাকে গেট দিয়ে বেরতেও দেখা গিয়েছে স্ক্রিনে। ঝিনুক ভীষণ বিস্ময়ে দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে, "এটা কবেকার ফুটেজ?"

"মারা যাওয়ার ছ'দিন আগের। এগারোই ডিসেম্বর। রবিবার ছিল।"

ঝিনুক জিজ্ঞেসা করল, "এই হাউজ়িংয়ে কার কাছে এসেছিল ছেলেটা?"

"সেটাই খুঁজে বের করতে হবে," বলে দীপকাকু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সিকিউরিটির লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরের লোক গেটের রেজিস্টারে সই করে ঢোকে তো?"

লোকটি বলল, "যারা রেগুলার আসে, তাদের সই করাই না। একদম অচেনা লোককে করাই। লিখতে হয় কার কাছে যাচ্ছে। লোকটাকে যদি তেমন সুবিধের না ঠেকে, যে ফ্ল্যাটে যাচ্ছে সেখানে ফোন করে জেনে নিই, লোকটাকে

পাঠাব কিনা?"

দীপকাকু স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকে সিকিউরিটির লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছেলেটিকে কি চেনা ঠেকছে? আগে কখনও এসেছে হাউজিংয়ে?"

"চেনা বলতে ওর ডেডবডি দেখেছি। সেদিন আপনারাও দেখেছেন। আগে কখনও আসতে দেখিনি। তবে এত জোর দিয়ে বলা যায় না, সারাদিন কত লোক যাচ্ছে, আসছে। সবাইকে কি মনে রাখা সম্ভব? নিয়মিত এলে মুখ চেনা হয়ে যায়।"

কপি করা শেষ হল দীপকাকুর। সি পি ইউ থেকে পেনড্রাইভ বের করে নিয়ে সিকিউরিটির লোকটিকে বললেন, "রেজিস্টার খাতাটা নিয়ে আসুন তো। ডেট আর টাইম যখন জেনে গিয়েছি, সই করে ঢুকেছে কিনা দেখতেই পাব।"

লোকটি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রেজিস্টার খাতা থাকে গেটে থামের সঙ্গে লাগানো শেডের নীচে। খাতা নিয়ে এল লোকটা। খোলা অবস্থায় আছে মনে হচ্ছে। এগারোই ডিসেম্বরের পাতাটা খুলেছে। দীপকাকু ওর থেকে খাতাটা নিয়ে আঙুল নির্দেশ করে বলছেন, "ভিডিয়োয় রেকর্ড হয়েছে ছেলেটা ঢুকছে দুপুর এগারোটা পাঁচে। এখানে সাড়ে দশটায় সই করেছে একজন। পরের লাইনে যে সই করেছে, এন্ট্রি টাইম সাড়ে বারোটা, মানে কী দাঁড়াল?"

মানেটা এতই পরিষ্কার, ঝিনুকের আর মুখ ফুটে বলতে ইচ্ছে করল না। সিকিউরিটি স্টাফ বলে উঠল, "অনেকে কিন্তু লেখা খারাপ হয়ে গেলে, কেটে দিয়ে পরের লাইনে লেখে।"

কোনও উত্তর না দিয়ে দীপকাকু মোবাইল ফোন বের করে ক্যামেরা অপশনে গেলেন। ওঁর এখন স্মার্টফোন হয়েছে। ইন্টারনেটের সুবিধের জন্য নেওয়া। ফোটোও ভাল ওঠে। এগারোই ডিসেম্বরের পেজটার ফোটো তুলে নিলেন কয়েকটা। ঝিনুককে বললেন, "চলো, গুপ্তের ফ্ল্যাটে এবার যাই।"

সিকিউরিটি রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে ঝিনুকরা। দীপকাকু নিজের মোটরবাইকের দিকে এগোচ্ছিলেন, ঝিনুক বলল, "এইটুকু যাব, বাইকের কী দরকার?"

"তাই তো," বলে দাঁড়িয়ে গেলেন দীপকাকু। সিকিউরিটির লোকটি বলে উঠল, "এখানে থাক। কোনও চিন্তা নেই।"

দীপকাকু এগিয়ে চলেছেন। মোবাইল বের করে কাকে যেন কল করছেন, "একটা ট্যাক্সির নম্বর বলছি, নোট কর তো।"

ঝিনুকের বুঝতে অসুবিধে হল না লালবাজারের রঞ্জনকাকুকে ফোনে ধরেছেন দীপকাকু। নম্বরটা বলা হয়ে গেল। এর পর বললেন, "এগারোই ডিসেম্বর, দুপুর এগারোটা নাগাদ ট্যাক্সিটা কে চালাচ্ছিল খোঁজ নে। ড্রাইভারের সঙ্গে আমার কথা বলানোর ব্যবস্থা কর।"

অপরপ্রান্তে রঞ্জনকাকু কিছু বললেন। উত্তরে দীপকাকু জানালেন, "না-না, নতুন কেস নয়। আকৃতি গ্রাফার কেসটা নিয়েই আছি। খুবই ইন্টারেস্টিং কেস।"

থেমে ও প্রান্তের কথা শুনলেন দীপকাকু। হাসতে-হাসতে বলছেন, "টাকা তুই দিবি। তুই তো কেসটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পাঠিয়েছিলি। এখন তুই আমার ক্লায়েন্ট।"

এবার রঞ্জনকাকুর কথা শুনে শুধু হাসলেন দীপকাকু। বললেন, "এখন ছাড়ছি, পরে কথা হবে।"

ফোনসেটটা পকেটে ঢোকালেন। ঝিনুক পাশে হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, "ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলার দরকার পড়ছে কেন? ট্যাক্সির নম্বরটাই বা কোথা থেকে জোগাড় করলেন?"

"মাথাটা একটু খাটাও, ঠিকই বুঝতে পারবে।"

"ডেট এবং টাইম যেটা বললেন, তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে অজ্ঞাত পরিচয় ছেলেটার এই কমপ্লেক্সে আসার তথ্য। খানিক আগে ভিডিয়ো ফুটেজ থেকে যেটা পাওয়া গেল।"

"এই তো খানিকটা হলেও লিঙ্ক করেছ," খুশি হওয়া গলায় বললেন দীপকাকু। হাঁটার গতি কমিয়ে ফের বলতে থাকলেন, "সি সি টিভি ক্যামেরার জোনে প্রথমে একটা ট্যাক্সির সামনেটুকু দেখা যাচ্ছে। নম্বর পেলাম ওখান থেকেই। ট্যাক্সির গা ঘেঁষেই ছেলেটি জোনে ঢুকল, আন্দাজ করা যায় ওই গাড়িতেই এসেছে। পিছিয়ে গেল ট্যাক্সি। অনুমান যদি ভুল না হয়, ওই ট্যাক্সির ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারব, কোথা থেকে ছেলেটাকে তুলেছিল। এতে ছেলেটির আসল ঠিকানার দিকে কিছুটা অন্তত এগিয়ে যাব।"

কথাগুলো শুনে ঝিনুকের মনে হল এই প্রথম একটা কেসে দীপকাকু যেমন এগোচ্ছেন, একই গতিতে কেসটাও তাঁকে ডেকে নিচ্ছে।

ঝিনুক, দীপকাকু এখন ছাদে। নীচ থেকে লিফটে চড়ে সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটেই যাওয়া হয়েছিল। ডোরবেল বাজাতে দরজা খুলেছিলেন সোমাদেবী। স্নিগ্ধ চেহারা। পরনে ম্যাক্সির উপর ফ্লোরাল প্রিন্টের হাউস কোট। বলেছিলেন, "মিঃ বাগচি তো? ও বলে গিয়েছে এক ঘণ্টার আগেই ফিরে আসার চেষ্টা করবে।"

সুপ্রিয়বাবুর স্ত্রীকে প্রথমবার দেখা গেল। আগের দিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ঘটনার ধাক্কায়। দীপকাকু বললেন, "ছাদটা একবার ঘুরে আসি। চাবিটা দিন তো।"

বিনা বাক্যব্যয়ে চাবি এনে দিয়েছিলেন সোমাদেবী। ছাদে এসেই দীপকাকু এগিয়ে গেলেন পাঁচিলের ধারে, যেখানে হ্যান্ডরেস্টের পাইপের উপর দড়ি বাঁধার দাগ ছিল। বললেন, "দড়ির দাগটা যাতে চিহ্নিত না করা যায়, তার জন্য স্ক্রু কিংবা ছুরি দিয়ে স্ক্র্যাচ করে দেওয়া হয়েছে। সেটা করা হয়েছে আমরা দড়ির দাগ দেখে যাওয়ার পর আর ফরেনসিকের লোক আসার আগে। নীচে পায়ের ছাপও মুছে ফেলা হয়েছে। কনস্টেবল ঘোষবাবু ছাদের দরজায় তালা মেরে আমাদের সঙ্গেই লিফটে উঠেছিলেন। কে এই

কাজগুলো করল, ছাদের চাবি পেল কোথা থেকে?"

"বোঝাই যাচ্ছে লোকটা এই বিল্ডিংয়ের কেউ অথবা এখানকার কারও সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ আছে। কেন না প্রত্যেক ফ্ল্যাটেই ছাদের একটা করে চাবি দেওয়া আছে। আগের দিন সে আমাদের আশপাশেই ছিল, নজর রাখছিল আপনার কাজকর্মের উপর।"

দীপকাকু বললেন, "অপরাধ যে এই রাস্তা দিয়ে হয়েছে, সেটা ক্লিয়ার। তাই প্রমাণ লোপের চেষ্টা। খুন হয়ে যাওয়া ছেলেটি এখানে বাঁধা দড়ি বেয়ে নেমেছে, পায়ে মোজা দেখে সেটা বোঝা যায়। জুতো পরে নামতে অসুবিধে হবে বলে খুলে রেখেছিল। হাতে গ্লাভস দেখে বোঝা যায় চুরির মতলব ছিল তার। দড়ির দাগ মোছা ছেলেটার পক্ষে সম্ভব নয়, খুন হয়ে গিয়েছে নীচে নেমে। অপরাধী উঠে এসেছিল দড়ি বেয়ে। প্রমাণ লোপের কাজটা করে যাচ্ছে এখন। অপরাধী দু'জন হওয়ারও আশঙ্কা আছে, খুন এবং চুরি হয়তো আলাদা-আলাদা জন করেছে।"

> খটকা তবু কাটল না সুপ্রিয়বাবুর। আসলে উনি জানতে চাইছেন দীপকাকুকে অ্যাপয়েন্ট করল কে? সুপ্রিয়বাবুর কোনও শত্রু কি? কোনও পেশাদার লোক বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে না।

সুপ্রিয় পালের ড্রয়িং স্পেসে বসে আছে ঝিনুকরা। দু'জনের জন্য চা, বিস্কুট, ডালমুট-সেন্টার টেবিলে রেখেছেন সোমাদেবী। ঝিনুক 'চা খাই না' বলে ওঁকে আর বিব্রত করতে চায়নি। দীপকাকু এমন স্বচ্ছন্দে মুঠো ডালমুট তুলে নিচ্ছেন প্লেট থেকে, যেন এ বাড়িতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত আছে। ফ্ল্যাটে ঢুকেই দীপকাকু চলে গিয়েছিলেন সুপ্রিয়বাবুর সংগ্রহগুলো দেখতে। ঝিনুকও এটা সেটা দেখতে-দেখতে চোখ বুলিয়েছে ঘণ্টার র‍্যাকে। না, এখন কোনও ফাঁকা জায়গা নেই।

ঝিনুকরা সোফায় বসার আগেই সোমাদেবী চা-স্ন্যাক্স সাজিয়ে দিয়েছিলেন টেবিলে। দীপকাকু কাপে চুমুক দিয়ে বলে উঠেছিলেন, "দারুণ চা।"

খুশি ছড়িয়ে পড়েছিল সোমাদেবীর মুখে। সিঙ্গল সোফায় বসেছেন সোমাদেবী। অপেক্ষা করছেন দীপকাকুর প্রশ্নের। দীপকাকুর মন খাওয়ার দিকে। সোমাদেবী একবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন, নিশ্চয়ই সুপ্রিয়বাবুর ফেরার প্রত্যাশায়। দেওয়াল ঘড়িটাও বেশ অন্য রকম, অ্যান্টিক পিস বলা যায়। চায়ের কাপ-প্লেট টেবিলে নামিয়ে দীপকাকু এবার সোমাদেবীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, আপনি একটু ভাল করে ভেবে দেখুন তো, সেদিন প্রথমে গুলির আওয়াজ শুনেছিলেন নাকি ডোরবেলের আওয়াজ?"

"ডোরবেলের আওয়াজটাই প্রথমে শুনি। গুলির আওয়াজে পুরোপুরি ঘুম ভেঙেছে। ওটা যে গুলির আওয়াজ সেটাই বুঝতে পারিনি। কখনও শুনিনি আগে। কী জোর আওয়াজ! বেডরুম থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে দেখি, ছেলেটা পড়ে আছে এখানে।"

দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "লাইট জ্বালানো ছিল?"

"নাইট ল্যাম্পের মতো একটা আলো জ্বালানো থাকে ড্রয়িংয়ে।"

"তারপর?"

সোমাদেবী বললেন, "ছেলেটাকে দেখার পর আর কিছু মনে নেই। তোর্সা, মানে আমার মেয়ে আর সুপ্রিয় বলছে, আমি নাকি খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।"

"ছেলেটাকে তো সামনে থেকে আপনি দেখেননি। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।"

সোমাদেবী মাথা নেড়ে সায় দিলেন। দীপকাকু ফের বললেন, "আজ কাগজে 'সন্ধান চাই' কলামে পুলিশ ফোটো দিয়েছে ছেলেটির। দেখেছেন?"

"দেখেছি। সুপ্রিয় দেখিয়েছে।"

"ছেলেটাকে আগে কখনও দেখেছেন বলে কি মনে হচ্ছে?"

"না, কোনওদিন দেখিনি।"

দীপকাকু একটু চুপ করে রইলেন। এবার গেলেন প্রসঙ্গান্তরে। বললেন, "এই যে শোপিস সংগ্রহের ঝোঁক, এটা সুপ্রিয়বাবুর কতদিনের?"

"চাকরি পাওয়ার পর থেকে। বিয়ে হয়ে আসার পর খুব বেশি দেখিনি আমি। তখন আমরা টালিগঞ্জের বাড়িতে থাকতাম। ওর পৈতৃক বাড়িতে। শোপিসগুলো সাজিয়েগুছিয়ে রাখার মতো স্পেস ছিল না। মেয়ে হওয়ার পর এই ফ্ল্যাটটা কেনা হয়। সাজানোর জায়গা পেয়ে ওর কালেকশনের ঝোঁকটা এখন নেশায় পরিণত হয়েছে।"

"শুধু শোপিস কালেকশনের জন্য সুপ্রিয়বাবু কখনও টুরে যান?"

"না, সে সময় কোথায়। অফিসে যা কাজের প্রেশার! টুরে যায় কোম্পানি পাঠালে, আর বছরে একবার অন্তত ফ্যামিলি টুরে। বেড়াতে গিয়ে সিনিক বিউটির দিকে নজর থাকে না ওর। লোকাল হ্যান্ডিক্রাফ্টসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে," বলে থমকে গেলেন সোমাদেবী। ভ্রূ জোড়া ঘনিষ্ঠ হল তাঁর। জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, এসব কথার সঙ্গে আমাদের ফ্ল্যাটের দুর্ঘটনার কী সম্পর্ক?"

থতমত খেলেন দীপকাকু। বললেন, "না না, ওই ঘটনার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক খুঁজছি না। এত রকম হ্যান্ডিক্রাফ্টসের কালেকশন দেখে ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানার কৌতূহল হল।"

বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলেন সুপ্রিয়বাবু। দীপকাকুর

দিকে তাকিয়ে বললেন, "আই অ্যাম সো সরি। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাদের। আসলে আমার লাইফ ইনশিওরেন্স করে যে এজেন্ট তার শরীরটা খারাপ। প্রিমিয়ামের লাস্ট ডেট চলে এসেছে। কুঁদঘাটে গিয়ে ওকে দেখেও এলাম, চেকটাও দেওয়া হল। রবিবার বলেই কাজটা রেখেছিলাম আজ।"

"ইট্‌স অল রাইট। আমরা তো দিব্যি চা-টা খাচ্ছি, গল্প করছি," বললেন দীপকাকু।

অপর সিঙ্গল সোফাটায় এসে বসলেন সুপ্রিয়বাবু। সোমাদেবী উঠে পড়ে হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, "চা খাবে তো?"

"হ্যাঁ, করো। এঁদেরও আর-একবার দাও।"

"আমি আর না," সোমাদেবীর দিকে তাকিয়ে বলল ঝিনুক। উনি জোর করলেন না। সৌজন্যের হাসি হেসে ভিতরে চলে গেলেন।

সুপ্রিয়বাবু বললেন, "একটা ব্যাপার আগে একটু ক্লিয়ার করে দিন তো। থানার মিঃ রায় আমাকে জানালেন ইন্টারোগেট করতে আপনি আসছেন। প্রথমদিন আপনি ইনপেকশনে ছিলেন। যেহেতু সিভিল ড্রেসে, আপনার পোস্ট, ডিপার্টমেন্ট আন্দাজ করতে পারিনি। আজ আবার আসছেন জেনে অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সি আই ডি-র লোক কিনা? অফিসার বললেন, আপনি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। পুলিশের হয়েও অনেক কাজ করেন। একথার মানে কী?"

"মানেটা আপনি যা বুঝেছেন, সেটাই। এবার যদি স্থির করেন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের সঙ্গে কথা বলবেন না, আমি ফোর্স করতে পারি না।"

"নো-নো, আই ডিড নট মিন দ্যাট। ইনফ্যাক্ট তদন্তটা দ্রুত শেষ হোক, আমিও সেটা চাই। আজ কাগজে ছেলেটার ফোটো দিয়েছে পুলিশ, নিশ্চয়ই দেখেছেন?"

"দেখেছি।"

"এবার আমার কী সমস্যা হবে বলি, ফোটোটা দেখে ছেলেটার আত্মীয়, বন্ধুরা যাবে থানায়। পুলিশ বলবে, আমার ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া গিয়েছে ডেডবডি। ওরা এখানে আসবে। আমাকেই দোষী ঠাওরে আকথা-কুকথা বলবে। এমনকী, টাকাও চাইতে পারে। আমি চাইব ওরা এখানে আসার আগেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে রাখতে। আপনি আলাদা করে তদন্ত চালিয়ে অপরাধীকে যদি ধরে দেন, তাতে আমারই লাভ। এর জন্য আমি আপনাকে পে করতেও রাজি।"

"আমার পেমেন্ট নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। শুধু ইনভেস্টিগেশনে কোঅপারেট করলেই হবে।"

ধন্দ তবু কাটল না সুপ্রিয়বাবুর। আসলে উনি জানতে চাইছেন দীপকাকুকে আপয়েন্ট করল কে? সুপ্রিয়বাবুর কোনও শত্রু কি? কোনও পেশাদার লোক বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে না।

"আমরা কি এবার কেসটা নিয়ে কথা বলতে পারি?" কপট সৌজন্যে বললেন দীপকাকু।

সুপ্রিয়বাবুর যেন সংবিত ফিরল। বললেন, "ওহ্, শিওর।"

শুরু করলেন দীপকাকু, "ঘটনার আগের দিন সকাল থেকে কে-কে এই ফ্ল্যাটে এসেছিল মনে করে বলতে পারবেন?"

"আমি সাড়ে আটটা নাগাদ অফিস বেরিয়ে যাই। তার আগে কাজের মহিলাটি আসেন। সেদিনও এসেছিলেন। তারপর কারা এসেছেন বলতে পারবে সোমা..."

চা নিয়ে এসেছেন সোমাদেবী। নিজের জন্যও এক কাপ এনেছেন। প্রশ্ন-উত্তর কানে গিয়েছে সোমাদেবীর, "সোফায় বসে চায়ে চুমুক দিয়ে বলতে থাকলেন, সকালে মঙ্গলাদি কাজ করে গেল দশটা নাগাদ। তারপর আমার ভাই এসেছিল বিকেল তিনটেয়।"

"ভাই কী করেন? কেন এসেছিলেন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"সন্তু যাদবপুর থেকে হিস্ট্রিতে পিএইচ ডি করছে। সময় পেলে আমার কাছে গল্প করতে চলে আসে।"

সোমাদেবী থামতেই দীপকাকু বলে উঠলেন, "তারপর? কে-কে এসেছে পরপর বলে যান।"

একটু ভেবে নিয়ে সোমাদেবী বললেন, "সাড়ে চারটেয় এল অমৃতা। গুজরাতি, নতুন বিয়ে হয়েছে। এইট্‌থ ফ্লোরে থাকে। বাঙালি ডিশ শিখতে এসেছিল। তোর্সা স্কুল থেকে ফিরল পাঁচটায়, ওর ড্রয়িংস্যার এল সাড়ে পাঁচটায়।"

"ড্রয়িংস্যারের নাম, থাকেন কোথায়?" দীপকাকুর প্রশ্ন।

সোমাদেবী বললেন, "অনুপম ঘোষাল। বেকবাগানে থাকে। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ফাইনাল ইয়ার," একটু থেমে ফের বলতে থাকলেন, "তারপর এসেছিল আদিত্য, আমাদের হাউজিংয়ের কেয়ারটেকার। সেকেন্ড ফ্লোরের সুজনবাবুর ট্যাক্সের বিল ভুল করে আমাদের দিয়ে ফেলেছিল, বদলে নিয়ে গেল।"

"বিলটা নেওয়ার সময় আপনারা দেখে নেননি?" খানিক বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

সুপ্রিয়বাবু বলে উঠলেন, "ওদের টাইটেল পাত্র। সুজন পাত্র। আমি পাল, কর্পোরেশনের ট্যাক্সের বিল তিন মাস অন্তর আসে, দেখতে সেই একই রকম, নতুন করে পড়তে ইচ্ছে হয় না। নাম বিভ্রাট তাই চোখে পড়েনি।"

"আদিত্য যখন এসেছিল, ড্রয়িংস্যার তখনও নিশ্চয়ই যাননি? ড্রয়িং শেখাচ্ছিলেন কোথায় বসে?" প্রশ্নটা দীপকাকু সোমাদেবীর দিকে তাকিয়ে করলেন।

"সিটিং এরিয়া থেকে সামান্য দূরে," আঙুল নির্দেশ করে সোমাদেবী বললেন, "ওইখানে, চেয়ার-টেবিলে বসে ড্রয়িং শেখাতে চায় না অনুপম। মেঝেতেই ওর সুবিধে হয়। একটা ম্যাট পেতে দিই।"

"ট্যাক্সের বিল খুঁজে পেতে কতক্ষণ সময় লেগেছিল আপনার?"

সোমাদেবী বললেন, "ভিতরের ঘরের আলমারিতে ছিল। খুঁজতে হয়নি। এক চান্সেই পেয়েছিলাম। আদিত্যকে ঘরে ঢুকে বসতেও হয়নি।"

"তারপর কে এল?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

"সাড়ে ছ'টার মধ্যে ও (সুপ্রিয়বাবুকে নির্দেশ করে) এল। রাতের ফ্লাইট ধরবে বলে তাড়াতাড়ি ফিরেছিল অফিস থেকে। তার মিনিটদশেকের মধ্যে এলেন আমাদের বিল্ডিংয়ের তারাশঙ্করদা, শিলাদ আর রুদ্র। একসঙ্গে।"

"কেন এসেছিলেন?"

"প্রত্যেক শীতে পিকনিক হয়, সে ব্যাপারে কিছু দরকারি আলোচনা করতে এসেছিলেন।"

"বাই প্রফেশন এঁরা কে কী করেন?"

সুপ্রিয়বাবু বললেন, "তারাশঙ্করদা সদ্য ব্যাঙ্ক থেকে রিটায়ার করেছেন। শিলাদ আমারই মতো একটা কর্পোরেট কোম্পানিতে চাকরি করে। রুদ্রর একটা অ্যাড এজেন্সি আছে। ছোটখাটো। স্ট্রাগল করছে বিজনেসটা দাঁড় করানোর জন্য।"

"আচ্ছা, সেদিন তিনজন এখানেই বসে ছিল, নাকি ফ্ল্যাটের এদিক-ওদিক গিয়েছিল ওঁদের মধ্যে একজন?"

সোমাদেবী বললেন, "সেদিন প্রথমে সোফায় এসে বসেছিলেন তিনজন। তারপর কে কখন কোথায় গিয়েছেন খেয়াল করিনি। আমি কিচেনে বিজি ছিলাম।"

"আমার যত দূর মনে পড়ছে রুদ্র একবার উঠে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে রাখা বোতল থেকে জল খেয়েছিল। তারাশঙ্করদা গিয়েছিল তোর্সার ঘরে, গল্পগাছা করতে, লেখাপড়ার খবর নিতে। তারাদার সঙ্গে তোর্সার খুব জমে," বললেন সুপ্রিয়বাবু।

দীপকাকু হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। এগিয়ে গেলেন শোপিসের র‍্যাকের দিকে। কালেকশনে চোখ বোলাতে-বোলাতে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, "আপনার ওই তিনবন্ধু এই সব কালেকশনের ব্যাপারে কতটা আগ্রহী?"

সুপ্রিয়বাবুও সোফা থেকে উঠে দীপকাকুর দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, "ওঁরা আমার হবিটাকে খুবই অ্যাপ্রিশিয়েট করে। শিলাদও হ্যান্ডিক্র্যাফটস কালেকশন শুরু করেছে। তারাদাও এখন ঘরের জন্য যা কিছু কেনেন, আর্ট ভ্যালু রাখার চেষ্টা করেন। রুদ্র আর্টের জগতের লোক। তবে কালেকশনের ঝোঁক নেই।"

দীপকাকু এখন কাচের ক্যাবিনেটের মাঝামাঝি। পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সুপ্রিয়বাবু। দীপকাকু বললেন, "আপনাদের পাশের ফ্ল্যাটটা তারাশঙ্করদার তাই না?"

এবার অবাক হলেন দম্পতি। পরস্পরে চোখাচোখি হল। সুপ্রিয়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, আপনি খবর নিয়েছেন?"

মাথা নেড়ে দীপকাকু বললেন, "গেস করলাম।"

ঝিনুক এটুকু আন্দাজ করতে পারছে, ওই তিনজনের একজন পাশের ফ্ল্যাটের মালিক। কারণ, ঘটনার পরের সকালে পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের সময় কনস্টেবল চা এনেছিল পাশের ফ্ল্যাট থেকে। ওঁরাই নিজে থেকে করে দিয়েছিলেন। শৌখিন সার্ভিং ট্রে, কাপ দেখে দীপকাকু কমেন্ট করেছিলেন, "এই ফ্ল্যাটের রুচি পাশের ফ্ল্যাটেও প্রভাব ফেলেছে দেখছি।" সুপ্রিয়বাবুর শখ অল্পবিস্তর প্রভাব ফেলেছে তিনবন্ধুর উপরেই। পাশের ফ্ল্যাটটা যে তারাশঙ্করবাবুর, এটা দীপকাকু কীভাবে গেস করলেন, কে জানে! ক্যাবিনেটের হাফ রাউন্ড কাচের পাল্লার হ্যান্ডেলে হাত রেখেছেন দীপকাকু বলে উঠলেন, "ক্যাবিনেটের অন্য পাল্লাগুলোর লক পুরনো, এটার মনে হচ্ছে নতুন কবে লাগানো হল?"

"রাউন্ড শেপের পাল্লার লক সহজে পাওয়া যায় না। সমস্ত ক'টা লক ক্যাবিনেট বানানোর পর বানিয়েছি। রাউন্ড পাল্লার লক পেলাম সেদিন।"

"কোনদিন?"

"এই তো, এ মাসের প্রথম দিকে।"

"লক লাগাচ্ছেন মানে আপনার কালেকশন ক্রমশ মহার্ঘ হয়ে উঠছে?"

"না-না সেরকম দামি কিছু হয়ে ওঠেনি। লোকজন এসে জিনিসগুলো হাতে নিয়ে দেখে, বেশ কিছু কাচের জিনিসও তো আছে, যদি ভেঙেটেঙে ফেলে, তাই লকের ব্যবস্থা করেছি।"

"হাফ রাউন্ড পাল্লাটার লক কোথায় পেলেন শেষ পর্যন্ত?"

"কাছেই, একটা হার্ডওয়্যারের দোকানে বলে রেখেছিলাম। ওরাই এনে দিয়েছে।"

"লকটা লাগাল কে? আপনাদের চেনা কোনও কাঠের মিস্ত্রি?"

"না, দোকানের মিস্ত্রিই লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে," বললেন সুপ্রিয়বাবু।

দীপকাকু পাল্লা সামান্য খুলে হাসতে-হাসতে বললেন, "লক লাগানোর পরেও পাল্লা খোলাই আছে। আপনার পারপাস তো সার্ভ হচ্ছে না।"

"যা হয়, এই সব শোকেসে, কাউকে হয়তো জিনিসগুলো হাতে নিয়ে দেখিয়েছি, লক লাগাতে ভুলে গিয়েছি নিজেই।"

দীপকাকু কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন, "এই র‍্যাকে যে দামি জিনিসটার জন্য আপনি লক করে রাখার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, সেটা এখন নেই বলে পাল্লা খোলা রাখা হয়েছে।"

ডোরবেল বেজে উঠল। সোমাদেবী দরজা খুলতে উঠে যাচ্ছেন, বললেন, "তোর্সা ফিরল মনে হচ্ছে।"

> ক্যাবিনেটের সামনে চলে এসেছে দু'জন। দীপকাকু কেন কাজটা দিলেন বুঝতে অসুবিধে হয়নি ঝিনুকের। উনি যদি সুপ্রিয়বাবুকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনার কালেকশনে ক'টা ঘড়ি আছে, তা হলে এখন যে-ক'টা আছে, সেটাই বলতেন তিনি।

দরজা খোলার পর মায়ের পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল তোর্সা। ভারী সুন্দর দেখতে। ঝিনুককে অবাক হয়ে দেখছে, ঘাড় ফেরাল দীপকাকুর দিকে। সোমাদেবী মেয়েকে বললেন, "চল, হাত-মুখ ধুয়ে নে।"

তোর্সা এগিয়ে গেল ভিতরের ঘরের দিকে। ওর এক হাতে ঝুলছে নূপুরের বটুয়া। ঝিনঝিন শব্দ উঠল। মেয়েকে অনুসরণ করলেন সোমাদেবী। সিটিং এরিয়ায় ঝিনুক এখন একা। ভাবছে দীপকাকুর কাছে উঠে যাবে কিনা। সুপ্রিয়বাবুর কোনও অফিশিয়াল ফোন এসেছে, দীপকাকুর পিছনে দ্রুত পায়ে পায়চারি করতে-করতে উত্তেজিত গলায় কথা বলছেন। উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে সামনের পরিস্থিতি। ফোনের কথা শেষ হোক, তারপর ঝিনুক ওদিকে যাবে।

"হাই! আমি তোর্সা।"

অল্প চমকে উঠল ঝিনুক। খেয়ালই করেনি কখন সুপ্রিয়বাবুর মেয়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝিনুক বলল, "হ্যালো, আমি আঁখি, আঁখি সেন।"

"নাইস নেম!" বলে ঝিনুকের পাশে সোফায় বসল তোর্সা।

ঝিনুক বলল, "তোমার নামটাও খুব সুন্দর!"

হাসল তোর্সা। ক্লাস সিক্সের তুলনায় মেয়েটি যথেষ্ট স্মার্ট। ঝিনুককে বলল, "তুমি ডিটেকটিভের অ্যাসিস্ট্যান্ট?"

ভিতরে মায়ের কাছে জেনে এসেছে। ঝিনুক মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বোঝাল।

তোর্সা বলল, "ডিটেকটিভ গল্পে তোমার মতো ইয়াং অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে। ভাবতাম বানানো। এখন দেখছি সত্যি!"

এর আর কী উত্তর দেবে ঝিনুক! মুখটা হাসি-হাসি করে রাখল। ফের তোর্সা বলল, "তুমি সুইমিং, সাইক্লিং, হর্স রাইডিং, জুডো ক্যারাটে জান?"

ঝিনুক ঘাড় হেলিয়ে সংকেতেই 'হ্যাঁ' করে। খুশি হবে মেয়েটা।

তোর্সার জানা শেষ হয়নি। জিজ্ঞেস করল, "মোটরবাইক চালাতে পার? কার? বন্দুক, মানে গান চালাতে পার?"

এবারও ঝিনুক ঘাড় হেলিয়ে দেয়। মোটরবাইক চালাতে সে পারে। গাড়ি চালানো শিখছে আশুদার কাছে। বাবার গাড়ি চালায় আশুদা। বন্দুক কখনওই চালায়নি ঝিনুক।

"জান আঁখিদি, বাপিকে কবে থেকে বলছি, ড্রাইভিংটা শেখাতে, বাপি দারুণ গাড়ি চালায়..."

কথা বলে যাচ্ছে মেয়েটা, ঝিনুকের চোখ চলে গিয়েছে দীপকাকুর দিকে, মোবাইলের স্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়াচ্ছেন। কাউকে ফোন করবেন। কিন্তু এতক্ষণ সময় লাগছে কেন নাম সার্চ করতে?

"তোমরা কি জানতে পারলে যে লোকটা আমাদের ড্রয়িংরুমে মার্ডার হতে পড়েছিল, সে কে?" তোর্সার প্রশ্ন।

ঝিনুক ঘাড় না ফিরিয়ে উত্তর দিল, "খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারব।"

মেসেজ টোন বেজে উঠল ঝিনুকের মোবাইলে। সেটটা জিনসের পকেট থেকে বের করে স্ক্রিনে চোখ রেখে ভীষণ অবাক হল ঝিনুক। দীপকাকু মেসেজ পাঠিয়েছেন। খানিক আগে তার মানে এস এম এস টাইপ করছিলেন। তোর্সাকে আড়াল করে এস এম এস ওপেন করেছে ঝিনুক। লেখা আছে, "কথার ছলে জানতে চাও র‍্যাকে ঘণ্টার সংখ্যা কত।"

দীপকাকু, সুপ্রিয়বাবু এগিয়ে আসছেন, বসবেন সোফায়।

ঝিনুক তোর্সাকে বলল, "চলো, তোমাদের শোপিসগুলো দেখি।"

"চলো, বাপির তো হিউজ কালেকশন। আমাদের বাড়ি যারাই আসে, এগুলো দেখতেই থাকে। তুমি তো আগে একদিন এসেছিলে, দেখোনি?"

ঝিনুক কোনও উত্তর দেয় না। তোর্সা নিজে থেকেই বলতে থাকে, "সেদিন কী করে দেখবে! যা একটা মিসহ্যাপ হল। ওই নিয়েই বিজি ছিলে।"

ক্যাবিনেটের সামনে চলে এসেছে দু'জন। দীপকাকু কেন কাজটা দিলেন বুঝতে অসুবিধে হয়নি ঝিনুকের। উনি যদি সুপ্রিয়বাবুকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনার কালেকশনে ক'টা ঘণ্টা আছে, তা হলে এখন যে-ক'টা আছে, সেটাই বলতেন তিনি। চুরি যাওয়া অথবা নিজের সরিয়ে রাখা ঘণ্টাটার কথা উনি প্রথম থেকেই গোপন করে যাচ্ছেন। এই গোপনীয় কাণ্ডকারখানা স্ত্রীকে জানালেও, নিজের ছোট্ট সন্তানটিকে নিশ্চয়ই বলতে যাবেন না। বললেও লাভ হবে না, ছোটরা

গোপন কথাটা সবচেয়ে আগে প্রকাশ করে দেয়। ঝিনুক কথার জাল বুনতে শুরু করে। তোর্সার উদ্দেশ্য বলে, "এখানে অনেক আর্টপিস দেখছি বাইরের দেশের। শুনলাম অফিস ট্যুরে তোমার বাবাকে প্রায়ই দেশের বাইরে যেতে হয়। তখনই এগুলো কালেকশন করেন। তুমি কখনও গিয়েছ বাবার সঙ্গে বিদেশে?"

"একবারই মাত্র গিয়েছি। সিঙ্গাপুর। আমি, বাপি, মা।"

"আচ্ছা, এই যে গণেশের মূর্তিগুলো, এর কোনগুটা নিশ্চয়ই বিদেশের নয়? ভারতেই তো ভগবান গণেশের খুব চল।"

"না-না, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের গণেশের মূর্তি আছে এখানে। ট্যাগগুলো দেখো।"

ঝিনুক ঝুঁকে পড়ে গণেশের র‍্যাকটা দেখতে থাকে। জিজ্ঞেস করে, "ক'টা মূর্তি আছে?"

"থার্টি ওয়ান। লাস্ট ওয়ান বাপি শ্রীলঙ্কা থেকে নিয়ে এসেছে। এই যে এইটা," বলে একটা মূর্তির দিকে আঙুল দেখাল তোর্সা।

ঝিনুক সময় নষ্ট না করে উপরের র‍্যাকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ঘণ্টাগুলোও তো দেখছি নানান দেশের। টোটাল কালেকশন কত?"

"টোয়েন্টি ফাইভ।"

হতাশ হল ঝিনুক। পঁচিশটাই আছে, ফোটোয় দেখা বৌদ্ধমন্দিরের ঘণ্টা এখানেই ছিল। ঠিক ওরকম দেখতে ঘণ্টা একটাও দেখা যাচ্ছে না। ঘণ্টা এখান থেকে সরালেও, অঙ্কটা মিলিয়ে রেখেছেন সুপ্রিয়বাবু। কীভাবে মেলালেন? দীপকাকুর গলা ভেসে আসে। সুপ্রিয়বাবুর উদ্দেশে বলছেন, "ঘটনার আগের দিন এই ফ্ল্যাটে যারা এসেছিল বললেন, তাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হত।"

"চারজনকে এখনই ডেকে দিতে পারি। রবিবার যেহেতু, শিলাদ আর রুদ্র ফ্ল্যাটে আছে নিশ্চয়ই। তারাশঙ্করদা রিটায়ার্ড পার্সন, রোজ ছুটি। আদিত্যকে সবসময় পাওয়া যাবে এই কমপ্লেক্সে। গোটা হাউজিংয়ের দায়িত্ব তার," বললেন সুপ্রিয়বাবু।

আবার দীপকাকুর গলা, "আপনাদের কাজের মহিলাটির সঙ্গে প্রথমে কথা বলে নিতে পারলে সুবিধে হত আমার।"

"ওকে তো এখন পাবেন না, দশটায় কাজ সেরে চলে গিয়েছে," এটা বললেন সোমাদেবী।

[illegible] বলে উঠল, "[illegible] মঙ্গলাদিকে? [illegible] ফ্ল্যাটে [illegible] ফ্ল্যাটে ফোন করলেই [illegible]"

> দীপকাকু চারজনকে যে প্রশ্নগুলো করেছেন, তা এই রকম, এক, খুন হয়ে পড়ে থাকা ছেলেটি কীভাবে ঢুকেছিল ঘরে, আমরা যেমন ভাবছি, আপনিও নিশ্চয়ই ভাবছেন, কোথাও রাস্তা দেখতে পেয়েছেন কি? উত্তরে চারজনই বলেছেন, পাননি।

সোমাদেবী সোফা থেকে উঠে ল্যান্ডফোনের দিকে এগোলেন। কালেকশন দেখায় ক্ষান্ত দিয়ে ঝিনুক ফিরে আসছে। দীপকাকু সুপ্রিয়বাবুকে বলছেন, "চেন্নাই ট্যুর ক্যানসেল হল আপনার। তার আগের ট্রিপ কোথায় ছিল?"

"মুম্বই।"

তোর্সা শুধরে দিল, "না বাপি, এন জে পি। বাগডোগরার ফ্লাইট ধরলে না?"

"সেটা মুম্বইয়ের আগে।"

"হতেই পারে না। এন জে পি থেকে একটা দারুণ বেল এনেছিলে। ভেঙে গেল সেটা, খুব আপসেট হয়ে গিয়েছিলে তুমি।"

মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে সুপ্রিয়বাবুর, দু'বার ঢোক গিললেন। বললেন, "ইয়েস, ঠিক বলেছিস। মুম্বইয়ের পর এন জে পি। এত ট্যুর করি, গুলিয়ে যায়।"

"এন জে পি থেকে আনা ঘণ্টাটা কীভাবে ভাঙল?" প্রশ্নটা সরাসরি তোর্সাকে করলেন দীপকাকু।

তোর্সা বলল, "আমি তখন ছিলাম না, মা-ও ছিল না। আমরা শপিং মলে গিয়েছিলাম।"

ফোন সেরে ফিরে এলেন সোমাদেবী। সোফায় বসে বললেন, "আসছে মঙ্গলাদি।"

"ফাইন," বলে দীপকাকু সুপ্রিয়বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভেঙে যাওয়া ঘণ্টাটার টুকরোগুলো কি আছে?"

"না, রেখে কী হবে! ফেলে দিয়েছি।"

"সোমাদেবী, তোর্সা আসার আগেই?"

"হ্যাঁ, কেন বলুন তো? ভাঙা টুকরোগুলো দেখে ওদের মন খারাপ হত বলেই ফেলে দিয়েছি।"

দীপকাকু ফের জানতে চাইলেন, "এন জে পি-র কোথা থেকে কিনেছিলেন বেলটা? কেমন দেখতে ছিল?"

"শিলিগুড়ির হংকং মার্কেট থেকে কিনেছিলাম। দারুণ দেখতে ছিল।"

"বুদ্ধিস্টদের ঘণ্টার মতো?"

ফের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল সুপ্রিয়বাবুর। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি জানলেন কী করে?"

"আন্দাজ করা খুবই সহজ। উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে। বৌদ্ধদের জপযন্ত্র, ঘণ্টা অনেক কিছুর রেপ্লিকা পাওয়া যায় হংকং মার্কেটে।"

ডোরবেল বেজে উঠল।

ছুটে গিয়ে দরজা খুলল তোর্সা। বছরপঁয়তাল্লিশের মহিলাটির পরনে অনুজ্জ্বল শাড়ি। সোমাদেবীকে বলল, "হ্যাঁ বউদি, কী বলছ বলো?"

সোমাশ্রী বললেন, "থানা থেকে ওঁকে পাঠিয়েছে। তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।"

মুহূর্তের মধ্যে মহিলার চেহারায় একটা জড়সড় ভাব এসে গেল। দীপকাকু বললেন, "তোমার পুরো নাম, কোথায় থাকো, বাড়িতে কে-কে আছে, কী করে তারা, এক-এক করে বলে যাও।"

"মঙ্গলা দাস। বালিগঞ্জের স্টেশন ধারের কলোনিতে থাকি। বাড়িতে আমি, এক ছেলে, এক মেয়ে আর ওদের বাবা। ছেলে অটো চালায়, মেয়ে আমার মতোই লোকের বাড়ি কাজ করে। ওদের বাবা রং মিস্ত্রি।"

"মেয়ের বিয়ের চেষ্টা চালাচ্ছ তো?"

"হ্যাঁ, দেখাশোনা চলছে। পাত্রপক্ষ আসছে অনেক। কিন্তু সকলের যা খাঁই!"

"ক'টা বাড়িতে কাজ করো তুমি?"

"আটটা।"

"তার মানে তো অনেক! সব বাড়িতেই তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়। এবাড়ির ব্যালকনিটা ঝাড়পোঁছা করো রোজ?"

মঙ্গলাদি বলল, "পেটের দায়ে এত বাড়ি কাজ করি। ফাঁকি কোথাও দিই না।"

"এবাড়িতে যে খারাপ ঘটনাটা ঘটেছে, জান নিশ্চয়ই। তার আগের দিন ব্যালকনি ঝাড়পোঁছের পর দরজাটা ভাল করে বন্ধ করেছিলে?"

"করেছিলাম।"

"দরজার দু'পাশের জানলা খুলে পরিষ্কার করেছিলে তো?"

চট করে ঘাড় কাত করল কাজের মহিলাটি।

এতক্ষণে ঝিনুকের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে দীপকাকু আসলে কী জানতে চাইছেন। অপরাধীর ঢোকার রাস্তায় কোনও ফাঁকফোকর ছিল কিনা, বুঝে নিচ্ছেন সেটাই।

"তোমার মোবাইল নম্বরটা বলো তো। পরে কথা বলার দরকার পড়তে পারে।"

মঙ্গলাদি গড়গড় করে বলে গেল নম্বর। দীপকাকু মোবাইলে নম্বরটা সেভ করে মঙ্গলাদিকে বললেন, "ঠিক আছে, এবার তুমি আসতে পার।"

"ওর ফোন নম্বরটা কেন নিলেন জানতে পারি?" বললেন সুপ্রিয়বাবু।

মাথা নেড়ে দীপকাকু বললেন, "ইনভেস্টিগেশন চলাকালীন বলা যাবে না।"

নিশ্চয়ই আহত হলেন সুপ্রিয়বাবু। সেটা প্রকাশ না করে চলে গেলেন অন্য প্রসঙ্গে। বললেন, "আর চারজনকে তা হলে ডেকে নিই?"

"না, আমি তাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে কথা বলব। মানুষগুলোর সঙ্গে তাদের বাসস্থানের উপরও চোখ বোলাতে চাই। আপনি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে ওদের প্রত্যেকের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাবেন। এমন কিছু প্রশ্ন ওদের আমি করব, যা আপনাদের সামনে করা যাবে না।"

"ও কে। নো প্রবলেম। চলুন তা হলে," সোফা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন সুপ্রিয় পাল।

দীপকাকু হাতের ইশারায় বসতে নির্দেশ করে বললেন, "একটা ব্যাপার জিজ্ঞেস করব-করব ভেবেও ভুলে যাচ্ছি। আচ্ছা, যে রাতে গুলির আওয়াজের পর এই আবাসনের কে-কে এসেছিল আপনার ফ্ল্যাটে? প্রথম যে এসেছিল, তার থেকে শুরু করুন।"

"এই যে, এটা তো আমার পক্ষে বলা মুশকিল। তখন যা মনের অবস্থা!"

তোর্সা বলে উঠল, "প্রথমে এসেছিলেন তারাজেঠু আর জেঠিমা। তারপর আদিত্যআঙ্কল, শিলাদআঙ্কল আর আন্টি। শিবাজিজেঠু এলেন তার খানিক পরে। সুজনজেঠুও এসেছিলেন। তারপর আরও অনেকে এসে পড়ল।"

"রুদ্রবাবু? তোমার বাবার বন্ধু?" তোর্সার কাছে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

তোর্সা বলল, "এসেছিলেন হয়তো পরে, খেয়াল করিনি। আমি মায়ের সঙ্গে ছিলাম।"

সুপ্রিয়বাবু বললেন, "রাতে রুদ্র এসেছিল কিনা বলতে পারব না। পরের দিন ফ্ল্যাটে ইনভেস্টিগেট করার পর পুলিশ যখন থানায় নিয়ে গেল আমায়, রুদ্রও গিয়েছিল। সঙ্গে তারাশঙ্করদা, শিলাদ, আদিত্য ছাড়াও আরও কয়েকজন ছিল।"

"ঠিক আছে। চলুন এবার। তারাশঙ্করবাবুর ফ্ল্যাট থেকে শুরু করা যাক," বলে সোজা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন দীপকাকু।

ঝিনুক ভেবেছিল সাক্ষাৎকার পর্বটা বেশ দীর্ঘ হবে। চারজনের সঙ্গে কথা বলবেন দীপকাকু। তা কিন্তু হয়নি। চারজনকে চারটে করে প্রশ্ন করেছেন দীপকাকু। একই প্রশ্ন। ঝিনুকের মনে হয়েছে প্রশ্নগুলো যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বোধ হয় দীপকাকুর বেশি দরকার ছিল ওঁদের ফ্ল্যাটের ভিতরটা দেখায়। কথা বলতে-বলতে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছিলেন। নিশ্চয়ই ক্লু খুঁজছিলেন এই কেসের। কিছু পেলেন কিনা এখনই জানা যাবে না। পরে বলবেন। পাশের ফ্ল্যাটের তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে দীপকাকুকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিয়ে সুপ্রিয়বাবু বলেছিলেন, "আমি বাকি তিনজনকে খবর দিয়ে আসি আপনি আসছেন। তারা যদি কাছাকাছির মধ্যে বাইরে কোথাও গিয়ে থাকে, ফোন করে ডেকে নেব।"

তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা সারার পর ঝিনুকরা বাইরে এসে দেখেছিল, সুপ্রিয়বাবু তাদের নিতে চলে এসেছেন। এর পর যাওয়া হয়েছিল সুপ্রিয়বাবুদের ঠিক উপরে শিলাদ রায়চৌধুরীর ফ্ল্যাটে। তারপর রুদ্রপ্রতাপ সেন, সুপ্রিয়বাবুর ফ্ল্যাটের নীচের তলায় বাঁ দিকে। কেয়ারটেকার আদিত্য মজুমদার থাকেন কোয়ার্টারে, সিকিউরিটি রুম থেকে খানিকটা দূরে বাউন্ডারি ওয়ালের ধার ঘেঁষে। একা থাকেন। বয়স বাকি তিনজনের চেয়ে অনেকটাই ছোট, চেহারায় বেশ একটা কর্মিতকর্মা ভাব। ঝিনুকরা এখন সেখান থেকে বেরিয়ে হেঁটে যাচ্ছে গেটের দিকে। ওখানে দীপকাকুর বাইক। দীপকাকু চারজনকে যে

প্রশ্নগুলো করেছেন, তা এই রকম, এক, খুন হয়ে পড়ে থাকা ছেলেটি কীভাবে ঢুকেছিল ঘরে, আমরা যেমন ভাবছি, আপনিও নিশ্চয়ই ভাবছেন, কোথাও রাস্তা দেখতে পেয়েছেন কি? উত্তরে চারজনই বলেছেন, পাননি। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ছেলেটি কী কারণে ঢুকেছিল বলে মনে হয় আপনার? তিনজনের উত্তর ছিল, জানি না। একমাত্র আদিত্যবাবু বলেছেন, আমার তো মনে হয় চুরি করতে। তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, সুপ্রিয়বাবুর কালেকশনে বিশাল দামি কিছু আছে বলে কি মনে হয় আপনার? তারাশঙ্করবাবু আর শিলাদ রায়চৌধুরীর বক্তব্য, তেমন দামি কিছু নেই। সুপ্রিয় অবশ্য নিজের কালেকশনের সব কিছুকেই রেয়ার মনে করেন। রুদ্রবাবু বললেন সম্পূর্ণ বিপরীত, কালেকশন দামি হয়ে উঠছে বলেই তো প্রায় সব পাল্লায় লক লাগাচ্ছে। আদিত্যবাবুর বক্তব্য আবার অন্য রকম। বলেছেন, বাইরের ক্যাবিনেটের লকগুলো লোক দেখানো, আই ওয়াশ। দামি কালেকশন যদি কিছু থাকে, আছে ঘরের আলমারিতে। সেখান থেকে নজর ঘোরাতেই ক্যাবিনেটে লকের ব্যবস্থা। কাচের পাল্লায় তালা লাগানোর কী দরকার বলুন তো? চোর কাচ ভেঙেই চুরি করে নেবে।

পয়েন্টটা যথেষ্ট ভ্যালিড মনে হয়েছে ঝিনুকের। শেষ প্রশ্নটা ছিল সবচেয়ে চমকপ্রদ, সুপ্রিয়বাবুর সংগ্রহে কোনও অ্যান্টিক পিস্তল কখনও কি দেখেছেন আপনারা? এক্ষেত্রে চারজনই বলেছেন, দেখেননি। ফ্ল্যাট থেকে বেরনোর সময় প্রত্যেকের ফোন নম্বর নিয়েছেন দীপকাকু। মোটরবাইকের কাছে এসে পড়ল ঝিনুকরা।

মদন লোহার কসবা কীভাবে যেতে হবে বলে দিয়েছিল ডাবলাকে। শিয়ালদায় নেমে ডাবলা গিয়েছিল কসবায়, যিনি চাকরি দেবেন, তাঁর বাড়ি খুঁজে পায়নি। ঠিকানা, ফোন নম্বর লেখা একটা চিরকুটে ফিরে আসে মদনের ডেরায়।

বাইকের হ্যান্ডেলে ঝোলানো হেলমেট দুটো নিতে গিয়ে থমকে গেলেন দীপকাকু, স্পিড মিটারের উপর থেকে তুলে নিলেন একটা চিরকুট। পড়ে নিয়ে ঝিনুকের দিকে বাড়িয়ে দিলেন কাগজটা। বললেন, "এই নাও সার্টিফিকেট। আমাদের কাজের প্রাথমিক স্বীকৃতি।"

চিরকুটটা নিল ঝিনুক। কম্পিউটারে বাংলা অক্ষরে লেখা, 'কেসটা খুনের। খুন হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। সাবধান!'

॥ ৩ ॥

ট্রেনটা অনেকক্ষণ হল খুব আস্তে চলছে। সাইড আপার বার্থে উপুড় হয়ে বই পড়ছে ঝিনুক। ভুটানের উপর বই। দীপকাকু পড়তে দিয়েছেন। কাল সন্ধেবেলা লাগেজ নিয়ে ঝিনুককে বাড়ি থেকে নিতে এসেছিলেন, বইটা দিয়ে বলেছিলেন, "সঙ্গে নিয়ে নাও। ট্রেনে যেতে-যেতে পোড়ো।"

যেহেতু রাত সাড়ে আটটার ট্রেন, অনেকেই ডিনার করে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। ঝিনুকরাও তাই। যারা দূর থেকে শিয়ালদায় এসে ট্রেন ধরেছে, তাদের ডিনার করার সময়টুকু আলো জ্বালা ছিল। তারপরই যে যার সুখনিদ্রা দিয়েছে। মাথার উপর রিডিং লাইট জ্বেলে বইটার পাতাছয়েক পড়েছিল ঝিনুক। নিস্তব্ধ, প্রায়ান্ধকার কমপার্টমেন্ট, ট্রেনের দুলুনিতে কখন যেন ঘুম এসে গিয়েছিল। ভুটান সম্বন্ধে ওইটুকু পড়েই সে বেশ অবাক হয়েছে। যে দেশটাকে এতদিন সে জানত শান্তির প্রতীক হিসেবে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশ বলে যাকে গণ্য করা হয়, অতীতে সেখানে প্রচুর হানাহানি হয়েছে। গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকত। পার্শ্ববর্তী রাজ্য কোচবিহার, অসম, বাংলার উপর সুযোগ পেলেই আক্রমণ চালাত তারা। মোগল আমল থেকে ইংরেজরা পর্যন্ত যথেষ্ট সমঝে চলত ভুটানের রাজাদের। ভুটান নিয়ে ঝিনুকের বরাবর একটা খটকা ছিল, এমন শান্ত দেশটার জাতীয় পতাকায় মুখ দিয়ে আগুন বেরনো ড্রাগনের ছবি কেন? বইটা পড়তে-পড়তে উত্তর পেয়ে গিয়েছে সে। ভুটান এখন যুদ্ধবিগ্রহে একেবারেই বিশ্বাস করে না। পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা দেশটা জুড়ে শোনা যায় বৌদ্ধমঠের অচঞ্চল ধীর ঘণ্টাধ্বনি, পাখির ডাক, গাড়ির হর্ন বাজানোর প্রায় দরকারই পড়ে না। ট্রেন এন জে পি পৌঁছল সকাল সাতটা নাগাদ। দীপকাকু নিজের জন্য চা, ঝিনুকের কফি কিনেছিলেন হকারের থেকে। কফি খেয়ে ফের বইটা পড়তে শুরু করেছিল ঝিনুক। পড়ছিল বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে কোন সময় কীভাবে তিব্বতে গিয়েছিল। তিব্বত থেকে এসেছিল ভুটানে। ট্রেনটা বেশ ভাল স্পিডেই চলছিল, নিউ মাল জংশনের পর থেকে গতি কমতে-কমতে এখন গোরুর গাড়ির দশা। ঘনঘন হুইসল দিচ্ছে। সাইড আপার থেকে ঝুঁকে ঝিনুক নীচের বার্থের দিকে তাকায়, দীপকাকু খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছেন নিবিষ্ট মনে। কখন কিনেছেন খেয়াল করেনি ঝিনুক। গলা খাঁকারি দিয়ে ঝিনুক দীপকাকুর উদ্দেশে বলে উঠল, "ট্রেনটা এত স্লো চলছে কেন?"

"হাতির জন্য। এই রুটে হামেশাই হাতি কাটা পড়ে ট্রেনের চাকায়। হুইসলটাও হাতিদের সতর্ক করার কারণে।"

দীপকাকুর কথায় রীতিমতো এক্সাইটেড হয়ে পড়ল ঝিনুক। সবিস্ময়ে বলে উঠল, "ট্রেন তার মানে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। আপার বার্থে বসে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

বাঙ্ক থেকে নামার উদ্যোগ নিল ঝিনুক। পা দুটো ঝোলাতেই দীপকাকু নীচ থেকে বললেন, "পুলওভারটা গলিয়ে নাও। বাইরের সিনারি দেখতে হলে খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়াও।"

ঠান্ডা লাগার আশঙ্কায় সোয়েটারটা পরতে বললেন দীপকাকু। এ সি কামরার কারণে উত্তরবঙ্গের শীত সেভাবে মালুমই হচ্ছে না। পুলওভারটা মাথার কাছে রেখেছিল রাতে, পরে নেমে এল ঝিনুক।

এন জে পি-র পর নিউ মাল জংশনেও অনেক প্যাসেঞ্জার নেমেছে। ঝিনুকদের এ সি টু-টিয়ার এখন একেবারেই ফাঁকা। করিডর ধরে এগিয়ে যায় ঝিনুক। কামরার ভিতরের দরজা খুলে প্যাসেজে দাঁড়ায়। বাইরের দরজা খুলতেই মনে হল কে যেন বরফ ছুড়ে মারল। এদিকে সামনের দৃশ্য থেকে চোখ সরাতে পারছে না ঝিনুক, প্রায় রেললাইনের গা থেকেই শুরু হয়েছে দিগন্তবিস্তৃত চা-বাগান। কচি পাতায় সকালের রোদ পড়ে তৈরি হয়েছে অনন্য সুন্দর প্রাকৃতিক গালিচা। চা বাগান শেষ হয়ে আসছে। শুরু হল জঙ্গল। বড় বড় নাম না-জানা গাছ। ট্রেনের আওয়াজের ফলে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে যাচ্ছে পাখি। জঙ্গল একটু পাতলা হল, এখন নদী খাত। তিরতিরে জল আর ভর্তি নুড়ি পাথর। ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে নদীটা। দূরে কুয়াশামাখা ভুটান পাহাড়। ট্রেনের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে জঙ্গল-নদী।

এই কেসে এতটা দূরে আসতে হবে, একবারও ভাবেনি ঝিনুক। দ্বিতীয়বার আকৃতি প্লাজা থেকে ফিরে দীপকাকু দু'দিন কোনও যোগাযোগ রাখেননি ঝিনুকের সঙ্গে। দু'দিন বাদ দিয়ে ফোনের বদলে দীপকাকু নিজেই সন্ধেবেলা ঝিনুকদের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন। বাবা বলেছেন, "কী, কেস সল্ভ তো?"

সোফায় বসে বড় শ্বাস ছেড়ে দীপকাকু বলেছিলেন, "কেসটা এত সহজে সল্ভ হওয়ার নয় রঞ্জনদা। এক বা একাধিক পাকা মাথার অপরাধী এর পিছনে আছে। এই কেসে আমি দুটো ক্লু খুঁজে পেয়েছি। অপরাধীও টের পেয়েছে ব্যাপারটা। তাই আমাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।"

বাবা জানতে চেয়েছিলেন, "কোন দুটো ক্লু-এর কথা বলছ তুমি?"

দীপকাকু বলেছিলেন, "খুন হয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে ছেলেটা হাউজিংয়ে এসেছিল, তার প্রমাণ এখন আমার হাতে। রেজিস্টার খাতায় ছেলেটার নাম কেটে দিয়ে অপরাধী ভেবেছিল ভিতরে আসার কোনও প্রমাণ রইল না। ছেলেটা খুন হওয়ার পর অপরাধীর মাথায় নিশ্চয়ই এসেছিল ফুটেজের প্রমাণ লোপ করার কথা। কিন্তু ততদিনে প্রমাণ চলে গিয়েছে সিকিউরিটি এজেন্সির লকারে। অযথা সিকিয়োরিটি রুমের কম্পিউটার থেকে ফুটেজটা ইরেজ করার চেষ্টা করেনি সে। কারণ, একটা প্রমাণ লোপের চেষ্টা আরও নতুন কিছু প্রমাণ রেখে যায়। আমার পাওয়া সেকেন্ড ক্লু ট্যাক্সির নম্বর। আমার দেখার আগে-পরে অপরাধী যদি ফুটেজটা দেখেও থাকে, ক্যামেরার জোনে ট্যাক্সির সামনেটুকু ঢুকে আসা সে লক্ষ করবে না। তার নজর থাকবে ছেলেটার উপর," বলে দীপকাকু চলে গিয়েছিলেন সেকেন্ড ক্লু ধরে কীভাবে এগিয়েছেন তার বর্ণনায়। রঞ্জনকাকুর সাহায্যে এগারোই ডিসেম্বর দুপুরে যে ট্যাক্সির নম্বর দেখা গিয়েছিল ক্যামেরার জোনে, তার ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করেন। ভিডিয়ো ফুটেজটা দেখান। ছেলেটা কোথা থেকে উঠেছে জিজ্ঞেস করেন। মনে করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে ড্রাইভারকে। মাঝে অনেক ক'টা দিন চলে গিয়েছে। মনে পড়েছিল ড্রাইভারের, ছেলেটাকে তুলেছিল লোটাস সিনেমা হলের কাছে, যেখানে সোয়েটার বিক্রি করে ভুটানিরা। ট্যাক্সি নিয়েই ড্রাইভার দেখা করতে এসেছিল, দীপকাকু ওই গাড়িতে চেপেই স্পটে পৌঁছন। সোয়েটার বিক্রেতাদের ছেলেটার ফোটো দেখান। পুলিশের বিজ্ঞাপনে থাকা মৃত মুখের ফোটো নয়, ভিডিয়ো ফুটেজ থেকে ছেলেটার জীবন্ত মুহূর্তের কিছু স্টিল ফোটো দীপকাকু প্রিন্ট করেছেন, সেগুলো দেখিয়ে বিক্রেতাদের কাছে জানতে চান, ছেলেটিকে চেনে কিনা। চিনতে পারে তারা। ওদের মধ্যে থেকে মদন লোহার নামের ইয়ং ছেলেটি জানায়, দীপকাকু যার ফোটো দেখাচ্ছেন, সে ডাবলা গার্জি। ডাবলার সঙ্গে তার আলাপ বেশিদিনের নয়। শীতের পসরা নিয়ে মদন যখন এবার আলিপুরদুয়ার থেকে ট্রেনে চেপে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল, ডাবলা সেই কম্পার্টমেন্টে উঠল কয়েকটা স্টেশন পরে দলগাঁও থেকে। ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল প্রথমবার শহরে যাচ্ছে। মদন লোহারই এগিয়ে গিয়ে আলাপ জমায়। জিজ্ঞেস করে কোন শহরে যাচ্ছে সে। শিলিগুড়ি, মালদা না কলকাতা? ডাবলা বলে কলকাতায় যাচ্ছে। কলকাতার এক বাবু তাকে চাকরি দেবেন বলেছেন। থাকেন কসবায়, জায়গাটা কোথায় মদনের কাছে জানতে চেয়েছিল ডাবলা। মদন লোহার কসবা কীভাবে যেতে হবে বলে দিয়েছিল ডাবলাকে। শিয়ালদায় নেমে ডাবলা গিয়েছিল কসবায়, যিনি চাকরি দেবেন, তাঁর বাড়ি খুঁজে পায়নি। ঠিকানা, ফোন নম্বর লেখা একটা চিরকুট ফিরে আসে মদনের ডেরায়। ক্রিক রো-তে একটা বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিয়ে মদন সমেত দশজন সোয়েটার বিক্রেতা একসঙ্গে থাকে। রাতটা ওখানেই কাটায় ডাবলা। পরের দিন যে ফুটপাথে সোয়েটার বিক্রি করে মদন, সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি ধরিয়ে দেয় ডাবলাকে। যাঁর কাছে যাবে, তাঁর ঠিকানা ছিল ডাবলার কাছে। ঘণ্টাচারেক বাদে ফের মদনের কাছে ফিরে এসেছিল ডাবলা। বলেছিল, ভদ্রলোক দিনদশেক বাদে আসতে বলেছেন। হয়ে যাবে চাকরি। দশদিন হোটেলে কাটানোর মতো টাকা তার কাছে নেই। মদন নিজের আস্তানায় রেখেছিল ডাবলাকে। ছেলেটিকে ভাল লেগে গিয়েছিল তার। সাতদিনের মাথায় ডাবলা গার্জি হঠাৎ উধাও। আগের দিন পর্যন্ত বিক্রি করেছে সে। তারপর থেকে ডাবলা গার্জির আর কোনও খবর নেই।

দীপকাকু বুঝতেই পেরেছিলেন, পুলিশের বিজ্ঞাপন

এদের চোখে পড়েনি। খবরের কাগজ বড় একটা দেখে না এরা। দীপকাকু মদনকে ভদ্রলোকের ঠিকানাটা মনে করতে বলেন, ডাবলার কাছে থাকা চিরকুটে যে ঠিকানাটা সে দেখেছিল। ব্যর্থ হয়েছে মদনের স্মৃতিশক্তি, সে শুধু বলতে পেরেছে, কোনও একটা হাউজিং হবে। সমস্ত বিবরণ দেওয়ার পর দীপকাকু বাবাকে বলেছিলেন, "চলুন রজতদা, দুটো দিন বীরপাড়ায় ঘুরে আসি।"

বাবা অবাক হয়ে জানতে চান, "সেটা আবার কোথায়?"

ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে দীপকাকু বলেছিলেন, "যাহা দলগাঁও, তাহাই বীরপাড়া। যেখান থেকে ডাবলা গার্জি ট্রেনে উঠেছিল। ভারতীয় রেলে এরকম অনেক স্টেশন আছে, জায়গার নামের সঙ্গে যার মিল নেই।"

এর পর বাবার বক্তব্য ছিল, ছেলেটা ওই স্টেশন থেকে উঠেছে মানেই ওখানকার বাসিন্দা, এটা বলা যায় না। অন্য জায়গা থেকে এসেও উঠতে পারে ট্রেনে। তা ছাড়া ছেলেটির ঠিকানায় পৌঁছে তদন্তের কোনও সুবিধে হবে কি? ছেলে মারা গিয়েছে, এই জরুরি খবরটা অবশ্য পাবে বাড়ির লোক। বীরপাড়া থানায় ফোন করেও কাজটা করানো যেতে পারে। উত্তরে দীপকাকু জানিয়েছিলেন কেন বীরপাড়ায় যাওয়াটা দরকার, পুলিশের নিয়ম অনুযায়ী অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহের ফোটো রাজ্যের সব থানায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যাকে বলে 'অল ও সি কনসার্ন'। স্বাভাবিকভাবেই বীরপাড়া থানাতেও গিয়েছে ছেলেটার ফোটো। কোনও খবর আসেনি, সাড়া মেলেনি অন্য সব থানা থেকেও। তারপরই পুলিশ কাগজে 'সন্ধান চাই'-এর বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে। দীপকাকু মনে করছেন ডাবলা গার্জি বীরপাড়ার প্রত্যন্তের বাসিন্দা অথবা ভুটানের নাগরিক। বীরপাড়া থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে ভুটান বর্ডার। ওপারে সিমেন্ট কারখানা আর গুমটু শহর। বর্ডারে কোনও বেড়া নেই। দু'দেশের মানুষ অবাধে যাতায়াত করে। পুলিশের সঙ্গে ওই এলাকার মানুষের যোগাযোগ বেশ ক্ষীণ। সীমান্তরক্ষীরাই তাদের রক্ষাকর্তা। প্রান্তে থাকা গরিব গ্রামগুলোয় হয়তো খবরের কাগজও পৌঁছয় না। যদি পৌঁছত কাগজ, ডাবলা গার্জির ফোটো দেখে পরিবারের লোক এতদিনে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করত বীরপাড়া থানায়। ছেলেটির বাড়ি ওই অঞ্চলেই, এটা [illegible] পিছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে, গুমটু শহরে [illegible] বৌদ্ধমন্দির আছে, যদিও সেটা খুব পুরনো নয়। [illegible] বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ওই এলাকায় প্রবল। এই কেসে [illegible] বৌদ্ধমন্দিরের ঘণ্টা। কলকাতা হয়ে ডাবলা গার্জি, কাছাকাছি স্টেশন দলগাঁও থেকেই ট্রেন ধরবে। ডাবলার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে দীপকাকু জানতে পারবেন, কেন সে কলকাতায় গিয়েছিল। এমনকী, প্রথমদিন আকৃতি প্লাজায় গিয়ে এক ঘণ্টা কার সঙ্গে কাটিয়েছে, সেটাও হয়তো জানা যাবে।

ঝিনুক বলেছিল, "ডাবলা গার্জির সঙ্গে সুপ্রিয় পালের চেনাজানা হওয়ার চান্স কিন্তু একটা আছে। সুপ্রিয় পালের লাস্ট অফিস ট্যুর ছিল শিলিগুড়ি। ওই ট্যুরে গিয়ে বৌদ্ধমন্দিরের একটা ঘণ্টার রেপ্লিকা নিয়ে এসেছিলেন বাড়িতে। বলছেন বটে কিনেছিলেন শিলিগুড়ির হংকং মার্কেট থেকে, মিথ্যেও হতে পারে। হয়তো বীরপাড়ায় এসে ডাবলা গার্জির কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। হংকং মার্কেটেও ডাবলা গার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে থাকতে পারে ওঁর। ডাবলা গার্জি হয়তো হংকং মার্কেটে মাল সাপ্লাই দেয় অথবা দোকানদার। সুপ্রিয় পাল ঘণ্টাটা কিনেছিলেন গার্জির দোকান থেকেই। সেক্ষেত্রে কিন্তু ডাবলা গার্জি বাড়িতে যতক্ষণ না বলছে কলকাতায় আমি অমুক লোকের কাছে যাচ্ছি, তার আগে পর্যন্ত ওঁরা কিছুই জানতে পারবেন না। বৌদ্ধমন্দিরের ঘণ্টা অরিজিনাল না রেপ্লিকা, সেটা এখনও জানা যায়নি। ঘণ্টাটা যে ভাঙেনি, এ বিষয়েও শিওর হওয়া যেতে পারে। ভাঙার কোনও প্রমাণ সুপ্রিয়বাবুর স্ত্রী, কন্যার চোখে পড়েনি। জিনিসটা সুপ্রিয় পাল হয় সরিয়ে রেখেছেন অথবা চুরি যে হয়েছে, জানতে দিতে চান না।"

> দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে, সীমান্ত এলাকায় চলে এসেছে ঝিনুকরা। ডাবলা গার্জির বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা হলেই এই কেস অনেকটা টার্ন নিয়ে নেবে, হয়তো পৌঁছে যাবে সমাধানের শেষ পর্যায়ে।

ঝিনুকের বিশ্লেষণে খুশি হয়ে দীপকাকু বলেছিলেন, "বাহ, মাথা তো বেশ ভাল কাজ করছে দেখছি!"

বাবা গর্বের দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। লজ্জা পেয়ে মাথা নামিয়েছিল ঝিনুক। দীপকাকু বলতে শুরু করেছিলেন, "সুপ্রিয় পাল বীরপাড়ায় এসেছিলেন, এমন কোনও তথ্য আমার হাতে নেই। সোমাদেবীর মোবাইলের কললিস্ট পুলিশকে চেক করতে বলেছিলাম একটাই কারণে, সেটা দেখে বোঝা যাবে সুপ্রিয় পালের গতিবিধি। যেখানেই যান না কেন, স্ত্রীর সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগাযোগ রাখবেন। ট্র্যাক করে আমরা জানতে পারব কলটা কোথা থেকে এসেছে।"

কথার মধ্যে ঝিনুক বলে উঠেছিল, "সেই ইনফরমেশনটা তো সুপ্রিয়বাবুর মোবাইলের কললিস্ট থেকেও পাওয়া যাবে।"

দীপকাকু বলেছিলেন, "আমি সোমাদেবীর কললিস্ট থেকে বুঝতে চাইছিলাম সুপ্রিয়বাবুর প্রাইভেট কোনও নম্বর আছে কিনা। ওই নম্বর থেকে কখনও না-কখনও

স্ত্রীকে নিশ্চয়ই ফোন করেছেন।"

বাবা জানতে চেয়েছিলেন, "সেরকম কোনও প্রাইভেট নম্বরের অস্তিত্ব কি সোমাদেবীর কললিস্ট থেকে পাওয়া গেল?"

দীপকাকু জানিয়েছিলেন, পাওয়া যায়নি। সুপ্রিয় পাল যে নম্বর পুলিশকে দিয়েছেন, সেই নম্বরেই বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে, শিলিগুড়িতে থাকাকালীন। এর মধ্যে কললিস্টে ঢুকে আছে বীরপাড়ার চারটে কল, একটা ল্যান্ড নম্বর থেকে। রঞ্জনকাকু মারফত দীপকাকু জেনেছেন ল্যান্ড নম্বরটা পাবলিক বুথের। বীরপাড়া থেকে কে ফোন করেছিল? এই প্রশ্নটা সোমাদেবীকে করেও কোনও লাভ হবে না। যদি এর পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র থাকে। বলবেন, "বীরপাড়া থেকে ফোন এসেছিল, জানি না তো। হয়তো কেউ নম্বর টিপতে ভুল করে আমাকে ফোন করে ফেলেছিল। রং নম্বর বলে লাইন কেটে দিয়েছি।

প্রশ্নটা করলে ষড়যন্ত্রকারীরা সতর্কও হয়ে যাবে। দীপকাকু তাই ওই রাস্তায় হাঁটেননি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট একটা যোগসূত্র, বীরপাড়ার ফোন, বীরপাড়ার সীমান্তে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, বৌদ্ধমন্দিরের ঘণ্টা খোয়া যাওয়া, ডাবলা গার্জির দলগাঁও (বীরপাড়া) থেকে ট্রেনে ওঠা, আকৃতি প্রাজার যাওয়া, দ্বিতীয়বার সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকা। অতএব বীরপাড়া এই কেসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেখানে যাওয়াটা একান্তই দরকার। বাবা একমত হয়েছিলেন। দীপকাকুকে বলেছিলেন, "তোমার সঙ্গে যাওয়ার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে, উপায় নেই। বেশ ক'টা ইম্পর্ট্যান্ট মিটিং আছে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে। তুমি আর ঝিনুক চলে যাও এবং অবশ্যই নিজের পিস্তলটি সঙ্গে রেখো। মনে রাখবে, কেসটা খুনের। হুমকিটা পেয়েছ।"

উত্তরে দীপকাকু মৃদু হেসে বলেছিলেন, "থাকবে পিস্তল। ওটা আমার সঙ্গে বেশির ভাগ সময়ই থাকে, টের পান না আপনারা।"

জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে। দেখা যাচ্ছে আদিবাসী গ্রাম। সাতপুরনো চাদর গায়ে উঠোনে দাঁড়ানো এক কিশোরী ট্রেনের যাত্রীদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। ঝিনুকও ওকে দেখে হাত নাড়ে। মেয়েটি আলাদা করে ঝিনুককে নির্মল হাসি উপহার দেয়।

"মিনিটখানেকের মধ্যে দলগাঁওয় ঢুকবে ট্রেন। লাগেজ প্যাক করে নাও।"

দীপকাকুর গলা।

॥ ৪ ॥

এই অভিযানে দীপকাকু পুলিশকে এড়িয়ে চলবেন, এমনটাই ধারণা হয়েছিল ঝিনুকের। কার্যক্ষেত্রে তা ঘটল না। দলগাঁও স্টেশনে নেমে প্রথমে বীরপাড়া বাসস্ট্যান্ডে গেলেন দীপকাকু। কাছেই, পায়ে হেঁটে যাওয়া হয়েছিল। ওখানে চার-পাঁচটা হোটেল, মান খুবই সাধারণ। 'ভ্যালি ইন' হোটেলটা বাইরে থেকে দেখে মন্দের ভাল মনে হয়েছিল। দীপকাকু রিসেপশনে গিয়ে দুটো ঘর বুক করলেন ঝিনুক এবং নিজের জন্য। ঝিনুককে বলেছিলেন, ঠিক একঘণ্টা বাদে বেরব। গরম জলে স্নান হয়ে গিয়েছিল ঝিনুক। এরই মধ্যে দীপকাকু সার্ভিস বয়কে দিয়ে কফি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রুমে। হোটেল থেকে বেরতেই সার-সার ভাড়ার গাড়ি। দীপকাকু একটা ছোট এবং নতুন মডেলের গাড়ি ভাড়া করলেন সারাদিনের জন্য। প্রথমে যাওয়া হল লোকাল থানায়।

ও সি সুখদেও কুমারের সঙ্গে কথা হল দীপকাকুর। নিজের পরিচয় দিয়ে, 'সন্ধান চাই' বিজ্ঞাপনটা দেখালেন। জানতে চেয়েছিলেন, ছেলেটার ফোটো থানায় এসেছে কিনা। হাবিলদারকে দিয়ে ফাইল আনালেন সুখদেও কুমার। ফোটো পাওয়া গেল। কম্পিউটার প্রিন্ট আউট। মেল করে পাঠানো হয়েছে। ও সি বললেন, "এর সম্বন্ধে কোনও ইনফরমেশন নেই আমাদের কাছে।"

এর পরই থানার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন দীপকাকু।

গাড়ি এখন গুমটু শহরের দিকে চলছে। ড্রাইভার রুট চেনে। যদিও পর্যটকরা এদিকে বড় একটা আসে না। গুমটু গুম্ফার কথা জানেই না অনেকে। খানিক আগে সাদামাঠা হোটেলে লাঞ্চ সেরেছে ঝিনুকরা। মাকড়াপাড়া রোড ধরে চলছে গাড়ি। দু'পাশে গ্রাম তেমন সজীব নয়, কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা। দূরে জঙ্গলরেখা। দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে, সীমান্ত এলাকায় চলে এসেছে ঝিনুকরা। ডাবলা গার্জির বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা হলেই এই কেস অনেকটা টার্ন নিয়ে নেবে, হয়তো পৌঁছে যাবে সমাধানের শেষ পর্যায়ে। দীপকাকুর ইনভেস্টিগেশন প্রসেস লক্ষ রেখে ঝিনুকের মনে অনেক জিজ্ঞাসা জমা হয়েছে। কেস সলভ হয়ে গেলেই সেইসব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর পেয়ে যাবে। নিজের অনুমান ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারবে না। এইবেলা প্রশ্নগুলো করে নেওয়া ভাল। ঝিনুক বলে, "এই কেসটার ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস জানার আছে আমার।"

"বলো।"

"তারাশঙ্করবাবুর ফ্ল্যাট যে সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটের পাশেই, আগে থেকে জানলেন কীভাবে?"

"ওটা সত্যিই অনুমান। তবে ওয়াইল্ড গেস নয়। পিছনে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। ওই বিল্ডিংয়ে সুপ্রিয়বাবুর ঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে তারাশঙ্করবাবুর বয়স বেশি। বয়স্ক বাঙালিদের স্বভাবে এখনও আতিথেয়তা ব্যাপারটা রয়ে গিয়েছে। পাশে থাকেন বলেই অফিসারের চায়ের অর্ডারটা কানে গিয়েছে। আতিথেয়তার সুযোগটা ছাড়েননি।"

ঝিনুক পরের প্রশ্নে যায়, "প্রথমদিন সুপ্রিয়বাবুর ফ্ল্যাটে গিয়ে আপনি নানা জিনিস অবজার্ভ করতে করতে স্লাইডিং দরজার পরদার নীচটা একটু বেশি সময় ধরে দেখলেন, কী খুঁজছিলেন?"

"খুনির ফুটপ্রিন্ট। খালি পা, জুতো কিংবা মোজার ছাপ। আমি অনুমান করেছিলাম, ছেলেটি যে পদ্ধতিতে ঘরে ঢুকেছে, খুনিও এসেছে সেই পথে। সঙ্গে পিস্তল রেখেছিল খুন করার জন্য নয়, যদি প্রয়োজনে লাগে, সেই ভেবে। খুন

করাটাই উদ্দেশ্য হলে, পিস্তলে সাইলেন্সার লাগাত। ফায়ারিংয়ের আওয়াজে অত লোক জমা হত না। আমার ধারণা, ডোরবেল বেজে উঠতেই লোকটি ভয় পেয়ে যায়। নিজেকে বাঁচাতে ডাবলাকে গুলি করে এবং পরদার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। ফায়ারিংয়ের আওয়াজ শুনে লোকজন ঘরে ঢুকবেই, খোলা দরজা দিয়ে খুনি পালিয়ে যাবে অথবা মিশে যাবে ভিড়ে।"

"পরদার নীচে কোনও ছাপ পাওয়া যায়নি। খুনি তা হলে পালাল কোন রাস্তা দিয়ে? কোনও দরজা খোলা ছিল না। ডাবলা গার্জি কীভাবে ঢুকেছিল, সেটাও তো একটা রহস্য।"

"রহস্যের চাবিকাঠি ব্যালকনির দরজার ছিটকিনি। বাইরে থেকে ওটা খোলা-বন্ধ করতে পারলে কেল্লাফতে। ডাবলা এবং খুনি ছাদের পাইপে দড়ি বেঁধে নামতে পারবে। খুনি ডাবলাকে খুন করে ওই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজার ছিটকিনি তুলে দড়ি বেয়ে উঠে যাবে ছাদে।"

"বাইরে থেকে ছিটকিনি খোলা-বন্ধ করা কী করে সম্ভব?"

"সম্ভব। ঘটনার আগের দিন সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটে যারা-যারা এসেছিল, তাদের ভিতর কোনও একজন দরজা লাগোয়া ডান দিকের জানলার ছিটকিনিটা যদি সকলের অলক্ষে নামিয়ে দিয়ে রাখে, তা হলে জানলা ঠেলে হাত গলিয়ে দরজা খোলা যাবে, বন্ধও করা যাবে। তারপর জানলার পাল্লা টেনে দড়ি ধরে উঠে যাবে উপরে এবং ফায়ারিংয়ের আওয়াজ শোনার পর সকলের সঙ্গে সুপ্রিয়বাবুর ফ্ল্যাটে ঢুকে এক ফাঁকে তুলে দেবে ব্যালকনির সেই জানলার ছিটকিনি। পুলিশ এসে দেখবে, সব দিক বন্ধ, অথচ মৃতদেহ পড়ে আছে ফ্লোরে। বিরাট একটা ধাঁধা তৈরি হয়ে যাবে।"

দীপকাকুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ঝিনুক। উত্তেজনায় শ্বাস নেওয়া-ছাড়ার রেট বেড়ে গিয়েছে। বলে ওঠে, "খুনি তার মানে ঘটনার আগের দিন সুপ্রিয়বাবুর ফ্ল্যাটে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে কেউ?"

"সরাসরি খুনি না হয়ে, সাহায্যকারীও হতে পারে এবং সেটা শুধু একজন নয়, দু'জন হওয়ার আশঙ্কাও আছে।"

"কীরকম?" কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চায় ঝিনুক।

দীপকাকু বলতে থাকেন, "যে আটজন ঘটনার আগের দিন ফ্ল্যাটে এসেছিল, তাদের মধ্যে তিনজন পুলিশ আসার আগে ওই ফ্ল্যাটে ঢোকেনি, কাজের মহিলা, ড্রাইভার আর সোমাদেবীর ভাই। রান্না শিখতে আসা গুজরাতি মহিলা অমৃতা যেহেতু ওই বিল্ডিংয়েই থাকে, গুলির শব্দ শুনে উপরের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল ধরে নিচ্ছি, যদিও এখনও পর্যন্ত তার কোনও প্রমাণ পাইনি। মানে, যা দাঁড়াল, আটজনের মধ্যে পাঁচজন জানলার ছিটকিনি খোলা-বন্ধ করতে পারবে, বাকি তিনজন শুধু খুলে রাখতে পারবে। খুনি যদি বাইরের কেউ হয়, তিনজনের একজনকে দিয়ে ছিটকিনি খুলিয়ে রেখেছিল, পাঁচজনের একজনকে দিয়ে বন্ধ। পাঁচজনের একজন যদি খুনি হয়, জানলার ছিটকিনি খোলা-বন্ধ করতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি। যেহেতু এতজন সন্দেহভাজন, তাই আমি খুনের মোটিভ নিয়ে ভাবছি। সেক্ষেত্রে সন্দেহের তির একজনের দিকেই, সুপ্রিয় পাল। যেহেতু বৌদ্ধমন্দিরের ঘণ্টা খোওয়া যাওয়া আর খুনের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। খুনটা করাটাও তাঁর পক্ষে খুব সহজ। ছাদে দড়ি বেঁধে, ব্যালকনির দরজা খোলা রেখে তিনিই ডাবলা গার্জিকে ঘরে ঢোকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। প্ল্যানটা হয়তো মুখোমুখি সেরেনি, করও বারা অথবা ফোনে গলা পালটে। কেননা মালিক নিজের ফ্ল্যাটে ঢোকার রাস্তা নিজেই দেখিয়ে দিলে, যে লুকিয়ে ঢুকছে, বুঝে যাবে, এটা ফাঁদ। ডাবলাকে ঢুকিয়ে নেওয়ার পর সুপ্রিয় পাল নিজের কাছে থাকা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলেছিলেন, ডাবলাকে গুলি করে দরজার বাইরে যান, তারপর ডোরবেল টেপেন। সেইজন্যই আমি সোমাদেবীকে মনে করতে বলেছিলাম, আগে গুলির শব্দ শুনেছেন, না ডোরবেলের। উনি বলেছেন ডোরবেল। যদি মিথ্যেও বলেন, সুপ্রিয় পালকে খুনি হিসেবে ভাবতে পারছি না। এখন যে খুনের পদ্ধতিটা বললাম, ঠান্ডা মাথায় খুন। এর পর কেন সুপ্রিয় পাল দরজা-জানলার ছিটকিনি তুলে নিজের ঝামেলা বাড়াবেন? ব্যালকনির রাস্তা খোলা থাকা মানে, খুনি, ডাবলা, দু'জনেই ব্যবহার করেছে ওই পথ। অবশ্য সুপ্রিয় পালের কোনও শত্রু, পুলিশ আসার আগে হয়তো সে ঢুকেছিল ফ্ল্যাটে, দরজা-জানলার ছিটকিনি তুলে দিতে পারে। তাতে সুপ্রিয়বাবু প্যাঁচে পড়ে যাবেন। সেরকম যদি কেউ থেকে থাকে, তা হলে বলতে হবে, গোটা ঘটনার উপর তার নজর ছিল এবং সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান।"

"তার মানে এই অপরাধের পিছনে অন্তত দু'জনের যোগসাজশ আছেই। সেই কারণেই আপনি আটজনের মোবাইল নম্বর নিয়েছেন। চেক করেছেন কললিস্ট। ঘটনার আগে পরে কে কাকে ফোন করেছে, দেখছেন। আপনি মঙ্গলাদির ফোন নম্বর নিতে ছাড়েননি। কারণ, তাকে দিয়ে জানলার ছিটকিনি খুলিয়ে রাখা যায়, ছাদের পাইপে দড়ির দাগ মোছানো যায়। মঙ্গলাদির টাকার প্রয়োজন কতটা জানার জন্যই, মেয়ের বিয়ের চেষ্টা চলছে কিনা, জিজ্ঞেস করেছিলেন।"

ঝিনুক থামতেই দীপকাকু বলে উঠলেন, "বাঃ! তুমি তো দেখছি, নিখুঁত পর্যবেক্ষণ চালিয়েছ আমার ইনভেস্টিগেশনে! ভেরি গুড!"

কমপ্লিমেন্টটা গায়ে মাখল না ঝিনুক। তার আরও জানার আছে। জিজ্ঞেস করল, "কললিস্ট থেকে কিছু পেলেন?"

"নাহ, সোমাদেবীর ফোনে ওই যা দুটো বীরপাড়ার কল। তাও সে ঘটনার বছরখানেক আগে।"

দীপকাকুর বলা শেষ হতেই ড্রাইভার বিনোদ তামাং সামনে আঙুল তুলে বলল, "ওই দেখুন কালীমন্দির। ওটাই বর্ডার। ওপারে গেলেই ভুটান।"

খানিক আগেই একটা চেকপোস্ট পেরিয়ে এসেছে ঝিনুকরা। রাস্তার দু'পাশে বি এস এফ-এর কাঠের ঘর, চলতি কথায় যাকে বলে চৌকি। কালীমন্দিরের সামনে গাড়ি পৌঁছতেই দীপকাকু থামাতে বললেন। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করল বিনোদ তামাং। গাড়ি থেকে নামলেন দীপকাকু, তারপর ঝিনুক। সমতল থেকে জায়গাটা অনেকটাই উঁচু, লাল রঙের কালীমন্দির আরও উঁচুতে। উপরে ওঠার জন্য চওড়া বাঁধানো সিঁড়ি। আশপাশে লোকজন চোখে পড়ছে না। মন্দিরের সিঁড়ি থেকে একটু দূরে ছিটে বেড়ার চায়ের দোকান। জিনিসপত্র তেমন কিছু নেই। বৃদ্ধ দোকানিকে দেখা যাচ্ছে, উনুনে কিছু বসিয়েছে। দোকানের পিছনে বাড়িঘর, গাছপালা কিছু নেই। মনে হচ্ছে ওর পরেই খাদ। দূরে পাহাড়শ্রেণির মাথায় সাদা মেঘ।

দোকানের একপাশে বাঁশের বেঞ্চে গিয়ে বসলেন দীপকাকু। দোকানিকে দুটো চা দিতে বললেন। ঝিনুকও বসল বেঞ্চে।

দীপকাকু সাইডব্যাগ থেকে একগাদা ফোটো বের করলেন, সবই ভিডিয়ো ফুটেজের স্টিল। ভাল করে নজর করে ঝিনুক দেখল আট সন্দেহভাজন এবং ডাবলা গার্জির জীবন্ত অবস্থার ফোটো। দোকানি কাচের গ্লাসে চা নিয়ে এল। ডাবলা গার্জির ফোটোটা দেখিয়ে দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "ইসকো পেহচানতে হো?"

"হাঁ। ডাবলা। কলকাত্তা মে নোকরি ঢুন্ডনে গ্যায়া থা। অ্যাক্সিডেন্ট মে মর গ্যায়া। ধাক্কা মারা গাড়ি।"

ঝিনুক এতটাই অবাক হয়েছে, বেঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। এত দূর উজিয়ে যে দুঃসংবাদ তারা দিতে এসেছে, সেটা অলরেডি পৌঁছে গিয়েছে। তবে একটু মোড়কে ঢেকে, খুনের বদলে অ্যাক্সিডেন্ট!

দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "কব হুয়া অ্যাক্সিডেন্ট?"

"উতনা নেহি মালুম হ্যায় স্যার। ডাবলা কা ভাই উধর কা পাস ফোন আয়া পরসো। উসি দিন আপনা মা কো লে কর কলকাত্তা চলা গ্যায়া উধর।"

"ডাবলাদের বাড়িটা কোথায়?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"দোকানি রাস্তার ওপারে ঢালুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "থোড়া পয়দল যানা পড়েগা। সামনে একঠো গাঁও হ্যায়, খারশোলা। গাড়ি যানে কা রাস্তা নেহি হ্যায়।"

থেমে গিয়ে ফের দোকানি বলল, "ঠেহরিয়ে, আপ কো সাথ লড়কা দে দেতে হ্যায়। উয়ো দে কর আয়েগা আপলোগো কো।"

কথা শেষ করে দোকান ছেড়ে খানিক এগিয়ে গেল বৃদ্ধ। মন্দিরের দিকে মুখ তুলে কারও একটা নাম ধরে হাঁক পাড়ল বারদুয়েক। একটু অপেক্ষার পরই দেখা গেল, মন্দিরের সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে দুটো বাচ্চা ছেলে। তাদের একজনের কোলে সাদা-কালো ছাগলের বাচ্চা। মন্দিরের চাতালে হয়তো খেলছিল ওরা। নীচ থেকে দেখা যায়নি।

নুড়িপাথরের রাস্তার ঢাল বেয়ে ঝিনুকরা এখন ডাবলা গার্জির বাড়ির উঠোনে। ড্রাইভার তামাং গাড়ি ছেড়ে আসেনি। হেঁটে আসতে-আসতে দীপকাকু দুটো ফোন করেছেন। ফোনের একপ্রান্ত শুনেই ঝিনুককে অপর প্রান্তের কথা আন্দাজ করে নিতে হয়েছে। এসময় দীপকাকুকে কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না। ভীষণ সিরিয়াস হয়ে আছেন। ঘটনা এরকম অপ্রত্যাশিত বাঁক নেবে, ভাবতে পারেননি। প্রথম ফোন করলেন আই ও তাপস রায়কে। কথোপকথন থেকে ঝিনুক বুঝতে পারল, থানা থেকে ডাবলা গার্জির ভাইকে ফোন করা হয়নি। অন্য কেউ ফোন করে ঘটনাটা জানিয়েছে তাদের। অফিসার সেই ফোন নম্বর চেক করে দেখছেন, পাবলিক বুথ থেকে করা হয়েছে কল। কলকাতাতেই ডাবলার অন্ত্যেষ্টি সেরেছে মা, ভাই। ফোন কেটে দীপকাকু বলে উঠেছিলেন, "কেসটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই বাড়ির লোককে ডেকে পাঠিয়ে শেষকৃত্য সেরে ফেলা হল।" পরের ফোনটা করলেন সুপ্রিয় পালকে। একপ্রান্তের কথা শুনে যা বোঝা গেল, সুপ্রিয় পালকে থানা থেকে জানানো হয়েছে, ডাবলা গার্জির মা, ভাই এসেছে। অস্বস্তিবোধ থেকে সুপ্রিয়বাবু ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাননি। অফিসারকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন,

তাঁর ফ্ল্যাটে যেন ওদের পাঠানো না হয়। কথা শুনেছেন অফিসার।

এই ফোনটার পর দীপকাকুর মুখ আরও থমথমে হয়ে গেল। ডাবলা গার্জির বাড়ির উঠোনে ঝিনুকদের ছেড়ে দিয়ে উধাও হয়েছে বাজাদুটো। বাড়িটা কাঠ আর টিনের চালের। অর্ধেকটা দোমড়ানো মতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এমনটা হয়েছে বলেই মনে হয়। একটা ঘর অক্ষত, দরজায় তালা দেওয়া। শহুরে লোক দেখে ডাবলা গার্জির প্রতিবেশীরা ঘিরে রয়েছে ঝিনুকদের। দীপকাকু ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। চা-দোকানি ডাবলা গার্জি সম্বন্ধে যা বলেছিল, এরা একই কথা বলছে। কলকাতায় চাকরি খুঁজতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে ডাবলা। ফোন এসেছিল ভাইয়ের মোবাইলে। দীপকাকু এখন সাইডব্যাগ থেকে আটি সন্দেহভাজনের ফোটো বের করে প্রতিবেশীদের দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কেউ এখানে এসেছিল কিনা?

এক চান্সে সুপ্রিয় পালের ফোটো শনাক্ত করল সকলে। বলল, বেশ কিছুদিন আগে ইনি এক রাত ডাবলার বাড়িতে কাটিয়েছেন। ঘুরতে এসেছিলেন এখানে। এক বৃদ্ধ প্রতিবেশীর কাছে একটু বেশি খবর আছে। সে বলল, এই ভদ্রলোকের কাছেই চাকরি খুঁজতে গিয়েছিল ডাবলা। দীপকাকু ওদের জিজ্ঞেস করলেন, "ডাবলা গার্জি এখানে কী কাজ করত?"

ওদের একজন বলল, "চাষের কাজ আর বর্ডারের ওপার থেকে জিনিস এনে শিলিগুড়ির মার্কেটে বিক্রি করত।"

"কী জিনিস আনত?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

উত্তর দেওয়ার বদলে লোকটি আঙুল তুলল দূরে দাঁড়ানো এক যুবকের দিকে। বলল, "ওই তো নারান, ডাবলার বন্ধু। ওকে জিজ্ঞেস করুন, সব জানে।"

চকরাবকরা টিশার্ট, জিন্স পরা ছেলেটিকে অনেক আগেই খেয়াল করেছে ঝিনুক। বেশ খানিকটা দূরত্ব রচনা করে ঝিনুকদের কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। এখন ওর দিকে আঙুল উঠতেই ঘুরে গিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করেছে। দীপকাকু ঝিনুকের দিকে তাকালেন। চোখের ভাষা পড়ে নিয়ে ঝিনুক দৌড়ে গিয়ে ছেলেটার মুখোমুখি দাঁড়াল। দু'পাশে দু'হাত ছড়িয়ে বলল, "ওঁর কাছে পিস্তল আছে। পালানোর চেষ্টা কোরো না, পায়ে গুলি করবেন।"

দীপকাকু এগিয়ে এসেছেন। ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "পুরো নাম কী?"

"নারান খাখা।"

সকাল দশটা নাগাদ ঝিনুকদের ট্রেন পৌঁছেছিল শিয়ালদায়। ট্যাক্সি নেওয়া হল। ঝিনুক নেমে গিয়েছিল টালিগঞ্জে, ওদের চণ্ডী ঘোষ রোডের বাড়িতে। নারান খাখাকে সঙ্গে নিয়ে দীপকাকু চলে গিয়েছিলেন নিজের ডেরায়।

"চলো নারান, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক," বলে ছেলেটার কাঁধে হাত রেখেই হাঁটতে লাগলেন।

মেন রাস্তার দিকে না গিয়ে দীপকাকু নারান খাখা-র সঙ্গে চলে এসেছেন ছোট একটা মাঠে। সেখানে দুটো পাথরখণ্ড। দু'জন দুটোতে মুখোমুখি বসে আছেন। ঝিনুক দাঁড়িয়ে। নারান খাখা জানাল, ডাবলাদের জমি খুবই কম। চাষের কাজটা করে মূলত ওর ভাই। বর্ডার পেরিয়ে গিয়ে ডাবলা ভুটানের হ্যান্ডিক্র্যাফটস নিয়ে আসত। বিক্রি করত শিলিগুড়ির হংকং মার্কেটে। এভাবে জিনিস আনা বেআইনি। সেই কারণে গভীর জঙ্গলের রাস্তা ধরে বর্ডার পেরত ডাবলা। নারান বেশ কয়েকবার সঙ্গে গিয়েছে। সুপ্রিয় পালের সঙ্গে ডাবলার দেখা হয়েছিল শিলিগুড়িতে। ডাবলার রেপ্লিকা দেখে সুপ্রিয় পাল বলেছিলেন, "তুমি আমাকে এগুলোর একটা দুটো অরিজিনাল এনে দিতে পারবে? অনেক টাকা দেব।" ডাবলা টাকার লোভে রাজি হয়। জঙ্গলের যে রাস্তা দিয়ে ডাবলারা গোপনে জিনিস নিয়ে আসত, তার চেয়ে বেশ খানিকটা গভীরে বহু পুরনো ভাঙাচোরা বৌদ্ধমন্দির আছে। সেই মন্দিরের অস্তিত্ব এগ্রামের লোকজন জানে না। হয়তো এখনকার ভুটান সরকারও অবহিত নয়। তাই সংস্কার হয়নি। ডাবলা অরিজিনাল জিনিস দেবে শুনে সুপ্রিয় পাল ওর পিছন ছাড়েননি। চলে এসেছিলেন এই গ্রামে। তবে ডাবলা ওঁকে মন্দিরে নিয়ে যায়নি। মন্দির থেকে জিনিস চুরি করা নিয়ে ডাবলার মনেও খচখচানি ছিল। এখানকার সকলে ভগবান বুদ্ধকে খুব মানে। ডাবলাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। টাকার জন্যই ওই মন্দিরের একটা ঘণ্টা এনে দিয়েছিল সুপ্রিয় পালকে। উনি চলে যাওয়ার পরই ডাবলাদের পরিবারে বিপর্যয় নেমে এল। ডাবলাদের খেতের সমস্ত ফসল নষ্ট করল হাতির পাল। ডাবলাদের বাড়ি ভেঙে দিয়ে গেল। একদিন হংকং মার্কেটে জিনিসপত্র বিক্রি করে ট্রেনে ফেরার পথে ডাবলার সব টাকা লুঠ করল ডাকাতদল। খুব ভেঙে পড়েছিল ডাবলা। ওর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মাল মন্দিরের ঘণ্টা চুরি করার সাজা দিচ্ছেন ভগবান। ঠিক করল কলকাতায় গিয়ে ঘণ্টা ফেরত এনে মন্দিরে রেখে দেবে। কলকাতা গেল। জানত না, শেষ সাজা ভগবান ওখানেই বরাদ্দ করে রেখেছেন ওর জন্য। অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল...

কথার শেষের দিকে গলা কেঁপে গিয়েছিল নারান খাখা-র। নারানকে শান্ত হতে সময় দিয়েছেন দীপকাকু। এতক্ষণে বলে উঠলেন, "তুমি আমাদের মন্দিরটায় নিয়ে যাবে? এখনই যাব।"

চমকে মুখ তুলল নারান খাখা। চোখে অবিশ্বাস আর অবাক ভাব। দীপকাকু বললেন, "চিন্তা নেই। মন্দির থেকে কিছু চুরি করব না আমরা। আর-একটা ব্যাপার শুনে রাখো, তোমার বন্ধু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়নি, তাকে খুন করা হয়েছে।"

"ডাবলা খুন হয়েছে!" গলায় অবিশ্বাস ঝরে পড়ল নারানের।

দীপকাকু সাইড ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা খবরের কাগজ বের করলেন। নারান খাখাকে দেখালেন পুলিশের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মৃত ডাবলার ফোটো।

বেশ কিছুটা সময় নিয়ে বিজ্ঞাপনটা দেখল নারান খাখা। চারপাশটায় একবার চোখ বোলাল। বলল, "আলো কমে আসছে এখনই। অনেকটা যেতে হবে। জঙ্গলের রাস্তা। ফিরতে-ফিরতে অন্ধকার।"

"কোনও অসুবিধে নেই। তুমি চলো। আমার সঙ্গে টর্চ, পিস্তল সব আছে," বললেন দীপকাকু।

জঙ্গল এত ঘন যে, বাইরের আলো প্রায় পৌঁছচ্ছে না। মাঝে-মাঝেই চড়াই-উতরাই। হাঁপ ধরে যাচ্ছে ঝিনুকের। নারান খাখা হাঁটছে সামনে, কাস্তে চালিয়ে ঝোপঝাড় কেটে রাস্তা তৈরি করে করে দিচ্ছে। জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে নানা জীবজন্তু, পাখির ডাক। জার্নিটা এত বোরিং, ঝিনুক বেশ খানিকক্ষণ আগে দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করে বসেছিল, "এই কেসের জন্য মন্দিরটা স্বচক্ষে দেখাটা কি খুব ইম্পর্ট্যান্ট?"

দীপকাকু বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই জরুরি। যে ঘণ্টার ফোটোটা আমার কাছে এসেছে, তার সময়কাল জানতে হলে বৌদ্ধমন্দিরের স্থাপত্যটা দেখা দরকার। ঘণ্টাটায় তিব্বতি প্রভাব স্পষ্ট। ভুটানের প্রকৃত রূপকার নাওয়াং নামগিয়াল এসেছিলেন তিব্বত থেকে। অনেক বিদ্রোহ, অনেক সংঘাত পেরিয়ে ১৬৩৯ সালে নামগিয়াল ভুটানের একমাত্র শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পরই মাত্র কুড়ি-বাইশ বছরের মধ্যে ভুটানের সমস্ত প্রবেশপথের উপর দুর্গ নির্মাণ করে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন দেশের। আমার মনে হচ্ছে, ঘণ্টাটা সেরকমই কোনও দুর্গের লাখাং-এর মধ্যে ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গ ভেঙে গিয়েছে। পথটাও আর প্রচলিত নয়। জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে জায়গাটা। চলে গিয়েছে ভুটানবাসীর অগোচরে। লাখাং-এ থাকে বুদ্ধের নানা রূপের মূর্তি, স্থানীয় দেবতার বিগ্রহ, পদ্মসম্ভবের মূর্তি। এরকমই কোনও দেববিগ্রহের হাতে ছিল ঘণ্টাটা। সেটা যদি ষোলশো-সতেরোশো সালের হয়, ঘণ্টাটার ঐতিহাসিক মূল্য বিরাট!"

জঙ্গলে অনেকক্ষণ হল মোবাইলের টাওয়ার নেই। এমনটা হবে আন্দাজ করে দীপকাকু যাত্রার শুরুতেই নারানকে বলেছিলেন, "ডাবলার নিশ্চয়ই মোবাইল ছিল, নম্বরটা দাও তো।"

নম্বর নিয়ে কল করেছিলেন দীপকাকু।

"দিস নাম্বার ডাজ় নট এগজ়িস্ট বলছে," ঝিনুকের উদ্দেশে দীপকাকু বলেছিলেন। "দেখছিলাম, কেউ ধরে কিনা। ডাবলার মৃত্যুর পর যে ওর মোবাইল সরিয়েছে, সেটটা থেকে ভাইয়ের নম্বর নিয়ে সে ফোন করেছিল এখানে। সুপ্রিয় পাল মোবাইল সরালেও, ভাইয়ের নম্বর সেট থেকে নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। নিজেই এসেছিল এই গ্রামে, ডাবলার ভাইয়ের নম্বর তখনই নিয়েছে। কলকাতায় ফিরে প্রথমেই ডাবলার নম্বরের কললিস্ট চেক করতে হবে। দেখতে হবে, কলকাতায় কার কার সঙ্গে কথা হয়েছে ওর। তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে খুনি।"

জঙ্গলের ঘনত্ব কমে এসেছে। সন্ধে নেমে গিয়েছে পুরোপুরি। একটা চড়াইয়ে উঠে নারান খাখা আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে, "ওই দেখুন মন্দির।"

অনতিদূরে সিল্যুয়েটে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। পিছনের আকাশ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সূর্য ডুবেছে ওইদিকেই। হ্যারিকেনের তেল শেষ হয়ে যাওয়ার মতো আলো। মন্দির মাঝে রেখে অনেকটা চত্বর জুড়ে ভাঙা পাঁচিল। দীপকাকুর আন্দাজ মনে হচ্ছে সঠিক, ষোলশো-সতেরোশো সালের কোনও দুর্গের খণ্ডাংশ। উত্তেজনায় জোরে পা চালিয়েছেন দীপকাকু। ঢাল বেয়ে নেমে ঝিনুকরা আবার জঙ্গলে প্রবেশ করল। কিছু দূর যাওয়ার পরই পাখির ডানার মতো দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল নারান। ঝিনুকদের এগোতে মানা করছে। কিছু একটা দেখেছে। চাপা গলায় বলে ওঠে, "ওই দেখুন!"

সামনের দিকে তাকিয়ে ঝিনুকের প্রথমে মনে হল, বেশ কিছু চলমান পাহাড়। মুহূর্তে ভ্রম কাটে, ফিট তিরিশ দূরে হাতির দল। হাঁটচলা রাজার মতো। অজান্তেই ঝিনুকের হার্টবিট বেড়ে গিয়েছে। নারান বলল, "আর এগোনো ঠিক হবে না। তাড়া করলে এদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব না আমরা।"

"হুঁ, ফিরেই যেতে হবে। একবার যখন দাঁড়িয়ে পড়ে পায়চারি শুরু করেছে। দু'-তিনদিনও থেকে যেতে পারে," বললেন দীপকাকু।

হঠাৎ একটা হাতি শুঁড় তুলে ডেকে উঠল। ধড়ফড় করে ওঠে ঝিনুকের বুক। হাতির ডাককে বলে বৃংহণ, ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তে। কেন জানি ঝিনুকের মনে হচ্ছে, ঘণ্টা চুরির পর ইতিহাসের গোপন নির্দেশে এরা পাহারা দিচ্ছে প্রাচীন এই বৌদ্ধমন্দির। মানুষ আর এদিকে আসার সাহস করবে না।

॥ ৫ ॥

ঝিনুকরা আজই ফিরেছে কলকাতায়। নারান খাখাকেও সঙ্গে এনেছেন দীপকাকু। সুপ্রিয় পাল যে বীরপাড়ায় গিয়েছিলেন, তার সাক্ষী হচ্ছে নারান খাখা। মন্দিরের ঘণ্টাটা নারানের সামনেই হাতবদল করে ডাবলা। সকাল দশটা নাগাদ ঝিনুকদের ট্রেন পৌঁছেছিল শিয়ালদায়। ট্যাক্সি নেওয়া হল। ঝিনুক নেমে গিয়েছিল টালিগঞ্জে, ওদের চণ্ডী ঘোষ রোডের বাড়িতে। নারান খাখাকে সঙ্গে নিয়ে দীপকাকু চলে গিয়েছিলেন নিজের ডেরায়। কুঁদঘাট পিরপুকুরের

তাড়াধাড়িতে। যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলেন, "সন্ধে সাড়ে ছ'টায় আসব। তিনজন মিলে যাব সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটে।"

এখন সেখানেই যাচ্ছে ঝিনুকরা। ট্যাক্সিতে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন দীপকাকু, যাওয়া হচ্ছে বাবার গাড়িতে। বাবারও খুব যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, দীপকাকু রাজি হননি।

দীপকাকু বলেছিলেন, "এই তিনজনের বাইরে আর কেউ থাকলেই উনি জবানবন্দি দিতে অস্বস্তি বোধ করবেন। কাটছাঁট করবেন তথ্য। সেই কারণে আমি অলরেডি ওঁকে ফোন করে বলে দিয়েছি, সাতটা নাগাদ যাচ্ছি। স্ত্রী এবং মেয়েকে কোনও অজুহাতে ফ্ল্যাটের বাইরে পাঠিয়ে দেবেন। আপনার সঙ্গে প্রাইভেট কিছু কথা আছে।"

গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার আশুদা, পাশে নারান খাখা। দীপকাকুর পরামর্শে আজ সকাল থেকে অকৃতি গ্রাজায় পাঁচ সন্দেহভাজন এবং সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাট এই দ্বিতীয়বার সার্চ করা হল। বাইরের তিন সন্দেহভাজনের বাড়িও তল্লাশি চালানো হয়েছে। দীপকাকু বীরপাড়া থেকেই ইমেল করে ন'জনের তালিকা পাঠিয়ে আই ও তাপস রায়কে সার্চের কথা বলেছিলেন। পাঠিয়েছিলেন বৌদ্ধমন্দিরের ঘণ্টার ফোটো। নিজের তদন্তের গতিপ্রকৃতি জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছিলেন, তল্লাশির মাধ্যমে এই ঘণ্টা এবং যে পিস্তল দিয়ে ডাবলাকে খুন করা হয়েছে সেটা পাওয়া যাবে। ওই দুটো জিনিস পাওয়া তো যায়ইনি, অন্য কোনও সন্দেহজনক কিছুও মেলেনি।

কার যেন ফোন বাজছে। অচেনা রিংটোন। নারান খাখার কি? না, দীপকাকু প্যান্টের পকেট থেকে বের করছেন ফোন। ঝিনুকের মনে পড়ে, ফোনসেটটা স্টাফ সুদর্শন কাকার। বিজ্ঞাপনে এই সেটটার নম্বরই দিয়েছিলেন দীপকাকু। কলটা তার মানে কি সেই আড়ালে থাকা ঘণ্টা বিক্রেতার? মনে হচ্ছে তাই। স্ক্রিনে ল্যান্ডফোনের নাম্বার দেখেই বোধ হয় দীপকাকু কানে ফোনসেট নিয়ে অন্য হাতে নিজের গলার কণ্ঠটা চেপে ধরে 'হ্যালো' বললেন। আসল গলাটা পালটে ফেললেন আর কী। অপর প্রান্তের কথা শুনতে-শুনতে চোয়াল শক্ত হল, নিজে আর-একটাও কথা বললেন না। ফোন কেটে কপালে ভাঁজ ফেলে বসে রইলেন। ঝিনুক বলল, "ঘণ্টার ফোটো যে পাঠিয়েছে, নিশ্চয়ই তার ফোন। কী বলছে?"

"[illegible] বিজ্ঞাপনটা আমি দিয়েছি। হুমকি দিল। [illegible]"

[illegible]

সার্চ করার প্রক্রিয়ায় নেই বলেই পুলিশকে ঘণ্টার খবরটা দিয়েছি। সেটা জেনেছি বিজ্ঞাপনের ফোন পেতে।"

"লোকটা যদি ওই হাউজিংয়ের কেউ হয়, তা হলে পাঁচ সন্দেহভাজন এবং সুপ্রিয় পালের মধ্যে কোনও একজন।"

"ঠিক তাই। ফ্ল্যাটে সার্চ হতেই বেজায় চটেছে আমার উপর।"

'চটেছে' কথাটা মিচকি হেসে এমনভাবে বললেন দীপকাকু, যেন কোনও ঠাট্টা! ওটা যে খুনের হুমকি, ওঁকে দেখে বোঝার উপায় নেই।

কিছুক্ষণ হল ঝিনুকরা তিনজন সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছেছে। দীপকাকুর নির্দেশমতো সুপ্রিয়বাবু একাই আছেন। নারান খাখাকে দেখে ওঁর প্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। তারপর সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে পড়েন। দোষ স্বীকারের শুরুতেই সুপ্রিয় পাল বলেছেন, "বিশ্বাস করুন, আমি খুন করিনি। অন্যায় কাজ একটাই করেছি, ওকে চিনি না বলেছি।"

"কেন বলেছিলেন? কীসের ভয়ে?" জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু। উত্তরে সুপ্রিয় পাল সবিস্তারে বলতে থাকেন। ডাবলা গার্জির সঙ্গে হংকং মার্কেটেই আলাপ হয়েছিল তাঁর। আন্দাজ করেছিলেন, ডাবলা ভুটানের প্রত্নসামগ্রী নিয়ে আসবে, যা একটি মারাত্মক অপরাধ। গুরুতর বেআইনি কাজ। ডাবলা ঘণ্টাটা এনে দেওয়ার পর যা দাম চেয়েছিল, তাই দিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন সুপ্রিয় পাল। তার কিছুদিন বাদে ডাবলা এই ফ্ল্যাটে এসে ঘণ্টাটা ফেরত চাইল, যে টাকাটা দিয়েছিল তার বিনিময়ে। সুপ্রিয় পাল ওকে ফ্ল্যাটের দরজা থেকেই হাঁকিয়ে দেন। এর পরের ঘটনা সকলেই জানে। যে অংশটুকু সুপ্রিয় পাল গোপন করে গিয়েছেন তা হল, ঘটনার দিন ফ্ল্যাটে ঢুকে ডাবলাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখামাত্র সুপ্রিয়বাবু ক্যাবিনেটের দিকে তাকিয়েছিলেন। দেখলেন, রডিত পাল্লাটা খোলা। ডাবলা ঘুরে যাওয়ার পর যেটায় লক লাগিয়েছিলেন। ঘণ্টাটি উধাও। ডাবলা যে ঘণ্টাটা চুরির উদ্দেশ্যে ঘরে ঢুকেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একই অভিসন্ধি নিয়ে অন্য একজনও ছিল ঘরে। বাড়িতে মৃতদেহ, গুলির আওয়াজ, সুপ্রিয়বাবু পুলিশ না ডাকলেও কমপ্লেক্সের অন্য বাসিন্দারা ডেকে আনবে। ডেডবডির জামা-প্যান্ট সার্চ করে পাওয়া যাবে মোবাইল ফোন, পার্স। ক্লু পেয়ে পুলিশ খোঁজার চেষ্টা করবে, কী উদ্দেশ্যে এই ফ্ল্যাটে এসেছিল ছেলেটা? মরতে হল কেন? তা হলেই সুপ্রিয়বাবু অপরাধ (বেআইনিভাবে বিদেশি প্রত্নসামগ্রী কেনা) ধরা পড়ে যাবে। বিপদ থেকে বাঁচার একটাই উপায়, ডাবলার মোবাইল ফোন, পার্স, সব সরিয়ে ফেলা। ডাবলার পকেট [illegible] মোবাইল, পার্স না পেয়ে সুপ্রিয়বাবু বুঝে যান চুরি [illegible] আগেই আইডেন্টিটি প্রুফগুলো [illegible] বেশ স্বস্তি পেয়েছিলেন [illegible] বসে গেল, ছেলেটাকে

চেনেন না।

পুরোটা শুনে দীপকাকু বলেছিলেন, "আপনি কিন্তু এখনও একটা ব্যাপার গোপন করে যাচ্ছেন। আপনার দুটো মোবাইল ফোন। পুলিশকে একটার নম্বর দিয়েছেন। অন্যটা রেখেছেন চোরাই জিনিস কেনার ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য। ঘণ্টাটা ফেরত পেতে চেয়ে ভাবলা আপনার দেওয়া নম্বরে কল করেছিল। সেটটা হয় অফ করা ছিল অথবা ভাবলার প্রস্তাবে আপনি রাজি হননি। মরিয়া হয়ে আপনার ফ্ল্যাটে হাজির হয় ভাবলা। ওর থেকে আরও প্রত্নসামগ্রী পাওয়ার আশায় নিজের অ্যাক্সেসটা সঠিক দিয়েছিলেন। আপনার অন্য ফোনটার কথা সোমাদেবীকেও জানাননি। বীরপাড়ায় যাওয়ার সময় শিলিগুড়ি পেরোতেই আপনার রেগুলার মোবাইল সেটটাকে নিষ্ক্রিয় করে দেন। পাছে কোনও কল এসে আপনার কললিস্টে বীরপাড়া যাওয়ার প্রমাণ রেখে দেয়। সোমাদেবীর ফোনের কললিস্টে বীরপাড়া পাবলিক বুথের নম্বর পাওয়া গিয়েছে। নির্ঘাত আপনিই করেছিলেন। ফোনে আপনাকে না পেয়ে সোমাদেবী চিন্তিত হবেন বলে। সোমাদেবীকে বলেননি বীরপাড়ায় আছেন। বলেছেন, আপনার ফোনটা বিগড়েছে। ভাবলার ফোন নম্বর আমি শারানের থেকে পেয়েছি। কললিস্ট চেক করে আপনার গোপন নম্বরটা বের করে ফেলব।"

আক্ষরিক অর্থেই সুপ্রিয় পাল কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে তাকিয়েছিলেন দীপকাকুর দিকে। তারপর বললেন, "এই প্রথমবার আমি এভাবে জিনিস কিনেছি। ফোন নম্বরটাও ব্যবহার করছি সম্প্রতি।"

দীপকাকু বলেছিলেন, "এগারোই ডিসেম্বর ভাবলা যখন আপনার কাছে এসেছিল, কতক্ষণ ধরে চলেছিল কথাবার্তা? ঝগড়া মতো হয়েছিল কি? আশপাশের কেউ শুনেছে?"

"একটু বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। মিনিটপাঁচেকের বেশি না। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে কথা বলেছি। সিঁড়ি দিয়ে কেউ তখন ওঠানামাও করেনি," বলেছিলেন সুপ্রিয় পাল। দীপকাকু বললেন, "আপনি সিঁড়ির নীচে একটা চাতালই শুধু দেখতে পাচ্ছিলেন। হতে পারে তার নীচ থেকে কেউ উঠে আসছিল অথবা উপর থেকে কেউ নামছিল, চেঁচামেচি শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে সে।"

কথা শেষ করে প্যাকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বারান্দায় চলে গিয়েছিলেন দীপকাকু। ঝিনুকরা তিনজন চুপচাপ বসে আছে তখন থেকে। সুপ্রিয় পাল মাথা নীচু করে আছেন। আক্রোশ ভরা চোখে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে শারান থাথা। বন্ধুর অকালমৃত্যুর কারণ সামনের

লোকটা, সেইজন্যই রাগ। ঝিনুক সেন্টার টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে উলটে যাচ্ছে, পড়ছে না কিছুই।

ঘরে এলেন দীপকাকু। সুপ্রিয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনুন, আপনার কথার উপর নির্ভর করে তদন্ত চালিয়ে যাব আমি। আশা করি আর কিছু গোপন করেননি। যতটুকু বলেছেন, সেটাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর পরও আই ও যদি আপনাকে ফেভার করে রিপোর্ট দেন, জেল এড়িয়ে শর্তহীন জামিন পাবেন। আর যদি মিথ্যে বলে আমাকে মিসগাইড করার চেষ্টা করেন, রেহাই পাবেন না। সত্য উদ্ঘাটন আমি করবই। তখন আপনার জেলের ঘানি টানা কেউ আটকাতে পারবে না।"

হাতের ইশারায় ঝিনুকদের ডেকে নিয়ে বাইরের দরজা লক্ষ করে এগিয়ে গেলেন দীপকাকু।

> পুলিশ ছাড়াও উপস্থিত সকলে ঘুরে তাকাল কনস্টেবলের দিকে। উনি ততক্ষণে গর্ত থেকে বের করে ফেলেছেন ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক ব্যাগে ভরা একটা পিস্তল। ঝিনুকসহ গোটা তল্লাশি টিম, ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ক'জন এসে ঘিরে দাঁড়াল কনস্টেবলকে।

আকৃতি প্রাক্কা থেকে বেরতে খুব বেশি রাত হয়নি, সাড়ে ন'টা বাজে। শীতকাল বলে রাস্তা এখনই বেশ ফাঁকা। লর্ডসের মোড় পার হল ঝিনুকদের গাড়ি। ড্রাইভার আশুদা দারুণ মুডে আছে। ঝিনুকদের এক্সপিডিশানে গাড়ি চালাতে পারলেই সে বাড়তি এনর্জি পেয়ে যায়। মেজাজ ভাল আছে বলেই পাশে বসা নারান খা খাকে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। জেনে নিয়েছে, ড্রাইভিং জানে। দীপকাকু নিরস্ত করেছেন। বলেছেন, "তুমি যেমন পাহাড়ে ওর মতো গাড়ি চালাতে পারবে না, ও-ও তেমনি কলকাতার রাস্তায় ড্রাইভ করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে।"

এর পর থেকে আশুদা বলে যাচ্ছে, তার পাহাড়ে গাড়ি চালানোর এক্সপেরিয়েন্স। শুনতে বেশ ভালই লাগছে ঝিনুকের। রিলিভড ফিল করছে। কেসটার জটিলতায় মাথা পুরো জট পাকিয়ে গিয়েছিল। আচমকা কানের কাছে বিকট আওয়াজ। চমকে ওঠার মধ্যেই ঝিনুকের কোলের উপর কীসব যেন এসে পড়ল। ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে গাড়ি। ভিতরে ধোঁয়া মতো। আশুদা আতঙ্কিত গলায় বলে উঠল, "গুলি করে পালাল। মোটরবাইক।"

ঝিনুক দেখল পাশে দীপকাকু নেই। গাড়ির দরজা খোলা। জানলার কাচে অজস্র ফাটল আর একটা ফুটো। জানলার কাচই এসে পড়েছে ঝিনুকের কোলে। ফের কাঁপা গলায় আশুদা বলে উঠল, "দাদা রাস্তায় বসে কী করছে দ্যাখো, আগের বার মিস করেছে লোকটা, এবার তো সামনে থেকে গুলি করে দিয়ে যাবে!"

ঘোরের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে আসে ঝিনুক। রাস্তায় উবু হয়ে বসে দীপকাকু কিছু খুঁজছেন মনে হচ্ছে। ঝিনুক বলে, "কী খুঁজছেন? চলে আসুন। আবার যদি ফিরে আসে!"

"আর আসবে না। খুন করার জন্য গুলি চালায়নি। হুমকিটা ফাঁপা নয়, বুঝিয়ে দিয়ে গেল। বুলেটের খোলটা খুঁজছি।"

ফাঁকা কার্তুজটা পেয়েও গেলেন তিনি, হাতে নিতে গিয়ে বোধ হয় গরম ছ্যাঁকা লাগল। রুমাল বের করে ধরলেন। সবসুদ্ধ পকেটে পুরে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, "আমাকে ভয় দেখাতে গিয়ে নিজের অপরাধ বাড়িয়ে ফেলল অপরাধী, ফেলে গেল কার্তুজ। আমার ধারণা, যে পিস্তল দিয়ে ভাবনাকে খুন করা হয়েছিল, এটা সেটারই কার্তুজ। আগের ফাঁকা কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটে, এটার সঙ্গে ম্যাচ করাব।"

রাস্তা থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে আকৃতি প্রাক্কায় ফিরে এসেছে ঝিনুকরা। গেটের কাছে দাঁড় করানো হল গাড়ি। দীপকাকু, আশুদা আর ঝিনুক নেমে এল। গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাওয়া লোকটার বাইকের মডেলটা আইডেন্টিফাই করেছে আশুদা, নম্বরটা পড়তে পারেনি। ঝিনুকদের দেখে টুলে বসে থাকা সিকিউরিটি স্টাফটি এগিয়ে এল। দীপকাকুর উদ্দেশে বলল, "কী ব্যাপার স্যার, আপনারা তো কিছুক্ষণ আগেই বেরলেন, আবার ফিরে এলেন!"

"আমরা এখান থেকে বেরনোর পর ক'টা বাইক গেট থেকে বেরিয়েছে? তার মধ্যে কি কোনওটা আবার ফিরে এসেছে ইতিমধ্যে?"

দীপকাকুর প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে পাশে দাঁড়ানো আশুদা বাইকের মডেলটাও বলে দিল। সিকিউরিটির লোকটা বলল, "ওই মডেল তো এখন খুব পপুলার। আপনারা চলে যাওয়ার পর চারটে বাইক বেরিয়েছে, তিনটেই ওই মডেলের। একটা ফিরে এসেছে।"

"সেটা কার?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

লোকটা বলল, "সি ব্লকের সান্যালবাবুর। তবে কে চালাচ্ছিল বলতে পারব না। হেলমেট তো ছিলই, ঠান্ডার জন্য জ্যাকেটও।"

"চলো, বাইকটা কোথায় রাখে দেখাও। ওই বাইকটাই কিনা শিয়োর হয়ে নিয়ে সান্যালবাবুর সঙ্গে কথা বলব।"

দুটো ব্লক পার করার পর একটার গ্যারাজের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন দীপকাকু। বাইক নয়, কভার ঢাকা একটা গাড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কী দেখছেন, বুঝতে পারছে না ঝিনুক। এখনই জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। দীপকাকুর কপালে ভাঁজ পড়ে গিয়েছে। সিরিয়াস বিষয়।

॥ ৬ ॥

আকৃতি প্লাজায় আজ আবার শোরগোল কাণ্ড। পুলিশের বড় একটা দল সার্চ করতে এসেছে। তবে কারও ফ্ল্যাটে নয়, হাউজিংয়ের কম্পাউন্ড জুড়ে চলছে তল্লাশি। পরশু ঝিনুকদের গাড়ি লক্ষ করে গুলি চালানোর জন্যই পুলিশের এই পদক্ষেপ। যে পিস্তল থেকে চালানো হয়েছে গুলি, খোঁজা হচ্ছে সেটাই। পুলিশের কাছে ইনফরমেশন এসেছে এই কমপ্লেক্সের কোনও একজনের কাছে লাইসেন্সবিহীন পিস্তল রয়েছে। ঝিনুকদের গাড়িতে ছোড়া বুলেটের খোলের সঙ্গে ম্যাচ করে গিয়েছে ভাবনা গার্জিকে মারা বুলেটের খোল। পুলিশ মনে করছে, অপরাধী পিস্তলটা নিজের ফ্ল্যাটে রাখবে না, সার্চিংয়ের ভয়ে। নিজের নাগালের মধ্যে এই কম্পাউন্ডের কোনও গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখবে পিস্তলটা। পুলিশের অভিযানে অংশ নিয়েছেন দীপকাকু এবং অবশ্যই ঝিনুক। দীপকাকু পুলিশের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে তল্লাশি চালাচ্ছেন না। উনি আছেন সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটে, সেখানে পাঁচ সন্দেহভাজনকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন নতুন করে। ঝিনুক রয়েছে পুলিশের তল্লাশি টিমের সঙ্গে। ইতিমধ্যে দেখা হয়েছে ইলেকট্রিক মিটার ঘর, জলের পাম্পের ঘর। এখন পার্কের বেঞ্চের তলাগুলো দেখা হচ্ছে। পুলিশের পিছন-পিছন ঘুরছে এই কমপ্লেক্সের কিছু কচিকাঁচা, কয়েকজন বয়স্ক লোক। তারা জানে না আজকের এই পুলিশি অভিযান আসলে একটি প্রহসন। অপরাধীকে প্রমাণসুদ্ধ ধরার প্ল্যান। প্রহসনের নির্দেশক দীপকাকু। যেহেতু নাটকটা কোনও মঞ্চে উপস্থাপিত হচ্ছে না, তাই প্রয়োজনীয় আলোকসম্পাতের জন্য নির্ভর করতে হয়েছে প্রকৃতির উপর। বিকেলের আলোয় শুরু হয়েছে অপারেশন, ক্লাইম্যাক্সের জন্য বাছা হয়েছে সন্ধেবেলাটা। বাবা এই অভিযানেও সামিল হতে চেয়েছিলেন, দীপকাকু রাজি হননি। বলেছেন, "সন্দেহভাজনদের আপনাকে দেখে খটকা লাগবে। অপারেশনের ছন্দ কাটবে তাতে। তার চেয়ে এতদিন যখন কেসটার বিবরণ আমাদের থেকে শুনেছেন, শেষটাও জেনে নেবেন।"

বাবা মেনে নিলেন দীপকাকুর কথা। গাড়িটা নিয়ে যেতে বললেন বাবা। দু'জনের জন্য গাড়ির প্রয়োজন হবে না বলে নেওয়া হয়নি। নারান খাখা তো আর যাচ্ছে না আজ সঙ্গে। সে আছে ভাবনা গার্জির মা-ভাইয়ের সঙ্গে তাদের এক দেশওয়ালির কলকাতার ডেরায়। কোর্টে কেস উঠলে সাক্ষ্য দিতে আসবে তারা।

বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে হতে চলল। পুলিশের দল বাউন্ডারি ওয়ালের দিকে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে ঝিনুকও। দেওয়াল ধরে মরসুমি ফুলের বাগান, টবের গাছও আছে। পুলিশ লাঠি দিয়ে আলতো করে গাছগুলো সরিয়ে নীচের দিকটা দেখছে। একজন কনস্টেবল একটা টবের গাছের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আসলে দীপকাকুরই নির্দিষ্ট করে দেওয়া টব। লাঠি দিয়ে টবের গাছ নাড়াচাড়া করে উবু হয়ে বসলেন। টবটা সরাতেই একটা গর্ত, কনস্টেবল বলে উঠলেন, "এই তো পেয়ে গিয়েছি।"

পুলিশ ছাড়াও উপস্থিত সকলে ঘুরে তাকাল কনস্টেবলের দিকে। উনি ততক্ষণে গর্ত থেকে বের করে ফেলেছেন ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক ব্যাগে ভরা একটা পিস্তল। ঝিনুকসহ গোটা তল্লাশি টিম, ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ক'জন এসে ঘিরে দাঁড়াল কনস্টেবলকে। উনি হাতে রাবারের গ্লাভস পরে নিয়েছেন, এটাও প্রহসনের প্রয়োজনে। ব্যাগ থেকে পিস্তলটা বের করে ম্যাগাজিন খুলে ফেললেন। কার্তুজগুলো হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "সেম ব্যাচের কার্তুজ। এই পিস্তলটা থেকেই ছোড়া হয়েছে গুলি।"

"স্যার, পিস্তলের মডেলটা কী?" জানতে চাইল ঝিনুক।

মুখ তুলে কনস্টেবল বললেন, "বেরেটা এম নাইন।"

"যাই, আমার স্যারকে খবরটা দিয়ে আসি," বলে ঝিনুক দৌড়ল সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটের উদ্দেশে। একেবারে টাইম ধরে চলছে প্রহসন। সন্ধে নেমে গিয়েছে পুরোপুরি।

লিফটে করে ছ'তলায় উঠে এল ঝিনুক। সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপিয়ে গিয়েছে, দম নিচ্ছে। পাঁচ সন্দেহভাজন এবং সুপ্রিয় পালের ফ্যামিলির মাঝখানে সোফায় বসা দীপকাকুর দিকে তাকিয়ে বলল, "পাওয়া গিয়েছে পিস্তল।"

কে যেন জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

"বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে একটা টবের নীচে গর্তের মধ্যে ছিল পিস্তলটা।"

"ওটা থেকেই যে ফায়ার করা হয়েছে, কী করে বোঝা গেল?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

ঝিনুক বলল, "কার্তুজের ব্যাচ ম্যাচ করে গিয়েছে।"

"পিস্তলটা কোন মডেলের, জেনেছ?" ফের দীপকাকুর প্রশ্ন।

উত্তরে ঝিনুক বলল, "জেনেছি, বেরেটা এম নাইন।"

"চলো তো দেখি," বলে সোফা ছেড়ে উঠে এলেন দীপকাকু। পিছনে বাকিরাও আসছে। এর পরই ক্লাইম্যাক্স! দীপকাকু বলে রেখেছেন, "ভিড়ের সঙ্গে নীচে নামতে-নামতে তুমি লক্ষ রাখবে, কেউ একজন আলাদা হয়ে গেল নাকি। সেই লোকটাই হচ্ছে অপরাধী। তাকে ফলো করবে এমন সন্তর্পণে যেন টের না পায়। দীপকাকুর কথা অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। ঝিনুক অনুসরণ করে যাচ্ছে লোকটিকে। গ্রাউন্ড ফ্লোরের গ্যারাজ স্পেস ধরে লোকটা তড়িঘড়ি পায়ে এগোচ্ছে। একবার মাত্র পিছন ফিরে তাকিয়েছে। চট করে থামের আড়ালে চলে গিয়েছে ঝিনুক। সন্ধের অন্ধকারটাও গোপন অনুসরণে বেশ কাজে লাগছে। প্যাসেজে বাল্বগুলোর আলো খুবই ম্লান। দীপকাকুর আন্দাজমতো লোকটা একটা কভার দেওয়া গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাইক খুঁজতে এসে শেষবার দীপকাকু এই কভারঢাকা গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। এখন এই স্পটে দু'জন পিস্তলধারী কনস্টেবল মোতায়েন রয়েছেন দীপকাকুর পরামর্শে। তাঁরাও ঝিনুকের মতো আড়াল থেকে নজর রাখছিলেন লোকটার উপর। একজন অপরাধীকে ধরতে যাবেন। কোনও কারণে যদি ব্যর্থ বা আক্রান্ত হন, অন্যজন সেই কাজটা করবেন। টেকনিক্যালি যাকে বলে

কভার করা। ঝিনুকের দায়িত্ব, যদি পরিকল্পনার বাইরে কিছু ঘটতে থাকে তক্ষুনি দীপকাকুকে ফোনে ইনফর্ম করা। ফোনসেট হাতে ধরে রেখেছে ঝিনুক। লোকটা গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে কভার খানিকটা তুলে ফেলল। পকেট থেকে বের করল চাবি। ডিকিটা খুলতে গিয়ে থতমত খেল, চাবি কাজ করছে না। দু'হাত দিয়ে ডিকির ডালাটা তুলতে গিয়ে দেখল, লক করা নেই। দিব্যি উঠে গেল ডালা। ফিটদশেক দূরে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঝিনুক দেখতে পাচ্ছে লোকটার ঘাবড়ে যাওয়া চোখ-মুখ। ঝুঁকে পড়ে ডিকির ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল লোকটা। সঙ্গে-সঙ্গে পিছনে এসে দাঁড়ালেন এক কনস্টেবল। পিস্তল উঁচিয়ে লোকটিকে বললেন, "হ্যান্ডসআপ!"

লোকটাও তড়িৎবেগে ডিকি থেকে পিস্তল বের করে তাক করল কনস্টেবলের দিকে। বিদ্রুপের হাসি দেখা দিল কনস্টেবলের মুখে। বললেন, "তোকে প্রমাণসমেত ধরব বলেই পিস্তলটা ওখানে রাখা হয়েছে।"

কেয়ারটেকার আদিত্য ট্রিগার টিপে দেখল, সত্যিই ম্যাগাজিন খালি। মুহূর্তের মধ্যে পিস্তলটা ছুড়ে মারল কনস্টেবলের মুখে। এরকম অতর্কিত আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না কনস্টেবল, মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়লেন। আদিত্য দৌড় লাগিয়েছে মেনগেট লক্ষ করে। রাস্তা ধরে যাচ্ছে না, শর্টকাটের জন্য পার্কের ভিতর দিয়ে দৌড়চ্ছে, ঝিনুক নিজের অজান্তে আদিত্যকে ধরার জন্য স্প্রিন্ট টানতে শুরু করেছে। আন্দাজ করতে পারছে, তার পিছনে ছুটে আসছেন কভার করার দায়িত্বে থাকা কনস্টেবল। আদিত্য যদি তার নাগালের বাইরে চলে যায়, পায়ে গুলি করে ওর দৌড় থামিয়ে দেওয়া যাবে। তবু কোনও চান্স নিতে চায় না ঝিনুক, গুলি তো ফসকাতেও পারে। কিন্তু ঝিনুকের দৌড়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না আদিত্য। সত্যিই পারল না, যথেষ্ট ভাল দৌড়নো সত্ত্বেও। আদিত্যর শার্টের কলার খামচে ধরেছে ঝিনুক। সজোরে ডান হাতটা পিছন দিকে চালাল আদিত্য। হাতটা ধরে ফেলে সামান্য বেন্ড হয়ে ঝিনুক বাঁ পায়ে ক্যারাটে শেখা বিশুদ্ধ স্ট্রোকটি মারল আদিত্যর ডান হাঁটুতে। ভাসমান অবস্থা থেকে আদিত্য আছড়ে পড়ল মাটিতে। ডান হাঁটু ভাঁজ করে ঝিনুক লাফিয়ে পড়ল পিঠে। যাতে আর পালাতে না পারে। চাপা আর্তনাদ বের হয়ে এল আদিত্যর গলা দিয়ে। ঝিনুক মুখ তুলতেই দেখে, সামনেই দীপকাকু সমেত গোটা পুলিশবাহিনী। দীপকাকুর অতটা না হলেও বাকি সবার চোখে বিষম বিস্ময় আর বাহবা। লজ্জা পেয়ে যায় ঝিনুক। আদিত্যর পিঠ থেকে সরে এসে পিছিয়ে যায় দু' পা।

পায়ে গুলি না চালিয়ে অপরাধীকে ধরতে পারা গিয়েছে বলে ঝিনুক পুলিশের কাছে খুবই প্রশংসিত হয়েছে। তা হলে আহত অপরাধী যদি মারা যেত, কোর্টে বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হত পুলিশকে। আকৃতি প্লাজা থেকে সরাসরি ঝিনুকদের বাড়িতে আসা হয়েছে। বাবা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ঘটনার শেষটা শোনার জন্য। বলে যাচ্ছেন দীপকাকু। আদিত্যর উপর প্রথমে তাঁর সন্দেহ জাগে, যখন জেনেছিলেন তাঁর ঘর বাউন্ডারি ওয়ালের ধার ঘেঁষে। গুলির আওয়াজের পর আদিত্য দ্বিতীয় ব্যক্তি , যে সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। অত দূর থেকে কী করে এত তাড়াতাড়ি এলেন? তার মানে তিনি কাছাকাছিই ছিলেন। রাত দুটো নাগাদ কী করছিলেন বাইরে? ব্যালকনির জানলার ছিটকিনিটা তোলার জন্যই এই তাড়াহুড়োটা করে ফেলেন আদিত্য। ছিটকিনিটা খুলে রেখেছিল কে? এটা বের করতে বেগ পেতে হয়েছে দীপকাকুকে। তোর্সার অনুপমের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতেই জট খুলে যায়। করপোরেশনের বিল পালটাপালটি হওয়ার কারণে আদিত্য যখন ফ্ল্যাটে এসেছিল, অনুপম তার কথা শুনেছিলেন, ঘুরে দেখেননি। অর্থাৎ, মেঝেয় বসা অনুপমের পিঠ ছিল দরজার দিকে। তোর্সাও ফ্লার্টিংয়ে মগ্ন। দু'জনকে এভাবে আগেও দেখেছেন আদিত্য, তাই এই সময়টাই বেছে নিয়েছিলেন ছিটকিনি খোলার জন্য। বিলটা উনি আগে থেকেই পালটে দিয়েছিলেন, যাতে এই অজুহাতে সোমাদেবীকে ভিতর ঘরে পাঠানো যায়। এগারোই ডিসেম্বর সুপ্রিয় পালের সঙ্গে মাত্র পাঁচ মিনিট উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের পর ডাবলা গার্জি কোথায় ছিল ভাবতে গিয়ে দীপকাকুর মনে হয়, আদিত্য হয়তো উপরের কোনও ফ্ল্যাটের সমস্যা অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছিল। এখানে আদিত্যকে মনে করার কারণ, ততদিনে সন্দেহ তার দিকে ঘুরে গিয়েছে। আদিত্য ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে নীচের ঝগড়া শোনে। বুঝতে পারে, কোনও দুর্মূল্য জিনিস ফেরত নিতে এসেছে কেউ। ডাবলা গার্জি যখন নীচে নেমে এসেছে, আদিত্য আলাপ জমায় তার সঙ্গে। কী কারণে ঝগড়া হল জানতে চায়। ডাবলা গার্জি সবকিছু বললেও কোন জিনিসটা ফেরত নিতে এসেছে বলেনি। ভয় ছিল, সে চলে যাওয়ার পর যদি আদিত্য জিনিসটা সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাট থেকে চুরি করে নেয়। আদিত্য যখন বুঝতে পারল ডাবলা বলবে না কোন জিনিসটা নিতে এসেছে, তখন অন্য প্ল্যান নিল। ডাবলাকে বলল, "আমি তোমাকে ওই ফ্ল্যাটে গোপনে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব, সেই বাবদ যদি তুমি আমাকে কিছু টাকা দাও।"

ডাবলা রাজি হয়। কেয়ারটেকার হিসেবে ছাদের একটা চাবি আদিত্যর কাছে ছিল। পাইপে দড়ি বেঁধে ডাবলাকে সুপ্রিয় পালের ফ্ল্যাটে নামার রাস্তা করে দেয়। ব্যালকনির দরজা খোলার ব্যবস্থা বিল দিতে এসে করে রেখেছিল। ডাবলার সঙ্গে আদিত্যও ফ্ল্যাটে নেমে এসেছিল একটাই কারণে, ছেলেটাকে নিরাপদে বের করে আনতে হবে। ডাবলা ধরা পড়ে গেলে আদিত্যর নাম বলে দেবে। ডাবলাকে খুন করে ঘড়িটা হাতিয়েই নিত আদিত্য, তবে সেটা কম্পাউন্ডের বাইরে গিয়ে। তাই পকেটে ছিল পিস্তল, বাইরে মারবে ঠিক করেছিল বলে সাইলেন্সার লাগানোর কথা ভাবেনি। ডোরবেলের আওয়াজ শুনে মারতে হল

ফ্ল্যাটেই। ঘণ্টাটি এবং ডাবলার মোবাইল, পার্স নিয়ে যে রাস্তা দিয়ে ঢুকেছিল, পালায় ওখানেই। যেহেতু ছাদেই ছিল, জানলার ছিটকিনি তুলে দিতে তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছিল সুপ্রিয়বাবুর ফ্ল্যাটে। গুলির আওয়াজ কোথা থেকে এল, এই অজুহাতে ঢুকেছিল। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘণ্টার হদিশ পাওয়া গেলেও, চোরের নাগাল পাওয়া গেল না। বীরপাড়ায় যেতে হল ঘণ্টাটার উৎস সন্ধানে। আদিত্য ততদিনে ডাবলার ফোন থেকে ভাইয়ের নম্বর নিয়ে কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছে। তদন্ত যাতে তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়, সেই চেষ্টা করছে। সুপ্রিয় পাল জিনিসটা কীভাবে সংগ্রহ করেছেন, বাইরের কাউকে বলেননি, স্ত্রীকেও না। বেআইনিভাবে বিদেশি জিনিস পেলেও সেটা যেহেতু কেউ জানে না, গোপনে বিক্রি করার তাগিদ অনুভব করেননি। ডাবলা ঘুরে যাওয়ার পর লক লাগিয়েছিলেন রাউন্ড শেপের পাল্লায়।

তদন্তের শেষ পর্যায়ে দীপকাকু সুপ্রিয়বাবুর কাছে জানতে চান, নতুন লকটা দেখার পর আদিত্য কী বলেছিল? সুপ্রিয়বাবু জানান, আদিত্য লকটা দারুণ বলে চাবি চেয়ে খোলা-বন্ধ করে দেখেছিল। সুপ্রিয়বাবুর সঙ্গে দীপকাকুর এই কথোপকথন ঘটেছিল ঝিনুকের অগোচরে। দীপকাকু বুঝে যান, লক খোলা-বন্ধ করার সময় পকেটে সাবান রেখেছিল আদিত্য, চাবির ছাপ তুলে নেয়। প্রথমে জেরায় আদিত্য বলেছিলেন, দামি জিনিস সুপ্রিয়বাবু ঘরের ভিতরে রেখেছেন, পাল্লার নতুন লকটা আইওয়াশ। কাচের পাল্লা ভেঙেই তো চুরি করা যায়। দীপকাকুর দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য কথাটা বলেছিলেন। ভুল করেছিলেন, সন্দেহ ওঁর দিকেই চলে গিয়েছিল। সুপ্রিয়বাবু ট্যুরে যাবেন, আগেই খবর জোগাড় করেছিলেন আদিত্য। কাচের পাল্লা ভাঙতে গেলে আওয়াজ হত, তাই লকের চাবি নকল করার দরকার হয়ে পড়েছিল। দীপকাকুকে প্রথম হুমকিটা দিতে কোনও অসুবিধে হয়নি আদিত্যর, কেয়ারটেকার বলে সিকিউরিটি রুমের সামনে তাঁকে প্রায়ই দেখা যায়। কী করছেন না-করছেন গার্ডরা খেয়াল করে না। এক ফাঁকে দীপকাকুর বাইকে হুমকির চিরকুট রেখে দিয়েছিল। সিকিউরিটি স্টাফদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদেই ডাবলার মৃত্যুর পর রেজিস্টার খাতা থেকে এগারোই ডিসেম্বর ওর এনট্রির তথ্যটা কেটে দিতে পেরেছিল। ভিডিয়ো ফুটেজ সরাতে পারেনি আদিত্য। সেটা ততদিনে কপি হয়ে চলে গিয়েছে সিকিউরিটি এজেন্সির ব্যাকিংয়ে। দ্বিতীয় হুমকিটা দিয়ে ভুল করে বসে আদিত্য। দীপকাকু বাইকের সন্ধানে আকৃতি প্রাজায় ফেরত এসে দেখেন, একটা গাড়ির কভারের পিছনটা একটু উঠে আছে। তা হলে কি ওখানেই এইমাত্র গুলি ছুড়ে আসা পিস্তলটা রাখা হয়েছে? তখনই সার্চ করেননি দীপকাকু। সান্যালবাবুর ফ্ল্যাটে যান, যিনি কিছুক্ষণ আগে অপরাধী যে মডেলের বাইক চেপে গুলি চালিয়েছিল, সেই একই মডেলের বাইক নিয়ে হাউজিংয়ে ফিরেছেন। সান্যালবাবু জানালেন, তিনি ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিলেন। প্রেসক্রিপশনও দেখালেন। সান্যালবাবুর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সিকিউরিটি রুমে এসেছিলেন দীপকাকু। সি সি টিভি ফুটেজ দেখলেন, আদিত্যকে পায়ে হেঁটেও গেটের বাইরে যেতে দেখা গেল না। আদিত্যর ঘর যেহেতু বাউন্ডারি ওয়ালের গায়ে, দীপকাকু ধরে নিলেন আদিত্য পাঁচিল টপকে চেনা কারও বাইক নিয়ে কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। একইভাবে ফিরেও এসেছে। তার ঘরে আলো জ্বলছিল। জানলা দিয়ে দেখাও গিয়েছিল তাকে। তার মানে পিস্তলটা সে লুকিয়ে ফেলেছে এমন জায়গায়, যেখানে পুলিশের হাত পৌঁছবে না। সেখানেই নিশ্চয়ই রেখেছে ঘণ্টাটা। খুব সম্ভবত কভারঢাকা গাড়িতেই আছে জিনিসদুটো। দীপকাকু সিকিউরিটি স্টাফের কাছে জেনে নিয়েছিলেন ওই গাড়িটার মালিক এখন বিদেশে, চাবি থাকে আদিত্যর কাছে। গভীর রাতে পুলিশকে নিয়ে এসে দীপকাকু ডিকির তালা ভেঙে দুটো জিনিস পেয়ে গেলেন। পিস্তল থেকে গুলি সরিয়ে নিয়ে দুটো জিনিসই রেখে দিলেন যথাস্থানে। আদিত্যকে হাতেনাতে ধরার জন্যই রেখেছিলেন। নয়তো আদিত্য বলতে পারতেন, ওসব আমার নয়। তারপর প্রহসন রচিত হল। পিস্তল পাওয়া গিয়েছে শুনে আদিত্য ঘাবড়ে গিয়ে নিজের গোপন জায়গায় পৌঁছল। ঘণ্টা এবং পিস্তল দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবল, যে পিস্তলটা পেয়েছে পুলিশ, সেটা অন্য কারও। ভাবতে পারেনি পিস্তলে গুলি নেই। পুলিশকে গুলি করতে গিয়ে বামাল ধরা পড়ল। দীপকাকুর কৃতিত্বে সুপ্রিয় পালের ঘাড়ে খুনের দায় চাপেনি বলে উনি স্বস্তি পেয়েছেন। শাস্তি অল্প হবে। দীপকাকুকে রেমুনারেশন দেবেন বলেছেন। পুলিশও পুরস্কৃত করবে দীপকাকুকে। এত সাফল্য সত্ত্বেও একটা আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে ঝিনুকের। জঙ্গলে সেই পরিত্যক্ত বৌদ্ধমন্দিরটায় যাওয়া হল না। দীপকাকু, বাবার কথাবার্তার মাঝে অলীক কল্পনায় সে পৌঁছে যায় জঙ্গলাকীর্ণ বৌদ্ধমঠের পথে। তার হাতে চুরি যাওয়া তিব্বতি ঘরানার ঘণ্টা। রেখে আসবে মন্দিরে। সন্ধে নেমে গিয়েছে, মন্দির পাহারা দিচ্ছে পাহাড় আকৃতির হাতির দল। ঝিনুককে দেখে তারা পথ ছেড়ে দাঁড়াল। শুঁড় তুলে হাঁক দিল, বৃংহণ। আসলে ঝিনুককে অভিনন্দন জানাল তারা।

ছবি: কুনাল বর্মণ

মণিপিসি

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

আমার মণিপিসি সায়েন্টিস্ট। সে খবর তো সবাই জানে। কিন্তু তার যে অনেক গোপন আবিষ্কার আছে সে খবর কেউ জানে না। মণিপিসি কাউকে বলেই না। তেতলার টংঘরে সে থাকে। সেখানে অনেক কম্পিউটার আর গ্যাজেট। আমাদের সেগুলো ধরা মানা। তার মাথার চুল উসকোখুসকো। মোটা-মোটা বই পড়ে আর কম্পিউটার চালায়। মাঝে-মাঝেই ঘুরতে চলে যায়। কোথায় যায় কাউকে বলে না। তারপর আবার ক'দিন বাদে ফিরে এসে বই খুলে বসে আর খটখট করে কিবোর্ডে কীসব লেখে তার মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। নিশ্চয়ই গোপন সব ফরমুলা-টুলা হবে।

মণিপিসির একখানা গোপন আবিষ্কারের কথা কেমন করে জানলাম বলি। একবার সে মাসখানেক কোত্থেকে ঘুরেটুরে ফিরে ঘরের দরজা ভেজিয়ে কার সঙ্গে যেন ফোন করছিল।

তখন আমি দরজা ঠেলে তার ঘরে গিয়ে হাজির। শুনলাম মণিপিসি বলছে, "...ফ্লু টু মিল্কি আহেড অফ শিডিউল বাট..."

আমায় দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি বলল, "ওকে, আই হ্যাভ অ্যা লিট্‌ল ইনট্রুডার হিয়ার। শ্যাল টক লেটার..." বলে ফোনটা তড়িঘড়ি রেখে দিয়ে উঠে এসে বলল, "আমসত্ত্ব খাবি দেবু?"

মিল্কিওয়েতে মানুষটানুষ যায় বলে শুনিনি। তেমন রকেট এখনও নাসা, ইসরো কেউ বানায়নি। মণিপিসি তা হলে মিল্কিওয়েতে উড়ে যাওয়ার যন্ত্রও বানিয়ে ফেলেছে দেখছি। আর সেটা যে গোপন কথা তা তো বোঝাই যাচ্ছে। নইলে দরজা বন্ধ করে ফোনই বা করবে কেন? আর আমায় দেখে ইনট্রুডার বলে হাঁক দিয়ে তড়িঘড়ি ফোন ছেড়ে আমসত্ত্ব দিয়ে ভোলাবেই বা কেন?

ক'দিন বাদে রাতে মণিপিসির কাছে অঙ্ক কষতে-কষতে হঠাৎ বললাম, "আচ্ছা মণিপিসি, তোমার বুঝি অনেক গোপন আবিষ্কার আছে?"

পিসি চোখ গোল-গোল করে বলল, "কী করে জানলি?"

বললাম, "সেদিন দুপুরে তুমি যখন ফোন করছিলেন তখন শুনে ফেলেছি। তুমি উড়ে-উড়ে মিল্কিওয়েতে গিয়েছিলে। তারার যাওয়ার রকেট বানিয়েছ নিশ্চয়ই?"

শুনে পিসির কপালের ভাঁজগুলো মিলিয়ে গেল। ফিক করে হেসে বলল, "বাব্বাঃ! ভয় পাইয়ে দিয়েছিলিস তো!" তারপর আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিতে-দিতে বলে, "হুম। তোর দেখছি জেব্বার বুদ্ধি। হবে না? আগের জন্মে তো তুই..."

আমি বেজায় অবাক হয়ে বললাম, "কী করে জানলে?"

"ও মা! আমার কাছে একটা টাইম ভিউয়ার আছে যে!"

শুনে তো আমার আক্কেল মাথায় উঠেছে। বললাম, "কই, দেখাও?"

মণিপিসি অমনি বালিশের তলা থেকে একটা কালো রঙের স্মার্টফোন বের করে আনল।

আমি বললাম, "এ মা, এটা তো ফোন। বাবারও আছে।"

"দুর বোকা," মণিপিসি হাসল, "এটা ফোনের মতো দেখতেই শুধু। কিন্তু আসলে এটা একটা টাইম ভিউয়ার।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ রে। আয়, এইটেতে একশো বছর পিছিয়ে গিয়ে তুই কে ছিলি সেইটে দেখিয়ে দিই তোকে। আমার দিকে তাকা দেখি। নড়বি না একদম।"

এই বলে মণিপিসি জিনিসটাকে আমার দিকে তাক করে ধরে ক্লিক করে একটা ফোটো তুলে ফেলল। তারপর ফোটোটা দেখতে-দেখতে বলল, "কী সুন্দর হয়েছিস রে বাবুয়া!"

পিসি খুশি হলে আমাকে বাবুয়া বলে ডাকে।

বললাম, "কই, পাস্ট দেখাও!"

"দাঁড়া। আগে যন্ত্রের মগজ তোর ফোটোটা নিয়ে একশো বছর আগের লোকজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুক, তবে না..."

বলতে-বলতেই পিসি যন্ত্রটার নানান বোতামটোতাম টিপে সেটাকে কম্পিউটারের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বলল, "এই যে, এসেছে। ওরে দুষ্টু, তুই কে ছিলিস দ্যাখ একবার!"

পরদার দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে সত্যি-সত্যি পাস্ট দেখা যাচ্ছে। একটা সাদাকালো ছবি নড়ছে, তাতে একটা লোক অদ্ভুত দেখতে দোতলা ডানার একখানা এরোপ্লেন নিয়ে লাফাতে-লাফাতে আকাশে উঠে পড়ল।

"তুই আগের জন্মে অরভিল রাইট ছিলি, বুঝলি! প্রথম এরোপ্লেন আবিষ্কার করেছিলি রে তুই বাবুয়া। ভাব একবার!"

আমি বেজায় অবাক হয়ে গেলাম। আনন্দও হচ্ছিল খুব। আমি কী না এরোপ্লেন আবিষ্কার করেছিলাম গত জন্মে! সেটাও আবার টাইম ভিউয়ারে নিজের চোখে দেখে ফেললাম।

*****

মণিপিসির কাছে অবশ্য আরও অনেক গ্যাজেট আছে, কিন্তু ওর মধ্যে টাইম ভিউয়ারটাই আমার এখন সবচেয়ে প্রিয়। ও দিয়ে আমি জুরাসিক এজের ডাইনোসর দেখেছি, তারপর ধরো রবীন্দ্রনাথ, নিউটন, আইনস্টাইন এইসব অনেক লোকের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। ইশকুলে আমার এখন বেজায় সুনাম। দুর্গাপুজোর মধ্যে একদিন পিসির সঙ্গে প্যান্ডেলে গিয়ে দেখি ক্লাসটিচার রত্নাম্যাম সেখানে বসে আছে। পিসিকে দেখে বলে, "মণিদি, দেবুকে যে আপনি হাতে নিয়েছেন সে ওর লেখাপড়া আর জেনারেল নলেজের লেভেল দেখেই বোঝা যাচ্ছে। লাকি ছেলে। নইলে এমন একজন মানুষের কাছে..."

মণিপিসি নির্বিকার মুখে বলল, "আসলে ইন্টারনেটে আজকাল হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি এইসবের অনেক এডুকেশনাল ভিডিয়ো পাওয়া যায় তো! তা ছাড়া আমার হার্ড ডিস্কেও অনেক ওসব মেটিরিয়াল জড়ো করে রেখেছি ওর জন্য। সেইসব দেখিয়ে-দেখিয়ে গল্প করে-করে বলি। তোমরাও ইশকুলে এমন কিছু চালু করতে পার রত্না। ভেবে দেখো।"

আমি তখন মিটিমিটি হাসছি। টাইম ভিউয়ার গ্যাজেটটার কথা যদি রত্নাম্যাম জানতে পারত তা হলে হিংসেয় সবুজ হয়ে যেত নিশ্চয়ই। তা ছাড়া, মণিপিসি আবার পড়ায় কোথায় আমাকে? শুধু মজার-মজার সব গল্প বলে তো!

*****

একটা ব্যাপারে অবশ্য মণিপিসি

কক্ষনও রাজি হয় না। সেটা হল টাইম ভিউয়ার দিয়ে ফিউচার দেখা। কতবার পরীক্ষার আগে গিয়ে বলেছি, একবার শুধু রেজাল্ট বেরবার দিনটা দেখিয়ে দাও। রেজাল্ট দেখতে চাই না। শুধু বাবার মুখটা হাসি-হাসি না রাগ-রাগ সেইটে দেখিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু পিসি সেইটুকুও করতে একেবারে রাজি নয়। ওতে নাকি ভীষণ মানা আছে। একমাত্র শক্ত-শক্ত সব সমস্যা যখন হয়, তখনই শুধু ভবিষ্যৎ দেখার অনুমতি দেয় সরকার। তারপর হেসে-হেসে বলবে, "ভবিষ্যতকে জেনে ফেলাটা মোটেই ভাল কাজ নয় বাবুয়া। 'ডঃ হু'র এপিসোড দেখতে বসে দিদিভাই যদি শেষে কী হল সেইটা বলে তোকে স্পয়লার দিয়ে দেয় তা হলে তোর কেমন লাগবে বল? মজাটাই নষ্ট।"

*****

বেশ কয়েকবার এইরকম কথা শুনে-শুনে আমার মনে হয়েছিল মণিপিসির যন্ত্রটা বুঝি শুধু পাস্টই দেখতে পায়। ফিউচার দেখতে জানে না। কিন্তু সে ভুলটা আমার কেটে গেল সেবার কালীপুজোর দিন। সে গল্পটাই বলব।

আমাদের শহরের কালীপুজো যে খুব বিখ্যাত সে তো সবাই জানে। সেখানে ও সময়টা বেজায় বড় মেলা বসে। তাতে অনেক রাইড আসে। পাইরেট শিপ, ফ্লাইং সসার, মরণকুয়ো এইসব।

প্রতিবার কালীপুজোর মেলায় বাবা আর আমি গিয়ে রাইডটাইড চড়ি, কিন্তু এবারে সে আর হল না। দাদাভাইয়ের শরীর খারাপের খবর পেয়ে বাবা আর মা কালীপুজোর আগের দিন দিদিভাইকে নিয়ে দিল্লি চলে গেল। বাড়িতে আমি আর মণিপিসি একলা। দু'জন মিলে ছাদে মোমবাতিটাতি জ্বাললাম, ফানুস বানিয়ে ওড়ালাম, তারপর অনেক চরকি আর রকেট ফাটালাম সে সবই ঠিক, কিন্তু বাড়িটা এমন ফাঁকা যে তাতে মন খারাপ তো লাগবেই। তা ছাড়া মণিপিসি তো আর আমাকে মেলার মাঠে রাইড চড়াতে নিয়ে যাবে না!

বাজিটাজি পুড়িয়ে মণিপিসির ঘরে এসে বসে রইলাম চুপচাপ। রাত তখন সাড়ে ন'টা মতো বাজে। বাইরে বেজায় হইচই, বাজি ফাটানোর ধুম লেগেছে। মণিপিসি সেই টাইম ভিউয়ারটা কম্পিউটারের সঙ্গে লাগিয়ে চুপচাপ বসে কী সব লেখে যাচ্ছিল।

সঙ্গে-সঙ্গেই কম্পিউটারে আমাদের মেলার মাঠটার ছবি ফুটে উঠল। তার মাঝখানে মরণকুয়োটা দেখা যাচ্ছে। তার মেঝেতে একটা লাল মোটরবাইক আর একটা ছেলে পড়ে আছে।

হঠাৎ টাইম ভিউয়ারটা বেজায় জোরে হুইসল দিয়ে উঠল। চমকে তাকিয়ে দেখি তার পরদায় একটা মুশকো মতো সর্দারজির ছবি। সে তড়বড় করে হিন্দিতে কী যে বলে যাচ্ছে তার মাথামুন্ডু বোঝা দায়। টাইমমেট্রিক্স, অ্যানোম্যালি, অ্যাক্সিডেন্ট, ফিউচার এইসব বৈজ্ঞানিক কথাবার্তার মধ্যে-মধ্যে আবার রক্তিম, হাইস্কুল এইসব চেনা শব্দও ঢুকে যাচ্ছিল দু'-একটা।

লোকটার কথা শেষ হতে মণিপিসি শান্ত গলায় হিন্দিতেই বলল, "কোথায় আর কখন বলুন স্যার? কোনও ফোটো পাওয়া গিয়েছে কি?"

সঙ্গে-সঙ্গেই কম্পিউটারে আমাদের মেলার মাঠটার ছবি ফুটে উঠল। তার মাঝখানে মরণকুয়োটা দেখা যাচ্ছে। তার মেঝেতে একটা লাল মোটরবাইক আর একটা ছেলে পড়ে আছে। তাদের ঘিরে লোকজনের ভিড়। পরদার এক কোণে লাল হরফে সেদিনের তারিখ দেখাচ্ছিল, আর সময় দেখাচ্ছিল রাত দশটা বেজে পাঁচ। আমি সন্দেহের চোখে দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে দেখলাম একবার। উঁহু। সেখানে রাত ন'টা পঁয়ত্রিশ দেখাচ্ছে। তা হলে?

মণিপিসির তখন দুনিয়ার কোনওদিকেই নজর নেই আর। শুধু বলে যাচ্ছে, "সর্বনাশ! সর্বনাশ হয়ে যাবে রে..."

বলতে-বলতেই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পিসি বলল, "বাবুয়া চল, রেলের মাঠের মেলায় যেতে হবে একবার। এক্ষুনি।" তারপর আলমারিটা খুলে তার ভিতর ঘেঁটেঘুটে একটা পিলপুটে টর্চলাইট বের করে ঝোলায় ভরে নিয়ে বল, "চ"। শিগগির-শিগগির গিয়ে মরণকুয়োর ভিতর দশটার শো-টা ধরতে হবে।"

উশকোখুশকো চুলে, ঘরের পোশাক পরেই পিসি বাইরের দিকে হাঁটা লাগিয়েছে, তা আমি পিছন থেকে ডেকে বললাম, "ও পিসি, টাকা নেবে তো! টিকিট ছাড়া মরণকুয়োয়..."

পিসি ঘুরে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বলে, "ওই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে। ভাগ্যিস বললি!" এই বলে পার্সটা টেনে নিয়ে ঝোলায় ফেলে আমার হাত ধরে টানতে-টানতে নীচে এসে সোজা গ্যারেজে গিয়ে ঢুকল।

মণিপিসি যে এমন সাংঘাতিক গাড়ি চালায় কে জানত! একটা রিকশাকে উলটে দিয়ে, জেলে চাপা পড়তে-পড়তে বেঁচে, কনকনিয়ে ছুটে মেলার মাঠে যখন গিয়ে ঢুকলাম, তখন ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে দেখাচ্ছে দশটা বাজতে দশ। পিসি যখন কার পার্কে গাড়ি রাখছে আমি ততক্ষণে টাকা হাতে মাঠ পেরিয়ে ছুট দিয়েছি মরণকুয়োর টিকিট কাউন্টারের দিকে।

গিয়ে দেখি সাড়ে ন'টার শো-টা শেষ হয়েছে সবে। উপর থেকে লোকজন সব নেমে আসছে। মরণকুয়োর নীচের খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে এসে দুটো ছেলে লাল আর নীল দুটো মোটরবাইক নিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করে চক্কর কাটছে। কুয়োর চারপাশে ঠেকনা দেওয়া স্টিলের নাটিগুলোর ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে। একবারও কোথাও ঠেকে যাচ্ছে না। এইমাত্র তারা কুয়োর

ভিতরে খেলা দেখিয়ে বের হল।

খোলা দরজাটা দিয়ে কুয়োর ভিতরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল আমার। এই খাড়া দেওয়াল বেয়ে একটু বাদেই চক্কর খেতে-খেতে মাটি ছেড়ে অনেক উঁচুতে উঠে যাবে এই গাড়িগুলো।

কুয়োর সামনে একটা মোটকা ছেলে টিকিট বিক্রি করছিল। মাইকে রেকর্ড বাজছে, 'আসুন, আসুন, মরণকুয়োয় দুই বাইকের শিহরণ...মাত্র তিরিশ টাকায় দেওয়াল বেয়ে বাইক অভিযান...আসুন, আসুন।' ছেলেটার মাথায় অনেকক্ষণ ধরে একটা বাদামি মথ বসে আছে। তাতে তার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে টিকিট বেচতেই ব্যস্ত।

টিকিট কাউন্টারে বেজায় ভিড়। তাই ঠেলেঠুলে এগোবার চেষ্টা করছি এমন সময় হঠাৎ কানের কাছে ঘ্যাম করে একটা শব্দ হল। দেখি লাল মোটরবাইকটা এসে ঠিক আমার সামনে ব্রেক কষে দাঁড়িয়েছে। বাইকের ছেলেটা আমার হাত থেকে টাকা নিয়ে উপরের দিকে চালান করে দিতে-দিতে বলল, "কী রে? সঙ্গে কে এসেছে তোর? নাকি এইটুকু ছেলে একা-একা এসেছিস?"

অমনি আমার পিঠের উপর কে যেন হাত রেখে এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখি মণিপিসি এসে পৌঁছে গিয়েছে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে পিসি হঠাৎ বলে উঠল, "তোমার নাম রক্তিম, না?"

ছেলেটা একটু অবাক হয়ে ঘুরে দেখল পিসিকে। তারপর বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কী করে..."

মণিপিসি খুব ঠান্ডা গলায় কেটে-কেটে বলল, "তোমার মা-বাবা নেই। হাইস্কুলের পরে আর লেখাপড়া করোনি। উচ্চমাধ্যমিকে কিজিক্স আর অঙ্কে লেটার পেয়েও কলেজে ভর্তি হওয়ার বদলে রোজগারে নেমেছ। খেলা দেখাচ্ছ তিন বছর। কিন্তু তার পাশাপাশি, একা-একাই লেখাপড়া করে চলেছ। আমি সব জানি। কেমন করে জানলাম সে সব পরে বলব, কিন্তু রক্তিম, এই দশটার শো-টায় তুমি নেমো না। বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।"

কাউন্টারের ছেলেটা হঠাৎ কড়া চোখে পিসির দিকে ঘুরে দেখল। বোঝা যাচ্ছিল, পিসির গায়ের আধময়লা পোশাক আর উলোঝুলো চুল দেখে তার মনে কিছু সন্দেহ হয়েছে। রক্তিম তখনও বাইকে বসে অবাক চোখে মণিপিসিকে দেখছে। টিকিটওয়ালা হঠাৎ তার দিকে ঘুরে এমন একটা রামধমক ছাড়ল যে তক্ষুনি বাইকে স্টার্ট দিয়ে সোজা উলটোদিকে চলে গেল।

পিসি একটা লম্বা শ্বাস ফেলে ঝোলা থেকে সেই টর্চলাইটটা বের করে হাতে নিয়ে বলল, "চল দেখু। ভিতরে যাই। একে আটকানো গেল না দেখছি।"

লোহার পাতের সরু সিঁড়ি বেয়ে মরণকুয়োর মাথার দিক দিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম আমরা দু'জন। সেখানে, কুয়োটাকে ঘিরে থাকা একটা সরু ব্যালকনিতে ততক্ষণে লোকজনের ভিড় জমে উঠেছে। বেজায় হইচই চলছিল সেখানে।

হঠাৎ সবাই একসঙ্গে চুপ করে গেল। বাইরে মাইকের আওয়াজও থেমে গিয়েছে। অনেকটা নীচে তখন মোটরবাইক নিয়ে ছেলেদুটো ঢুকে পড়েছে। হেডলাইটের আলো জ্বেলে গোল হয়ে ঘুরছিল তারা কুয়োর নীচের মাটির উপর।

ঘুরতে-ঘুরতেই হঠাৎ গরগর করে খাঁকিয়ে উঠল গাড়িগুলোর ইঞ্জিন। সামনের চাকাগুলো বারবার লাফ দিয়ে মাটি ছেড়ে উঠছে তাদের। নীচে তাকিয়ে দেখলাম, বন্ধ হয়ে গিয়েছে মরণকুয়োর দরজা। একটা নিটোল চোঙার মতো চেহারা হয়ে গিয়েছে কুয়োটার।

ছুটতে-ছুটতে একে-একে মোটরবাইকদুটোর সামনের চাকা লাফ দিয়ে দেওয়ালের গায়ে উঠে গেল, আর তারপরই ব্যালকনিতে জড়ো হওয়া সব লোকজন একসঙ্গে হুশ করে একটা শব্দ করে উঠল। গাড়িদুটো দেওয়ালের গা বেয়ে উঠে এসেছে। গাড়িশুদ্ধ ছেলেদুটোর শরীর বাতাসে ভাসছে চিৎ হয়ে। শুধু বনবন করে ঘুরতে থাকা চাকাগুলো ছুঁয়ে আছে দেওয়ালের গা।

একের পর-এক পাক খেতে-খেতে তারা উঠে এল অনেক উঁচুতে। তারপর নীল বাইকটা ফের পাক খেতে-খেতে নেমে গেল। লাল বাইক তখনও ব্যালকনির নীচের ধার ঘেঁষে পাক খেয়েই চলেছে। একটা হাত হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে আমাদের দিকেই নাড়াচ্ছিল সেই রক্তিম নামের ছেলেটা।

হঠাৎ দেখলাম পিসি ভারী অস্থির হয়ে উঠেছে। বারবার হাতে বাঁধা মস্ত বড় ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে আর অন্য হাতে টর্চটাকে নিয়ে খুটখাট করছে। ঘড়ির কাঁটা তখন এগিয়ে যাচ্ছিল দশটা বেজে পাঁচ মিনিটের ঘরের দিকে। টর্চটার মুখে মৃদু বেগুনি আলো ঝলকাচ্ছিল। আমি পিসির আঁচল ধরে টান দিয়ে বললাম, "ও পিসি, তোমার টর্চটা জ্বলছে যে। নিভিয়ে দাও..."

পিসি তার উত্তর না দিয়ে ঝোলা থেকে দু'জোড়া ইয়ারপ্লাগ বের করে একজোড়া নিজের কানে পরে অন্যজোড়া আমার কানে পরিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে সবে জিজ্ঞেস করতে যাব কী হয়েছে, ঠিক তক্ষুনি একসঙ্গে বেশ ক'টা ঘটনা ঘটে গেল। লাল গাড়ির সামনের চাকাটা কীসে যেন ধাক্কা খেল। তারপর হাওয়ায় একটা লাফ মেরে নীচের দিকে গোঁত

খেল সটান।

সঙ্গে-সঙ্গেই পিসির ঘড়িটা থেকে একটা সরু বাঁশির মতো শব্দ বেরিয়ে এল। বেজায় জোরালো শব্দই হবে, কারণ ইয়ারপ্লাগের ভিতর দিয়েও তার হালকা আভাস পাচ্ছিলাম আমি। পিসির হাতের টর্চ থেকে ততক্ষণে বেগুনি রঙের আলোর একটা তির গিয়ে ছেলেটার গায়ে আটকে গিয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখি, বাঁশির শব্দটা হতেই ব্যালকনির সমস্ত লোক একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছে। যে-লোকগুলো ঝুঁকে পড়েছিল ব্যালকনি ধরে, তারা সেইভাবেই পাথরের মতো স্থির, ছেলেটার নীচে থেকে মোটরবাইকটা তখন মাটিতে আছড়ে পড়ে দাউদাউ করে জ্বলছে।

আস্তে-আস্তে টর্চটাকে এইবার নীচের দিকে ঘোরাল মণিপিসি। আলোয় বাঁধা ছেলেটাও ভাসতে-ভাসতে নেমে যাচ্ছিল তার সঙ্গে-সঙ্গে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে মাটির কাছে পৌঁছে যেতে তাকে কুয়োর একধারে একটা নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দিয়ে টর্চ বন্ধ করল মণিপিসি। তারপর হাতের ঘড়িটার শব্দ বন্ধ করে ইয়ারপ্লাগগুলো খুলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গেই লোকজন সব ফের নড়াচড়া করতে লেগেছে। বেজায় চেঁচামেচি করতে-করতে নীচের দিকে ছুটছে সবাই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ব্যালকনি ফাঁকা।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দেখি, গন্ডগোলের শব্দ পেয়ে টিকিটওলা ছেলেটা পালিয়ে গিয়েছে। ওদিকে গোটা মেলায় তখন দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে গিয়েছে। মাইকে চিৎকার উঠছিল, "আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন না, দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে এক্ষুনি পৌঁছে যাচ্ছে। কেউ ঘটনাস্থলের দিকে এগোবেন না..."

মণিপিসির অবশ্য তখন সেদিকে কান নেই। মরণকুয়োর নীচের দিকের দরজাটা ঠেলে খুলতে-খুলতে বলল, "ছেলেটা ভিতরে একলা পড়ে আছে যে! তুই এখানে দাঁড়া বাবুয়া, আমি ওকে নিয়ে আসি।"

দরজা খুলতেই সেখান দিয়ে গরম হাওয়ার একটা হলকা ছুটে এল বাইরে। কুয়োর ভিতরে কমলা রঙের দপদপে আগুনের আলো। মণিপিসি তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে দিব্যি ভিতরে ঢুকে গিয়ে ছেলেটার হাত ধরে টানতে-টানতে বের হয়ে এল। সে তো তখন এমন ঘাবড়ে গিয়েছে যে দেখে আমার হাসিই পেয়ে যাচ্ছিল। খালি গোল-গোল চোখ করে পিসিকে ঘুরে-ঘুরে দেখে আর বিড়বিড় করে কী সব বলে।

পিসি ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "চল আমার সঙ্গে। এবার থেকে এসব জীবন-

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দেখি, গন্ডগোলের শব্দ পেয়ে টিকিটওলা ছেলেটা পালিয়ে গিয়েছে। ওদিকে গোটা মেলায় তখন দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে গিয়েছে।

মরণের খেলা একেবারে বন্ধ। অনেক লেখাপড়া করতে হবে তোকে। এখন থেকে তোর দায়িত্ব আমার।"

*****

রক্তিমদাদা কলেজে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়িতেই থাকে এখন। পিসির তেতলার ফ্ল্যাটের একটা ঘরে। পিসি তাকে রোজ পড়ায়। ভারী খটোমটো সে-সব জিনিস। আবার ভালমন্দ রেঁধেবেড়ে খাওয়ায়ও। দুমাসেই পারছ আমার তাতে বেজায় রাগ হয়। একদিন রক্তিমদাদা কলেজে গিয়েছে, তখন আমায় পিসি আদর করতে এসেছিল, আমি বেজায় রাগ করে কেঁদেকেটে একশা করে বললাম, "তুমি তো এখন শুধু রক্তিমদাদাকেই ভালবাস। তাকেই আদর করোগে যাও।"

পিসি মুচকি হেসে বলল, "সে কি আর এমনি-এমনি করি? ওর হাতেই তো আমাদের ভবিষ্যৎ।"

বললাম, "সে আবার কী?"

পিসি আমার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "কাউকে বলিস না যেন। আমাদের যন্ত্রগুলোকে সত্যি-সত্যি ফিউচারও দেখা যায়। সেই যন্ত্রই তো বলল, রক্তিম খুব বড় বিজ্ঞানী হবে একদিন। তারপর ও তারা যাওয়ার মহাকাশযান বানানোর কায়দাটা আবিষ্কার করবে। ও যদি সেদিন মরে যেত তা হলে যে আমাদের আর কোনওদিন তারার দেশে যাওয়া হত না রে বোকা! ফিউচার ভিউয়ারে দুর্ঘটনাটা দেখেই তো আমার দলের লোকেরা আমায় ডেকে বলল ওকে বাঁচাতে। তাই তো ওকে বাঁচিয়ে এনে নিজের কাছে রাখতে হল। লেখাপড়াও করাতে হচ্ছে ভাল করে।"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, "মিথ্যে কথা। তুমি তো নিজেই বললে মিল্কিওয়েতে গিয়েছিলে সেদিন। তারার যান না থাকলে গেলে কেমন করে?"

অমনি পিসি হেসেই খুন। বলে, "বোকা কোথাকার! আমি তো আমেরিকার মিলওকিতে গিয়েছিলাম একটা সায়েন্স কনফারেন্সে। তুই সেইটে শুনে মিল্কিওয়ে ধরে নিলি? এখনও সে যান বানানোর অনেক দেরি। তোর রক্তিমদাদা বড় হবে, অনেক গবেষণা করবে, তারপর যখন বুড়ো হবে, তখন একদিন রাতে হঠাৎ করে তার মাথায় আসবে তারায়-তারায় ঝাঁপ খাওয়ার কায়দাটার কথা। তারপর..."

*****

সেই থেকে আমি অপেক্ষা করে আছি। কাউকে কিছু বলি না। পিসির বারণ আছে। তবে ডায়েরিতে লিখতে তো আর মানা নেই, তাই লিখলাম। রক্তিমদাদাকেও বেশ তোয়াজ করে রাখছি এখন থেকেই। ইন্টারনেটে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় তারাটিকে দেখে রেখেছি। ক্যানিস মেজরিস। ঠিক করে রেখেছি, যান বানানো হয়ে গেলে সেইখানটাতেই যাব প্রথম ট্রিপে। উঃ! সে যা মজা হবে না!

ছবি: শুভম দে সরকার

মহাকাশের দূত

কাহিনি: সত্যজিৎ রায় — ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
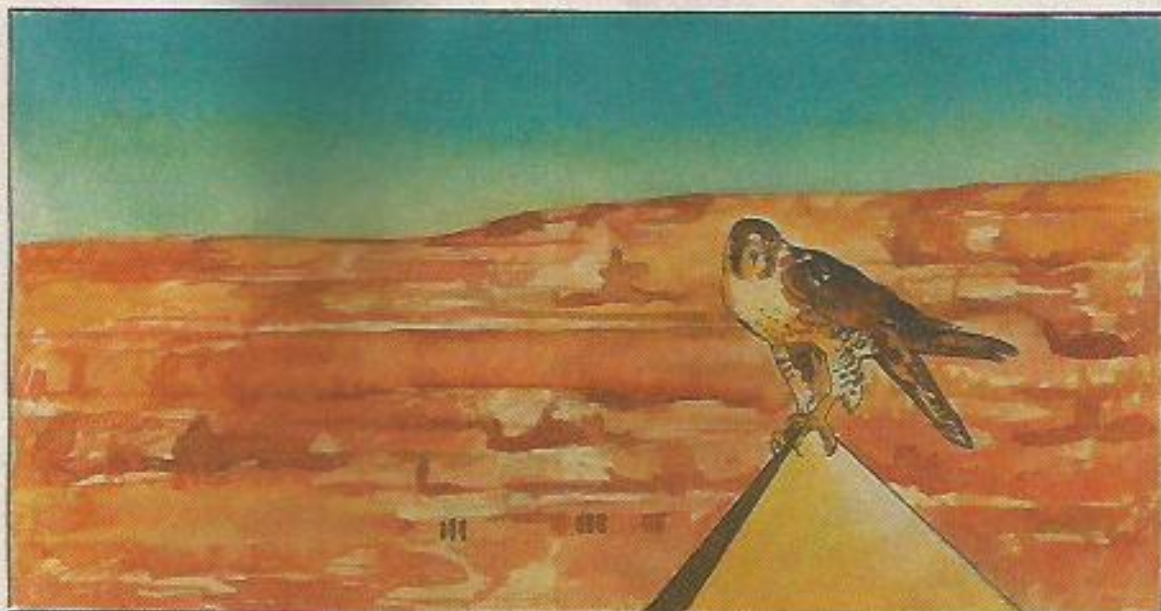
...আমরা যেমন প্রতি পাঁচ হাজার বছরে একবার করে পৃথিবীতে এসেছি, তেমনই পাঁচ হাজার বছর পর আবার আসব...গুড বাই, মেনেক্ক্।

কেঁ কেঁ এঁ।

কেঁ কেঁ এঁ
লেখকের নাম
পড়তে পারছি...
নেনেক্কু।

ইটস ভেরি আরলি হায়রোগ্লিফিক্স...পড়া খুব কঠিন...তবে বুঝতে পারছি বিজ্ঞান সংক্রান্ত।

...আমার লাক! হাজার-হাজার ডলার খরচ করে আলাদার লুটেড টুম্ব। যদি একটা কিছু পাওয়া যেত যা আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি...মানটা থাকত।

মর্গেনস্টার্ন এটা দখল নেওয়ার আগে ফোটো তুলে রাখি। দিস প্যাপাইরাস ইজ অল টু রেয়ার।

মর্গেনস্টার্ন!

হ্যা ডেক্সটার... ওটা কী পেলে?

যেটা তুমি চাইছিলে...এই মাস্তাবা খোঁড়া শুরু থেকে...দিস উইল মেক ইট ফেমাস।

নো কিডিং...ইউ আর
সিরিয়াস...অ্যাটলাস্ট
সামথিং কর মি!

আমি কিছুটা বুঝতে
পারছি...এটা বিজ্ঞান
সংক্রান্ত, যা একেবারেই
নতুন। একটা এলিয়েনের
উল্লেখ বুঝতে পাচ্ছি...

এলিয়েন!

এলিয়েন বলতে কী বোঝাচ্ছে সেটা বলতে পারব না। এই
ব্যাপারে ডাঃ থর্নিক্রফট সাহায্য করতে পারবে।

দিস হায়রোগ্লিফিক্স
ইজ বিগ...তোমায়
ফেমাস করে দেবে।

আমি এই প্যাপাইরাস পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চলে যাই ডাঃ
এডওয়ার্ড থর্নিক্রফটের কাছে। বিখ্যাত মিশর বিশেষজ্ঞ যা
মানে বের করেছেন তা সত্যিই চমকপ্রদ। পাঁচ হাজার বছর
আগের এই প্যাপাইরাসে এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।
এর সবই বিজ্ঞান সংক্রান্ত।

হয়তো যাঁর সমাধি তিনিই করেছেন এই ভবিষ্যদ্বাণী। এতে বলা হয়েছে টেলিভিশন আবিষ্কারের কথা, যান্ত্রিক মানুষের কথা, কম্পিউটারের বর্ণনা আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য যা বলা হয়েছে সেটা হল সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহে প্রাণী নেই।

সৌরজগতের বাইরে মহাকাশে আরও অসংখ্য সৌরজগতে নানান গ্রহে নানারকম প্রাণী আছে। কিন্তু মানুষের মতো প্রাণী আছে কেবল আর একটি মাত্র গ্রহে। এরা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। শুধু তাই নয় বহুকাল থেকে পাঁচ হাজারে একবার করে এরা পৃথিবীতে এসেছে...

এবং পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। প্যাপাইরাসের লেখক এমন একটি গ্রহান্তরের মানুষের সামনে পড়েছিল এবং তার ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতার জন্য ওই ভিনগ্রহের মানুষই দায়ী। প্যাপাইরাসের তলার খানিকটা অংশ নেই। হয়তো সেখানে লেখকের নাম ছিল। সন-তারিখ বোঝা যায় লেখকের সঙ্গে ভিনগ্রহের প্রাণীর সাক্ষাৎ হয়েছিল পাঁচ হাজার বছর আগে।

ঠিক কবে এবং কোথায় আবার এই প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে, সে খবরটা মনে হয় পুঁথির লুপ্ত অংশে ছিল।
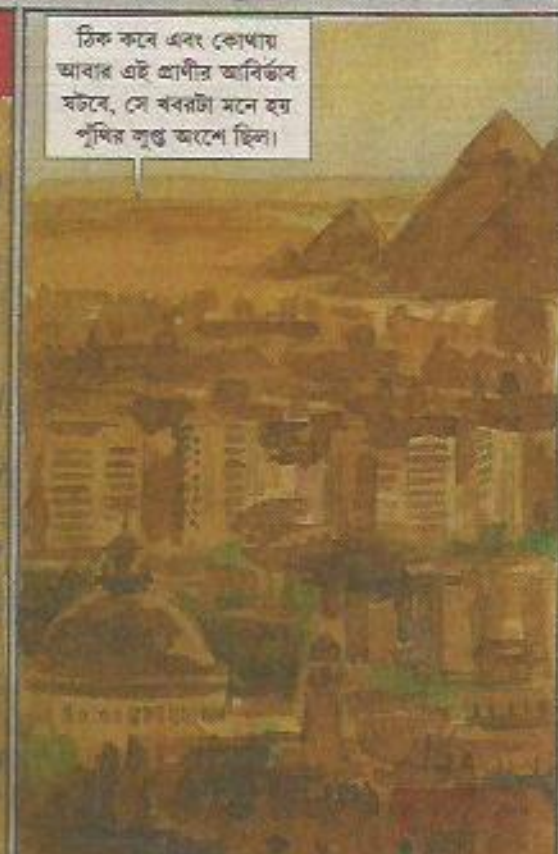
আমি যে এপসাইলন ইন্ডি নক্ষত্রপুঞ্জের কোনও এক অংশ থেকে বেকারে সংকেত পেয়েছি... আমার কেন যেন মনে হচ্ছে...

এই প্যাপাইরাসে সেই গ্রহের কথাই বলা হয়েছে?

যেভাবে ঘন-ঘন সংকেত আসছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে পৃথিবীর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পেরে এই নাম না-জানা গ্রহের প্রাণী উল্লসিত হয়ে উঠেছে। অনেক দিনের পুরানো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যেমন হয়।

তুমি তো প্রথম বেতার তরঙ্গ পাঠাও বারো বছর আগে।

ঠিক। তোমাকে তো তখনই বলেছিলাম।

হিসেবমতো ওই নক্ষত্রমণ্ডলে তা পৌঁছতে লাগা উচিত দশ বছর। কিন্তু তা উপর দু'বছরের মধ্যে চলে এল।

আরে, দ্রুতগতিতে সংকেত পাঠানোর উপায় আবিষ্কার করেছে। এরা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত তাতে সন্দেহ নেই।

এও তো হতে পারে, তারা পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে এসেছে...সেই যান থেকেই তোমার সংকেত এসেছে।

হাউ রাইট ইউ আর! গত দু'দিন তোমাকে বলতে পারিনি। আসলে বিশ্বাস করতে পারছি না এখনও যে, এটা ঘটতে চলেছে।

কায়রোতে আসার আগের দিন আমি সংকেত পাই, তাতে বলছে আগামী অমাবস্যায় তাদের দূত পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে।
ওয়ান্ডারফুল!
হোল্ড ইওর ব্রেথ শঙ্কু। তারা যেখানে নামবে সে জায়গাটা
এখান থেকে আন্দাজ দু'শো কিলোমিটার পশ্চিমে।
দারুণ
হাই ক্রোল!
হাই ডেক্সটার! লাক্সর থেকে কবে ফিরলে?
আজই ফিরেছি। হ্যালো শঙ্কু, কিছিং?
হ্যালো ডেক্সটার!
হ্যালো!
শুনলাম তুমিও ছিলে মর্গেনস্টার্নের সঙ্গে, যখন প্যাপাইরাসটা পাওয়া যায়।
একটা কথা বলি...ওটা আমিই প্রথম পাই।

সেকী? মর্গেনস্টার্ন তো একবারও তোমার কথা উল্লেখ করল না।

ন্যাহ...

হাজার-হাজার ডলার খরচ করে শখের খননকার্য চালিয়েছে, অন্যদের ক্রেডিট দেবে বলে?

আই ওয়ান্ট টু শো ইউ সামথিং।

দেখো তো জিনিসটা তোমাদের চেনা কিনা?

প্যাপাইরাসটার ছবি।

...সম্পূর্ণ প্যাপাইরাসটার ছবি, তলার অংশটুকুও বাদ নেই।
ঠিক। আমি ওকে বলেছিলাম সাবধানে হ্যান্ডল করতে...ও এসব জিনিসের মূল্য ঠিক বোঝে না।
ওয়েল শব্ধ...

এই অংশেতে দৈবজ্ঞের নাম রয়েছে মেনেস্থ। আর অন্য গ্রহ থেকে যারা আসবে, তারা কবে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে তাও দেওয়া রয়েছে।

রাইট

কবে মানে?

এই অমাবস্যা!

তুমি কি এই ছবি আর অন্য কারুকে দেখিয়েছ?

না। আমি লাক্সর অঞ্চলে গিয়েছিলাম। তোমরা আসছ জানতাম। ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

আচ্ছা এক-আধ বছরও কি এদিক-ওদিক হতে পারে না?

এই লেখা পাঁচ হাজার বছর আগে লেখা...

আর সেই লেখায় মর্ডান আবিষ্কারের সব উল্লেখ রয়েছে। ৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে মিশরের ইতিহাস নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সেই হিসেবে কিছু বছর এদিক-ওদিক হওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়।

ঠিক।

আমার ধারণা, এতে কোনও ভুল নেই। কারণ এখানে আসার আগের দিনই এপসাইলন ইন্ডি থেকে সংকেত পেয়েছি।

এপসাইলন ইন্ডি... তুমি যাদের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলে?

ইয়েস।

সংকেত বলছে আগামী অমাবস্যায় তাদের দূত পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে। তারা যেখানে নামবে সে জায়গাটা এখান থেকে আন্দাজ দুশো কিলোমিটার পশ্চিমে।

তার মানে মরুভূমিতে?
সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?
কী ভাষায় সংকেত পেলে?
মর্স
তার মানে পৃথিবীর সঙ্গে তারা যোগ রেখে চলেছে এই গত পাঁচ হাজার বছর!
তা হলে তো তারা আমাদের ভাষাও জানতে পারে?
কিছুই আশ্চর্যের নয়।
তা হলে আমাদের গন্তব্যস্থল হল কোথায়?
দুশো তিরিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। বাওতি ওয়েসিস-এর কাছে।
আমার অটোমোটেল ইজ় জাস্ট পারফেক্ট ফর সাচ এক্সপিডিশন!
ডঃ থর্নিক্রফ্ট আসছেন পরশু সকালে। আমাদের সঙ্গে যাবেন আগেই বলা আছে।

গুড ইভনিং জেন্টলমেন।

গুড ইভনিং।

গুড ইভনিং।

তোমাদের মতামত জানার একটা আগ্রহ আমার স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। এই প্যাপাইরাসের ব্যাপারে তোমাদের কী মত?

রিমার্কেবেল! আমরা তাই আলোচনা করছিলাম।

পাঁচ হাজার বছর আগের লেখায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা রয়েছে...ভাবা যায় না।

বাট ইট্‌স মোস্ট আনফরচুনেট, যে অংশে এই প্রাণীর আবার কবে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটবে লেখা ছিল, সেটা খোয়া গিয়েছে।
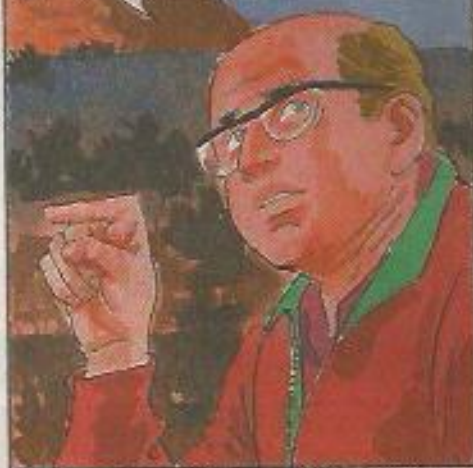
মোস্ট আনফরচুনেট...মোস্ট আন ফরচুনেট। এই তো ডেক্সটারও ছিল প্যাপাইরাসের অবস্থা এমনিতেই খুব জীর্ণ।

যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে...সেটাই তো বড় কথা। অন্য গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে মিট করা...এসব আমি খুব গুরুত্ব দিই না।

সে তো নিশ্চয়ই।
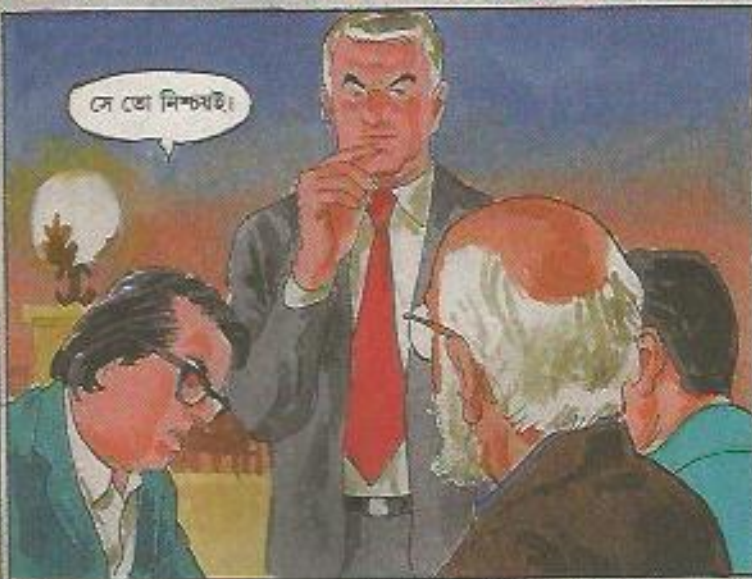
তবে তোমাদের যদি এই প্যাপাইরাস স্টাডি করার ইচ্ছে থাকে, ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।

তোমাদের একটা কথা বলি। আমি শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ...তোমরা সকলেই মেন অফ সায়েন্স...কীভাবে নেবে জানি না। প্রাচীন মিশরের সমাধি খোঁড়ার শোচনীয় পরিণামের কথা তোমাদের নিশ্চয়ই জানা।

তুমি কি কোনও অভিশাপের কথা বলছ?

অভিশাপ কিনা বলতে পারব না। রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে... ঘুম ভাঙলেই দেখতে পাচ্ছি একটা শকুনি জানলায় বসে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে।

তুমি জানলাটা বন্ধ রাখতে পার।

আমার হাঁপানি আছে। বন্ধ ঘরে শুতে পারি না।

এই ক'দিনে তোমার উপর খুব জোর গিয়েছে... তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।

আই গেস সো। গুড নাইট জেন্টলমেন।

...ইউ হার্ড মি...শকুনি যখন বলছি শকুনি!

...ইন আওয়ার হোটেল স্যার?

ইয়েস ইন ইওর হোটেল!

বাট স্যার...

হোয়াই? ডোন্ট ইউ টেক ইট সিরিয়াসলি... মিঃ নাপুম @ ¥ ৯ ৳ ঌ

আমি কি মিথ্যে বলছি? @ ¥ ৯ ৳ ঌ

এই যে ক্রেন...সেই জানলায় শকুনি...

ঘরে গিয়ে একবার দেখি...

নাথিং... তুমি জানালা বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করো।

শুভ মর্নিং শঙ্কু। মর্নিংওয়াক হল?
মর্নিং... নাইলের ধারে একটু হেঁটে এলাম।
মর্গেনস্টার্নস গন!
গন?
রুমবয় কফি নিয়ে দরজা খুলে দেখে ঘর খালি। রাত্রে ওর চেঁচানোতে ঘুম ভেঙে দেখি ম্যানেজার নাথুমের উপর চেঁচাচ্ছে...সেই শকুনি দেখা।
জিনিসপত্র?
সবই রয়েছে। একটা খোলা চিঠি। একটা লাইন- 'নেখবেৎ আমার বাঁচতে দিল না'।
নেখবেৎ দেবী? বাঁচতে দিল না মানে?
মৃত্যু...আত্মহত্যা।
... দু'-একদিন আগে পরে হতে পারে। আগে গিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। নাহুম ঠিকঠাক করতে পারলে জেন্টটাকে সামলাতে হিমশিম খাবে।

স..স..স..স..স...
আঁ....আঁ

দুম
দুম
দুম
কী ব্যাপার ডেক্সটার?
আ স্নেক ইন মাই রুম!
ডেক্সটারকে তো সিরিয়াস বলেই জানি।

কোবরা! এই
হোটেলে?

চিয়ার আপ ডেক্সটার...থিঙ্ক... আগামিকাল হয়তো আমরা এখন ইউনিভার্সের আর-এক প্রান্ত থেকে আসা এলিয়েনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।
ছ'টায় আসছে থর্নিক্রফ্ট। লাঞ্চ সেরেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।
CAIRO INTERNATIONAL AIRPORT
TERMINAL 1

এখন কেমন লাগছে?

মাচ বেটার... মাথা ফাটেনি।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই মাথায় বাড়ি। দু'জন সুইস পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে। ওয়ালেটটি লোপ পেয়েছে। নাকিশি ক্রেডিট কার্ড সব ব্যাগেই ছিল।

তুমি কী আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে...

ওয়ালেট!

ওয়ালেট?

মর্গেনস্টার্নের ওয়ালেট আর কেটি পাওয়া গিয়েছে এগারো কিলোমিটার দূরে নাইলের ধারে। পুলিশ তো ধরেই নিয়েছে ও আত্মহত্যা করেছে।

আলবাত পারব। এবার থেকে আমার পকেটে বন্দুক থাকবে।

কোবরাকে হয়নি...স্পিটিং কোবরা সিটের নীচেই আছে...একটু পরেই টের পাবে।

তোমরা ভেবে দেখেছ কি যে, এই পাঁচ হাজার বছরের হিসেবে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে কয়েকটা আশ্চর্য তথ্য বেরিয়ে পড়ে?

ইজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু পাঁচ হাজার বছর আগে...প্রথম কৃষিকার্য শুরু করেছে মানুষ, নিজের চেষ্টায় ফসল উৎপাদন করছে।

আরও পাঁচ হাজার বছর পিছিয়ে গেলে দেখছি, মানুষ প্রথম হাড় ও হাতির দাঁতের হাতিয়ার, বর্শার ফলক, মাছের বঁড়শি ইত্যাদি তৈরি করছে। আবার সেই সঙ্গে গুহার দেওয়ালে ছবি আঁকছে।
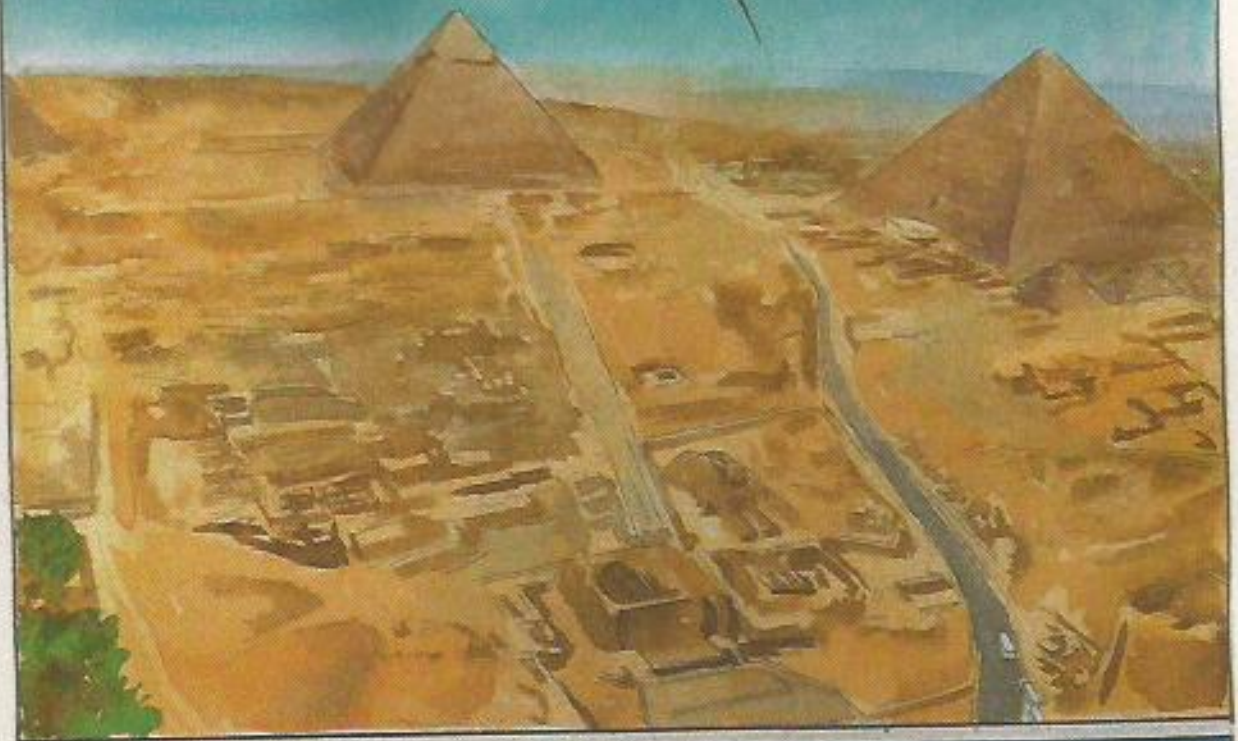
চল্লিশ হাজার বছর আগে মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতি বদলে গিয়ে আজকের মানুষের মতো হচ্ছে।
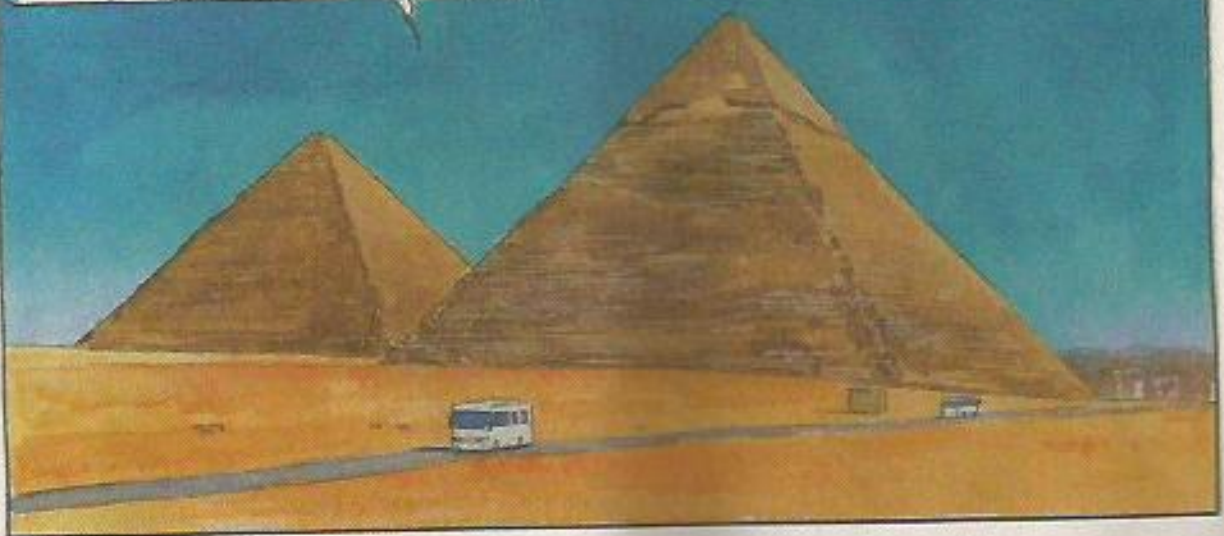
ভেক্টর, তোমার কী মনে হয় মর্গেনস্টার্ন এত বড় বেহিসেবি ছিল। প্যাপাইরাসের অংশ এইভাবে খোয়াতে পারে?

ও যখন আমার কাছে নিয়ে আসে তখনই খোয়া গিয়েছে।

ও এসবের ঠিক মূল্য বোঝে না।

আমার মনে হয়...

অভিশাপটভিশাপ নয়, কেউ আমাদের পিছনে লেগেছে! মর্গেনস্টার্ন!

তা হলে তো...

অ্যালাইক অ্যান্ড কিকিং...আমার বিশ্বাস এই অঞ্চলেই রয়েছে, নেখবেতের চাদা।

...যা বলছিলাম...অন্য কাউকে নিয়ে শেষের অংশ পড়িয়েছে...এলিয়েনরা কোথায় আসবে ও জানে।

ডেক্সটার হায়রোগ্লিফিক বোঝে...আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব...

আমরাও এলিয়েনকে মিট করতে চাইব খুব স্বাভাবিক...তাই রাইভাল হটাও।

অত সহজে আমাদের সঙ্গে পারবে না।

নেখবেৎ নয়...ওকে বাঁচতে দেবে না ওর লোক।

এসটপ-এসটপ, সাহিব এসটপ,

পিরামিট, সাহিব পিরামিট।

বয় ইজ ভেরি এক্সাইটেড।

বেরিয়ে দেখা যাক।

পিরামিট!

পিরামিট!

ওগুলো তো পাহাড়!
পিরামিট?
ওগুলোর পিছনে?
হিয়ার!
পিরামিট... পিরামিট... পিরামিট
এখানে পিরামিড থাকার কথা নয়। মনে হচ্ছে একবার দেখে আসা দরকার...যেখানে এলিয়েনদের নামার কথা সেই অঞ্চলেই এসে গিয়েছি।
দেখা যাক।

ইট্স পিরামিড অলরাইট।
অবিশ্বাস্য!
এ অঞ্চলে কোনও পিরামিড নেই আই অ্যাম শিওর।
?
একবার কাছ থেকে দেখতেই হবে।

এর উচ্চতা তিরিশ ফুটের বেশি নয়।
পাথরের তৈরি নয়, ধাতুর তৈরি।
ধাতুর তৈরি পিরামিড!

এখানেই থামছি।
লেটস গো আউট।
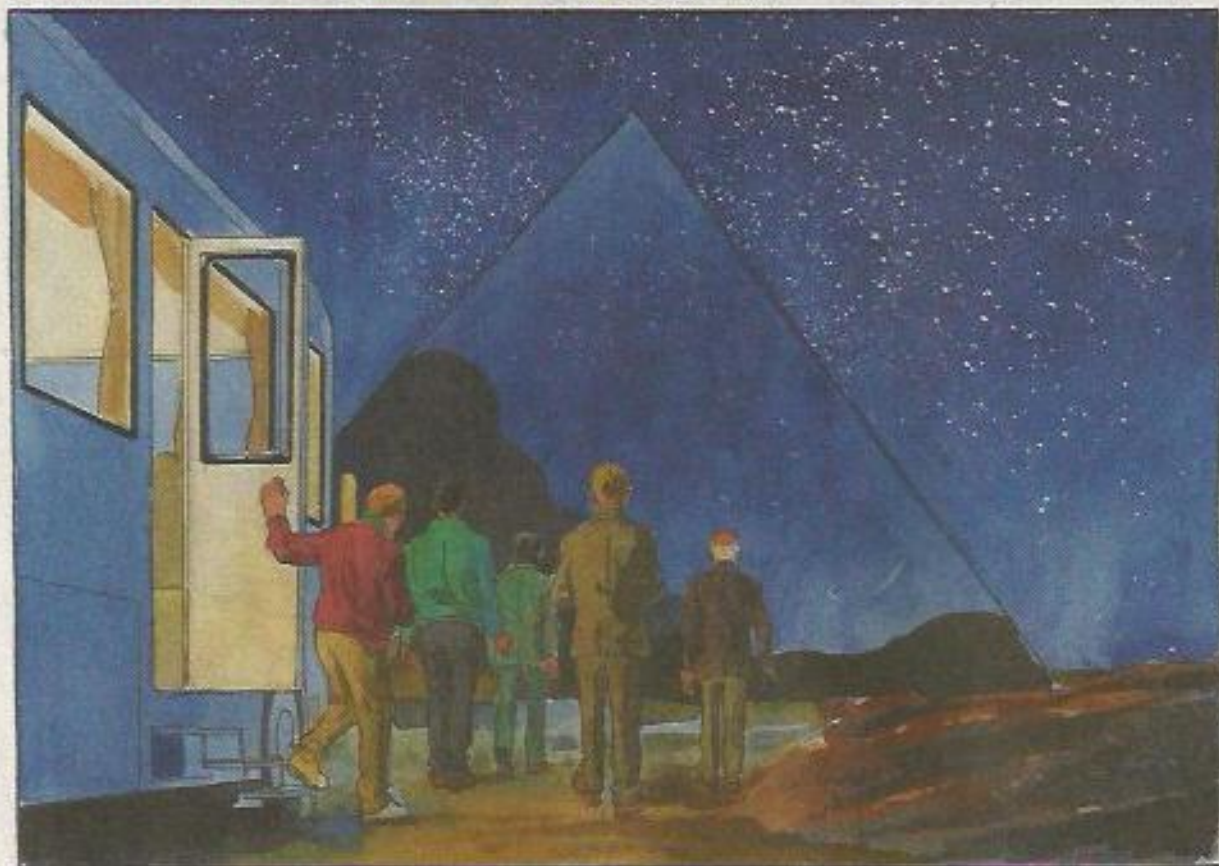
কিপ ইয়োর হ্যান্ড অন ইয়োর গান।
দিস মে বি আওয়ার স্পেসশিপ।
আমারও সেই কথাই মনে হয়েছে।
?
একটা উত্তাপ অনুভব করছি।
উত্তাপের কারণ কি এরা আমাদের কাছে আসতে দিতে চায় না?
না। উত্তাপ কমে আসছে দ্রুত বেগে।

ওয়ান...থ্রি...সেভেন...ইলেভেন...সেভেনটিন...টোয়েন্টি থ্রি...
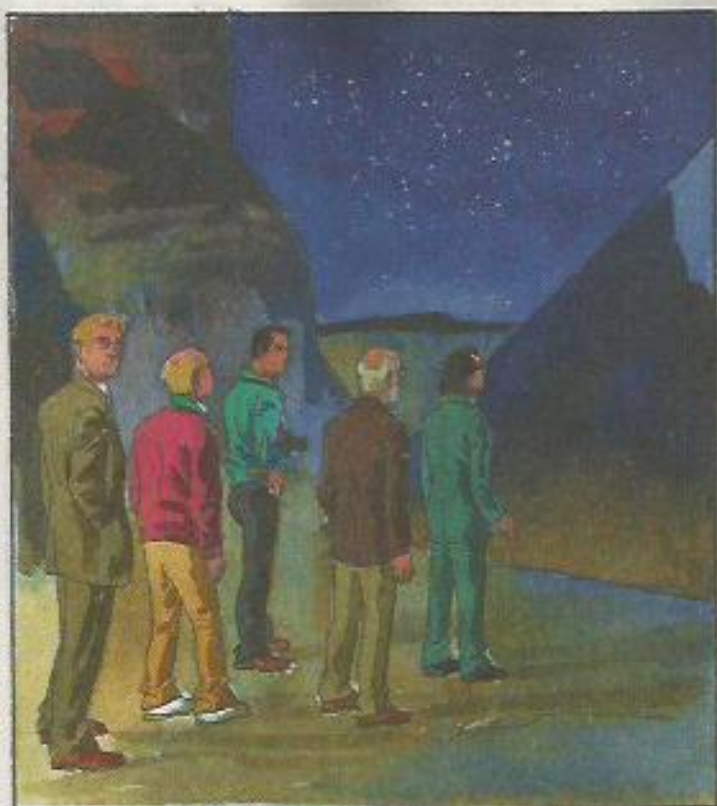
ফর্টিওয়ান...ফর্টিসেভেন...ফিফটি থ্রি...ফিফটি নাইন...
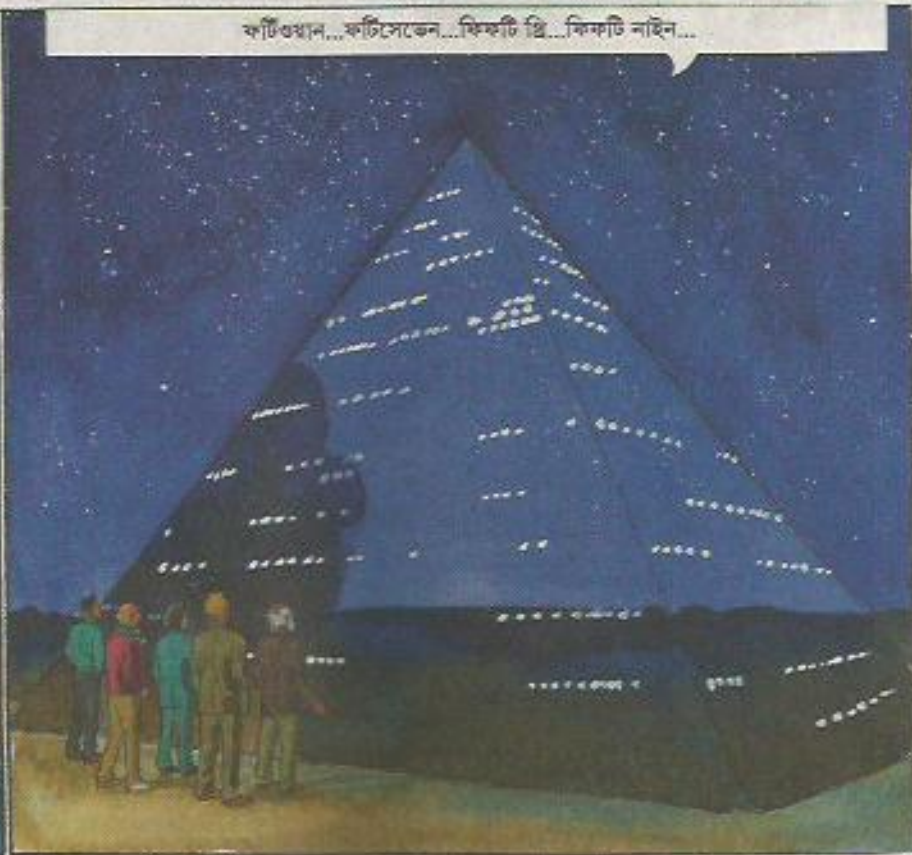
পাঁচ হাজার বছর পরে আবার আমরা তোমাদের গ্রহে এসেছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।

তোমরাও আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।

নিখুঁত ইংরেজি...নিখাদ উচ্চারণ...নিটোল কণ্ঠস্বর...

তোমাদের গ্রহের অস্তিত্ব জেনেছি পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে। আমরা তখনই জানতে পারি যে, তোমাদের গ্রহ ও আমাদের গ্রহের মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক প্রভেদ নেই। সেই থেকে প্রতি পাঁচ হাজার বছর আমরা এসেছি।

প্রত্যেকবারই এসেছি একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা হল পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে কিছু দূর এগিয়ে নিতে সাহায্য করা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে একটি পর্যবেক্ষণকক্ষতে এই পঁয়ষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছি আমরা। আমরা যখনই এখানে আসি পৃথিবীর অবস্থা জেনেই আসি। আমরা অনিষ্ট করতে আসি না।

আমাদের কোনও স্বার্থ নেই।
সাম্রাজ্যবিস্তার আমাদের উদ্দেশ্য
নয়। আমরা কেবল মানুষের সমস্যার
সমাধানের উপায় বাতলে দিয়ে
আবার ফিরে যাই।
আজকের মানুষ বলতে যা বোঝো,
সেই মানুষ আমাদেরই সৃষ্টি।
মানুষকে কৃষিকার্য আমরাই শেখাই।
যাযাবর মানুষকে ঘর বাঁধতে শেখাই।

গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা,
চিকিৎসাবিজ্ঞান, পৃথিবীতে এসবের
গোড়াপত্তন আমরাই করেছি।
স্থাপত্যের অনেক সূত্র আমরাই
দিয়েছি। এই শিক্ষা মানুষ কীভাবে
কাজে লাগিয়েছে তার উপর
আমাদের কোনও হাত নেই।

অগ্রগতির কিছু সূত্র নির্দেশ করার
বেশি কিছু করা, আমরা আমাদের
কর্তব্য বলে মনে করিনি। মানুষকে
আমরা যুদ্ধ শেখাইনি, স্বার্থের
জন্য সাম্রাজ্যবিস্তার শেখাইনি।

শ্রেণিভেদ শেখাইনি, কুসংস্কার
শেখাইনি। এসবই তোমাদের
মানুষের সৃষ্টি। আজ যে মানুষ
ধ্বংসের পথে চলেছে, তার
কারণই হল মানুষ নিঃস্বার্থ
হতে শেখেনি।

তোমাদের যা দিতে এসেছি তার আগে তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে করতে পার।

তোমাদের গ্রহের আবহাওয়া যদি এখানকার মতোই হয় তা হলে, তোমাদের একজনের বাইরে বেরিয়ে আসতে কোনও বাধা নেই নিশ্চয়ই।

সেটা সম্ভব নয়।

কেন?

কারণ এই মহাকাশযানে কোনও প্রাণী নেই।

প্রাণী নেই? তার মানে কী?

কারণ বলছি। একই বছরের মধ্যে একটি প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও একটি বিশাল উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমাদের গ্রহ থেকে প্রাণী লোপ পায়।

দুর্যোগের দশ বছর আগে পূর্বাভাস পেয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা পূর্বকল্পিত পৃথিবী-অভিযানের সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। এই অভিযান সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের নির্দেশে। এই আমাদের শেষ অভিযান।
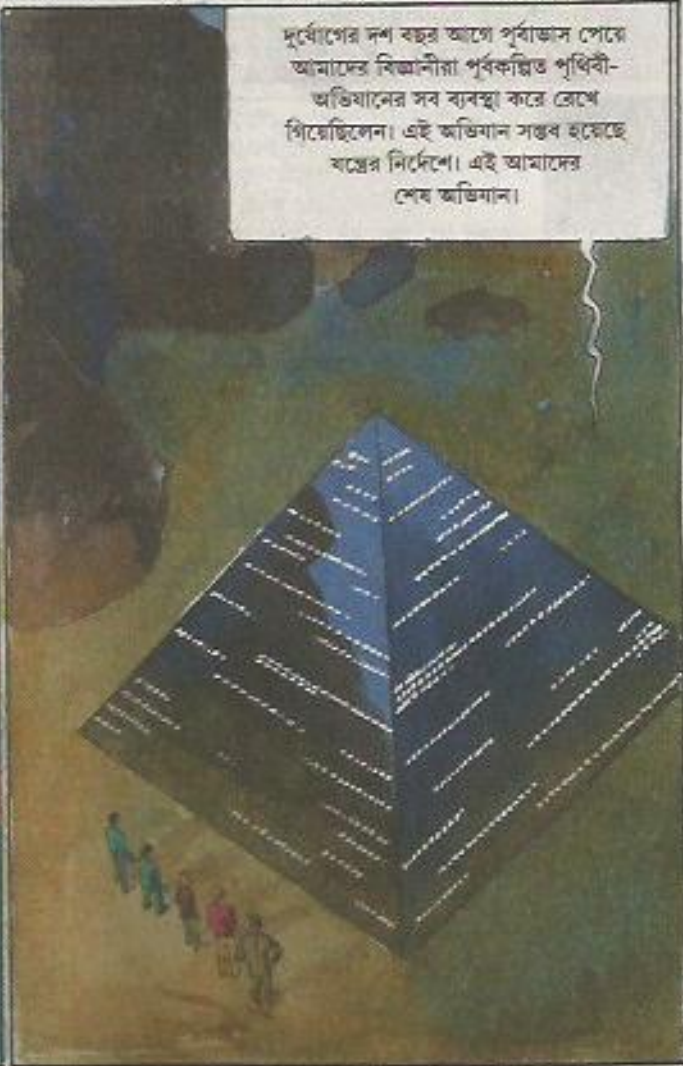
তোমরা অন্য কোনও হ্যাবিটেবল গ্রহে চলে গেলে না কেন? সাম্রাজ্যবিস্তার তোমাদের উদ্দেশ্য নয় এই কারণে?

বলতে পার।

তোমাদের এই শেষ অভিযানের উদ্দেশ্য কী, জানতে পারি?

বলছি শোনো, তোমাদের চারটি সমস্যার সমাধান দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এক, ইচ্ছামতো আবহাওয়া বদলানো যাতে খরা বা বন্যা কোনওটাই মানুষের ক্ষতি না করতে পারে। দুই, শহরের দূষিত বায়ুকে শুদ্ধ করার উপায়।

তিন, বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে সূর্যের রশ্মিকে যৎসামান্য ব্যয়ে মানুষের ব্যাপক কাজে লাগানোর উপায় এবং চার, সমুদ্রগর্ভে মানুষের বসবাস ও খাদ্যোৎপাদনের উপায়। এই চারটি সূত্র ছাড়াও, শুধু মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের বিবরণ আমরা দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।

সূত্র এবং বিবরণ কি লিখিতভাবে রয়েছে?

হ্যাঁ। তবে লেখার ব্যাপারে মিনিয়েচারাইজেশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

লক্ষ করো, একটি দরজা খুলছে। ভিতরে একটি টেবিলের উপর একটি আচ্ছাদনের নীচে যে বস্তুটি রয়েছে তাতেই পাওয়া যাবে চারটি সমস্যার সমাধান ও পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি বছরের ইতিহাস। তোমাদের একজন বস্তুটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র মহাকাশযান ফিরতি পথে রওনা দেবে।

তবে মনে রেখো, এটি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য।

এই বস্তুটি যদি...

তা হলে...

কোনও স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে।

হান্স টেকিং অফ!

হার্মলেশ এমিশন...ওয়াণ্ডারফুল!

বাসে ওঠো।
কোথায় গেল?
হেডলাইট না জ্বালিয়েই চালাচ্ছে।

ওই যে রাস্তা।
আঁ আঁ!
ওই তো।

মৃত।
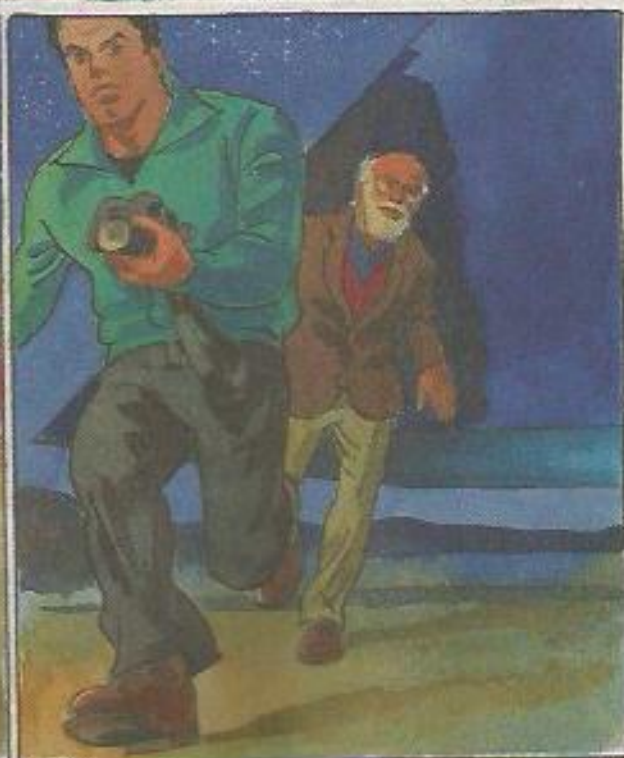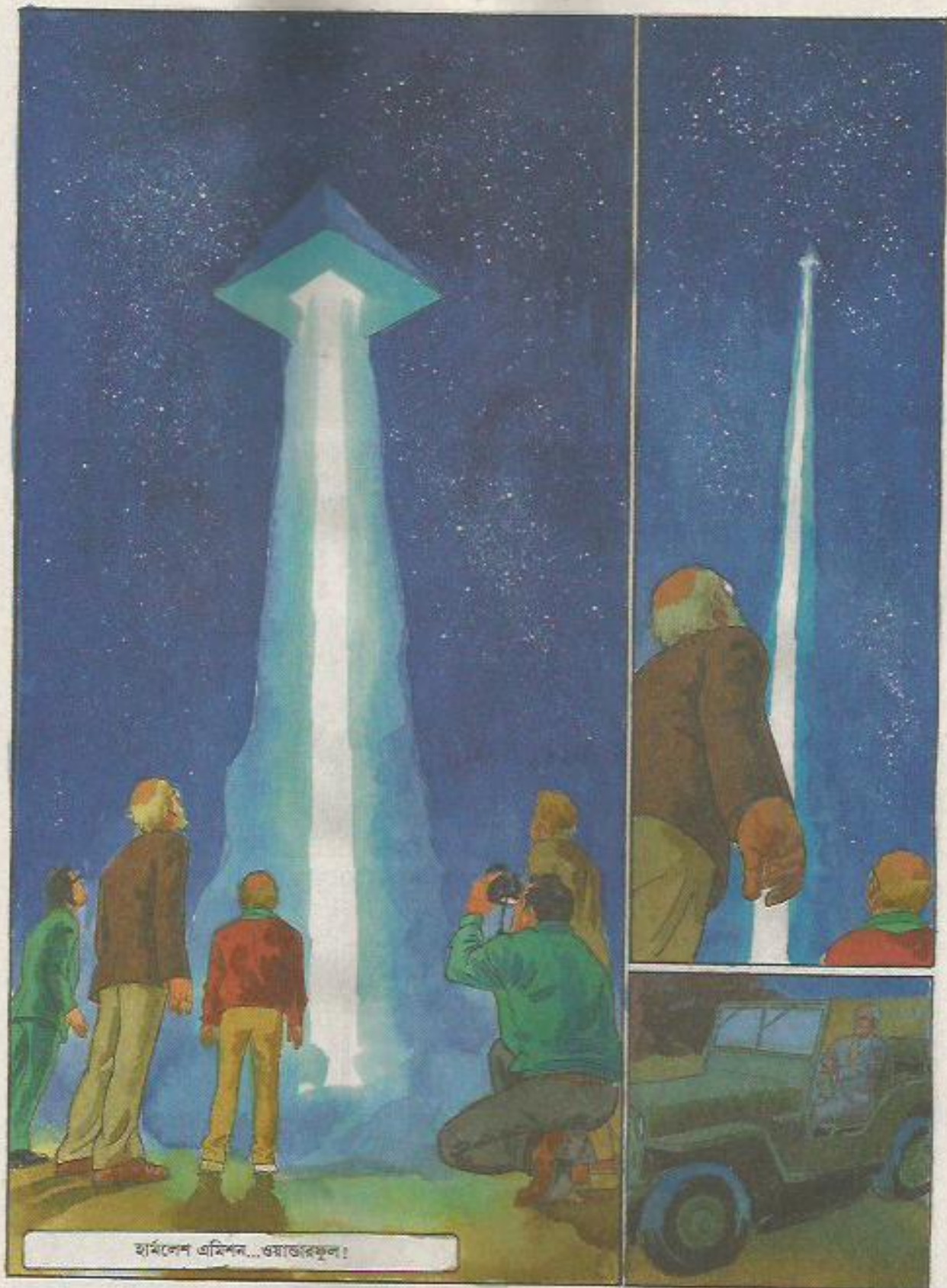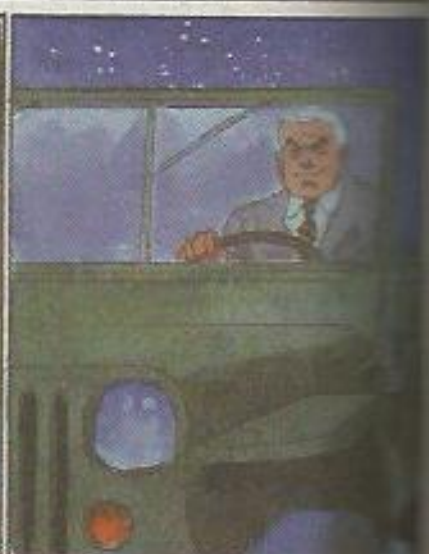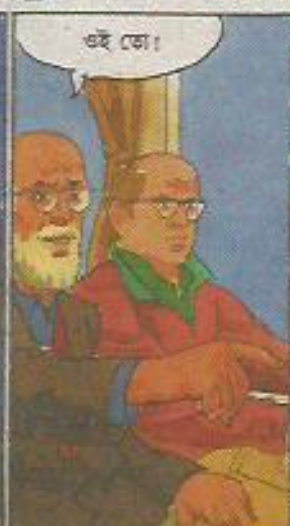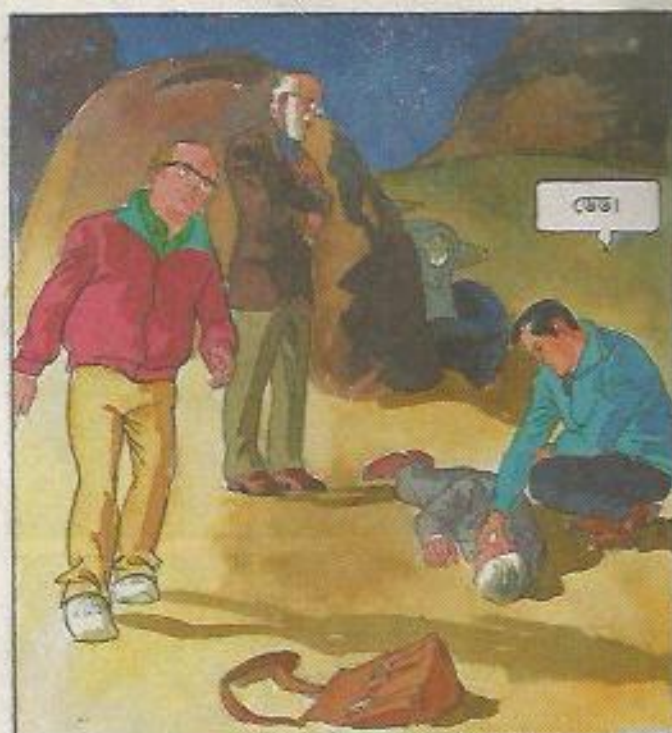
এই কি সেই বস্তু যার মধ্যে ধরা রয়েছে মানবজাতির চারটি প্রধান সংকটের সমাধান?

আর পৃথিবীর পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস।

সেনেফ্রুর লেখার ছেঁড়া অংশ...

আমরাই ঠিক...ও জানত এর মানে কি...

এই আশ্চর্য পাথরের টুকরোর মধ্যে কী করে এত তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে?

সেটা যদি কেউ বের করতে পারে তা তুমিই পারবে শঙ্কু।

আমারও তাই বিশ্বাস।

আমারও।

হু কুড বি বেটার পার্সন দ্যান ইউ প্রোফেসর।

গত দু'সপ্তাহ ধরে অজস্র
পরীক্ষা করেও এটার রহস্য
উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি।

পারবে কি মানুষের
মনের অন্ধকার
দূর করতে?

হয়তো পারবে।

সমাপ্ত

অনেকের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। অনেকের ভাল লাগে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখতে। তোমাদের যা ইচ্ছে তা লিখে এবং এঁকে পাঠাও। ভাল হলে এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।

আমার ছবি
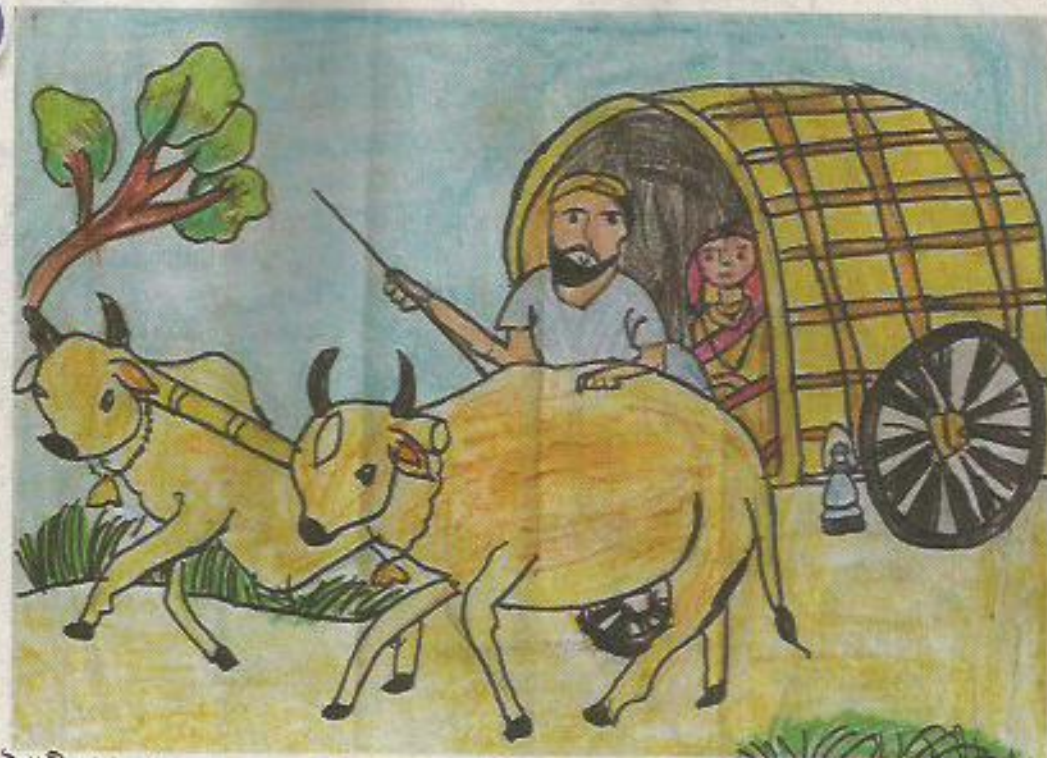
ঐশানী দাশগুপ্ত
তৃতীয় শ্রেণি, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলকাতা।

আমার ছবি

সুদীপ স্বর্ণকার
অষ্টম শ্রেণি, আরামবাগ বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমি।

আমার ছড়া

সুগত হাজরা
সপ্তম শ্রেণি, জে এল বিদ্যাভবন, বীরভূম।

ছোট্ট যিশু

চলে গেল আর-একটা খুশির বড়দিন
অন্যদিনগুলোর সাথে তুলনাহীন।
এলেন মাতা মেরির সঙ্গে ছোট্ট যিশু,
কাটল নানা রকম কেক এই মহাশিশু;
চার্চে-চার্চে জ্বলে উঠল মোমবাতি,
সকল রাতের সেরা এই রাতি।
আর এলেন চুপিচুপি বুড় সান্টা,
সকালে জেগে ভরে উঠল শিশুদের মনটা;
গিফ্‌ট পাওয়ার নিয়ম বড় সোজা
পাশে রাখলেই হবে যে একটা মোজা।
সেইসঙ্গে এল দু'হাজার ষোলো,
যিশুর দু'হাজার পনেরোটা বছর পূর্ণ হল।
বড় মন, বড় আশা, সবই বড়-বড়
তোমরাও কিন্তু তোড়জোড় শুরু করো।
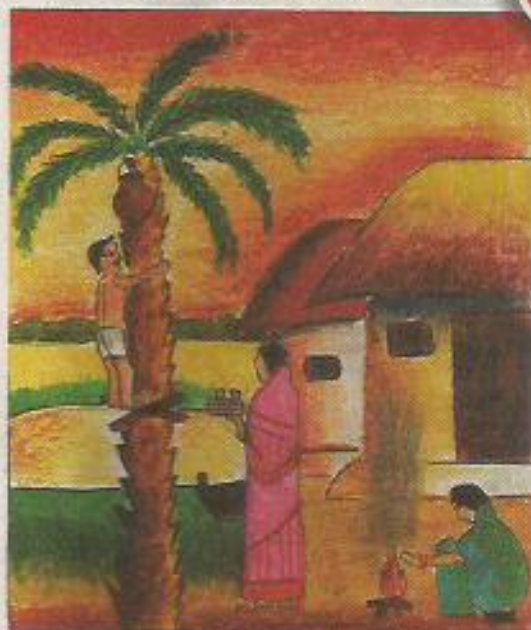
তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো, তারা এই পাতার জন্য লেখা এবং ছবি পাঠাও।
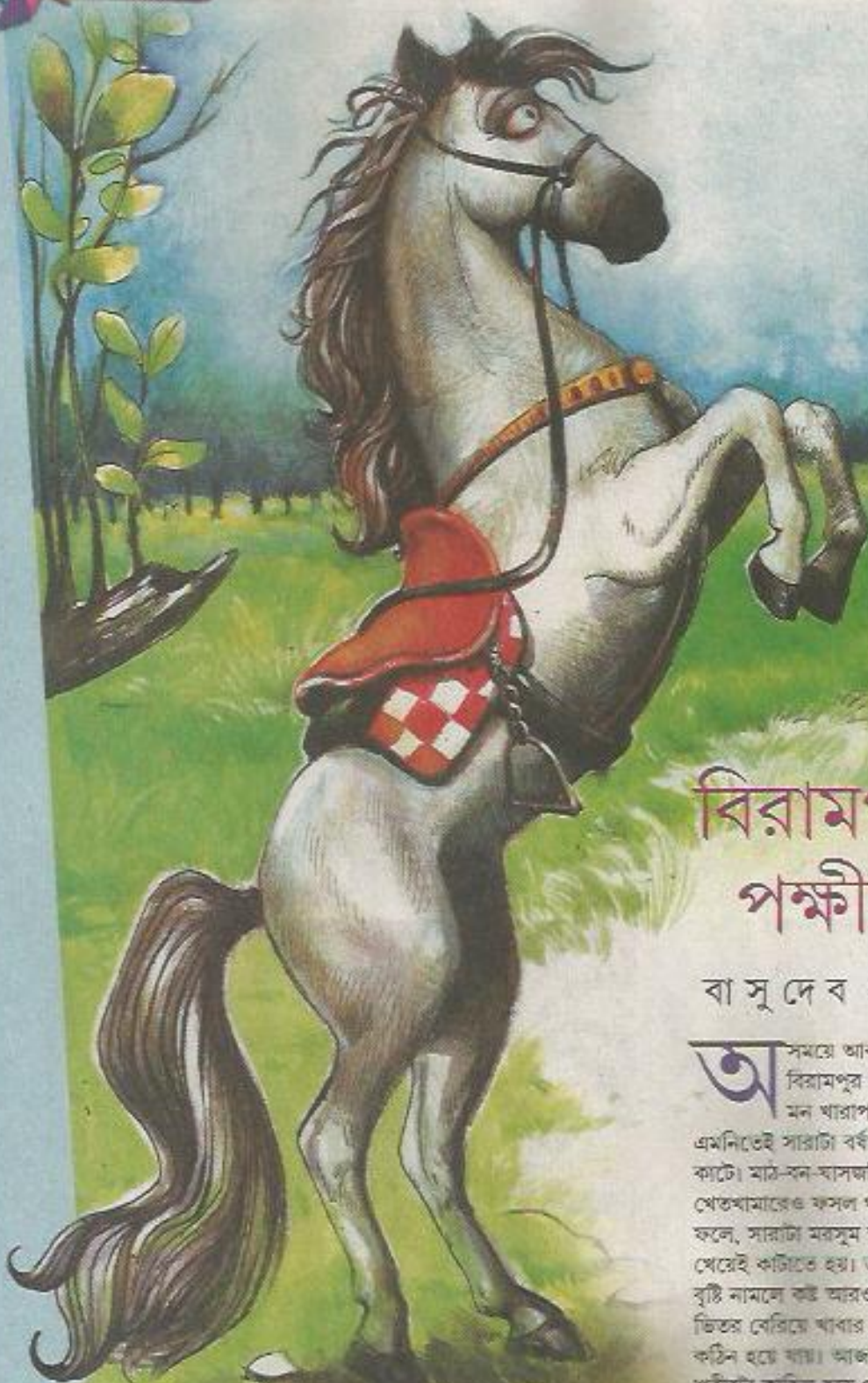
বিরামপুরের পক্ষীরাজ

বাসুদেব মালাকর

অসময়ে আকাশে মেঘ দেখলেই বিরামপুর গাঁয়ের পক্ষীরাজের মন খারাপ হয়ে যায়। এমনিতেই সারাটা বর্ষাকাল তার খুব কষ্টে কাটে। মাঠ-বন-ঘাসজমি জলে ডুবে যায়, খেতখামারেও ফসল থাকে না তেমন। ফলে, সারাটা মরসুম তাকে প্রায় না খেয়েই কাটাতে হয়। তার উপর অসময়ে বৃষ্টি নামলে কষ্ট আরও বাড়ে। দুর্যোগের ভিতর বেরিয়ে খাবার জোগাড় করা খুব কঠিন হয়ে যায়। আজকাল অল্পেতেই শরীরটা কাহিল হয়ে পড়ে।

আর দশটা ঘোড়ার মতো পক্ষীরাজেরও চারটে পা, দুটো কান আর

একটা লেজ আছে। কিন্তু যা নেই, তা হল, শরীরে আগের মতো শক্তি। চেহারাটা বিশাল বটে, কিন্তু বয়স তো কম হল না। সামনের ফাল্গুনে ছাব্বিশ পার হয়ে সাতাশে পা রাখবে সে। আর বড়জোর তিন কী চারটে বছর। তারপরেই একদিন...একটা পায়ে তো তেমন জোরই নেই, একনাগাড়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে টনটন করে। তখন শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে জানে, শুয়ে পড়লে আর ওঠা যাবে না। ওটাই শেষ শোয়া হবে। তখন কে তার মুখের সামনে ঘাস-জল এনে ধরবে? সোনার চামচ মুখে নিয়ে সে বড় হয়েছিল। শেষ বয়সে যে তার এই দশা হবে, কল্পনাও করতে পারেনি সে।

একেবারে শৈশবের কথা, মায়ের কথা তার মনে না থাকলেও ছেলেবেলার কথা বেশ মনে আছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে শ্রীরামপুরের বসন্ত লাহার আস্তাবলকেই নিজের ঘরবাড়ি বলে জেনেছে। পবন বলে একজনের কথাও খুব মনে আছে।

বসন্ত লাহা খুব বড়লোক ছিলেন। তল্লাটে তাঁরই কেবল একখানা জুড়িগাড়ি ছিল। পবন সেই জুড়িগাড়ি টানত। গাড়ি টানা বাদেও বসন্তকে পিঠে নিয়ে দূরদূরান্ত ঘুরে বেড়াত পবন। যেমন বিরাট চেহারা, তেমনই শক্তি ছিল তার। খুব যত্ন করা হত তাকে। বাদামি রঙের উপর রোদ্দুর পড়লে সারা শরীর চকচক করত। তার লেজের ডগার রংটা ছিল সাদা। খুব হিসেবি লোক ছিলেন বসন্ত। পবন বৃদ্ধ হয়ে গেলে তখন কার পিঠে চড়বেন ভেবে আগেভাগে ছোট অবস্থাতেই পক্ষীরাজকে কিনে এনেছিলেন তিনি। আদর করে নাম রেখেছিলেন, পক্ষীরাজ। পবনের পাশাপাশি একটু-একটু করে বড় হচ্ছিল পক্ষীরাজ।

ছেলেবেলা থেকেই পক্ষীরাজ বসন্ত লাহার মেয়ে ময়নার খুব ন্যাওটা ছিল। রাতের বেলা ছাড়া তখনও তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হত না। বাড়ির উঠোন-বাগান, পুকুরপাড়, বাঁশঝাড়, সব জায়গায় তার অবাধ গতি। সব সময় ময়নার কাছাকাছি ঘুরঘুর করত। ময়নাও তাকে চোখের আড়াল করত না। নিজের হাতে তাকে ঘাস, ছোলা-চানা খাওয়াত। আদরের মেয়ের কাণ্ড দেখে বসন্ত মুচকি-মুচকি হাসতেন।

পক্ষীরাজের বয়স যখন এগারো বছর, সেই সময় তার কপাল পুড়ল। ততদিনে সে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। ওদিকে পবনও তখন বেশ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার আদবকায়দা শিখে, পিঠে সওয়ারি নিয়ে পক্ষীরাজের ট্রেনিং নেওয়ার পালা। তা, ছেলেবেলা থেকেই পবনের সঙ্গে ওঠাবসা করে অনেক কিছুই শিখে ফেলেছে সে। বসন্তকে পিঠে নিয়ে দৌড়তেও কোনও আপত্তি নেই তার। কিন্তু বসন্তরও তখন বেশ বয়স হয়ে গিয়েছে। বেশি জোরে ছুটলে পক্ষীরাজের পিঠে বসে থাকতে তাঁর কষ্ট হয়। কিন্তু পক্ষীরাজের আবার তাতেই ঘোর আপত্তি। সে তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হাওয়ার বেগে দৌড়তে চায়। বসন্ত লাগাম টেনে তাকে নিরস্ত করতে চাইলে সামনের দু'পা তুলে দাঁড়িয়ে চিঁহিঁহি শব্দে বিদ্রোহ করে। বসন্ত তার বেয়াড়াপনা দেখে যারপরনাই রেগে রইলেন। চাবুক দেখিয়ে ভয়ও দেখালেন। তাতেও কোনও হেলদোল হল না তার। আগে পক্ষীরাজকে কেউ কিছু বললে ময়না ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু ময়না ততদিনে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে। অগত্যা পক্ষীরাজও একটু-একটু করে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে উঠল। এর কিছুদিন পরেই একদিন সেই অঘটনটা ঘটল।

বসন্ত তার পিঠে চড়ে সোলপুকুরে কুটুমবাড়ি যাচ্ছিলেন। জায়গাটা অনেক দূর। তখন গ্রীষ্মকাল। বিকেলবেলা বাড়ি থেকে বের হয়ে অর্ধেকেরও বেশি পথ যাওয়ার পর হঠাৎ পশ্চিম আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। সেই সঙ্গে গুড়গুড় করে মেঘের ডাক। তার পাশাপাশি আকাশচেরা বিদ্যুতের ঝলক। পক্ষীরাজ বাতাস শুঁকে বিপদের গন্ধ পেল। কাছাকাছি আশ্রয় নেওয়ার মতো বাড়িঘরও নেই। চারদিকে ধু ধু মাঠ। পক্ষীরাজ দিগ্বিদিক ভুলে প্রাণপণে সামনের দিকে দৌড়তে শুরু করল। বসন্ত অনেক চেষ্টা করেও তাকে নিরস্ত করতে পারলেন না। চরম বিপদটা

ঘটতে তখনও বাকি। মিনিটদুয়েক পরেই সেটা ঘটল।

রাস্তার উপর একটা শুকনো নালার মতো ছিল। বর্ষাকালে মাঠের জল বের করে দেওয়ার জন্য কাটা হয়েছিল হয়তো। পক্ষীরাজ ভেবেছিল, লাফ দিয়ে জায়গাটা পার হয়ে যাবে। পার হওয়াটা তার পক্ষে অসম্ভবও ছিল না। কিন্তু ঠিক তখনই একটা জোরালো হাওয়ার ঝাপটায় চোখে ধুলো ঢুকে সে প্রায় অন্ধ বেসামাল হয়ে পড়ল। সামান্য হিসেবের ভুলে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল! পক্ষীরাজের পিঠ থেকে শক্ত মাটির উপর আছড়ে পড়ে বসন্ত কোমরে ভীষণ চোট পেলেন। পক্ষীরাজেরও সামনের বাঁ পা-টাও বোধ হয় ভেঙে গেল।

বসন্ত ডাক্তার-বদ্যি ডেকে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা লতাপাতা বেটে জাব তৈরি করে প্রলেপ দিয়ে, পায়ের সঙ্গে বাঁশের বাখারি বেঁধে দিয়েও পক্ষীরাজকে পুরো খাড়া করতে পারলেন না। ঘোড়া একবার শুয়ে পড়লে তার আর কোনও দাম থাকে না। সবাই বসন্তকে পরামর্শ দিল, "ও আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। কী হবে বাড়িতে শুইয়ে রেখে পুষে? অকারণে শুচ্ছের টাকা-ছোলা-চানার শ্রাদ্ধ! তার চেয়ে বরং তুমি ভাল দেখে আর-একটা ঘোড়া কিনে নাও বসন্ত। আর এটাকে গণেশপুরের শ্মশানের পাশের নিমগাছের তলায়..."

মাসদেড়েক পরে একদিন মাঝরাতে পক্ষীরাজ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বসন্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। পবন খুব ডেকেছিল সে রাতে। কিন্তু কেউ সে ডাকের অর্থ বুঝতে পারেনি। বাড়ি থেকে বের হয়ে পক্ষীরাজ অতি কষ্টে হাঁটতে-হাঁটতে বিরামপুরের একেবারে শেষপ্রান্তে সিন্ধুঠাকরুণের ঘরের সামনে গিয়ে আর এগোতে পারল না! যন্ত্রণায় পা-টা ছিঁড়ে যাচ্ছিল যেন!

সাতসকালে ঘরের সামনে পক্ষীরাজকে দেখে সিন্ধুঠাকরুণ অবাক হয়ে গেলেন! তার পায়ে তখনও সেই লতাপাতার শুকনো জাব, বাখারি বাঁধা। করুণদৃষ্টিতে সে সিন্ধুঠাকরুণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পরিস্থিতি আঁচ করে, উনুনে জল গরম করে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে সিন্ধুঠাকরুণ কাজে নেমে পড়লেন! তাঁর বাবা ছিলেন ধন্বন্তরি কোবরেজ। লতাপাতা, ওষুধপত্তর তাঁরও কিছু কম জানা নেই। আহা, অবলা কৃষ্ণের জীবটা এভাবে বেঘোরে মরে যাবে!

বসন্ত খবরটা পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনও আগ্রহ দেখাননি। যাক,

সাতসকালে ঘরের সামনে পক্ষীরাজকে দেখে সিন্ধুঠাকরুণ অবাক হয়ে গেলেন! তার পায়ে তখনও সেই লতাপাতার শুকনো জাব, বাখারি বাঁধা। করুণদৃষ্টিতে সে সিন্ধুঠাকরুণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

অকেজো আপদ যদি আপনা থেকেই বিদেয় হয় তো হোক! এরকম একটা ভাবনা নিয়ে তিনি চুপচাপ থাকলেন। সেদিন থেকে পক্ষীরাজের বেওয়ারিশ অনাথ জীবন শুরু হল! তার যা কিছু মায়া, তা একমাত্র সিন্ধুঠাকরুণের উপর।

॥ ২ ॥

বিরামপুরের দক্ষিণ দিক দিয়ে একটা নদী বয়ে গিয়েছে। নদীর ওপারের জায়গাটার নাম সোনাখালি। এপার থেকেই আবছা দেখা যায়, নীলচে সবুজ রঙের বিশাল একটা জঙ্গল সেখানে। নদীটা খুব বড় নয়, কিন্তু খুব গভীর। দু'পারে অনেকটা জায়গা জুড়ে শুধু বালি আর বালি। সেই বালির ভিতরে ছোট-ছোট ঝোপঝাড়। পক্ষীরাজ লতাপাতা খেতে মাঝে-মাঝে সেখানে আসে। যা পাওয়া যায়, তাতে তার পেট ভরে না। উত্তরের মাঠের দিকে প্রচুর শাকসবজির খেত। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুতে মুখ দিলে কৃষকরা মেরে হাড় ভেঙে দেবে! এমনিতেই তাকে দেখলে সবাই লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। অকম্মার ঢেঁকি একটা! খেতের ফসল, শাক-সবজি সব চুরি করে খেয়ে শেষ করে! রাস্তা নোংরা করে রাখে, খিদে পেলে লোককে চাঁটা মারে! তল্লাটের লোকেরা এইসব বলে এবং তাকে বিষনজরে দ্যাখে। ছোট বাচ্চারা তাকে দেখলেই ঢিল ছোড়ে, নয়তো পিঠে ওঠার জন্য জোরাজুরি করে! কিন্তু তার তো আর সেই বয়স নেই যে পিঠে সওয়ারি নিয়ে ছুটবে! আবার পিঠে নিলেও জোরে ছুটতে না পারলে ছপটি দিয়ে মারবে! এমনিতেই তার একটা পা কমজোরি, বেশি ছোটাছুটি সহ্য হয় না। কেউ লাঠি নিয়ে তাড়া করলে বেশি দূরে ছুটে পালিয়ে যেতেও পারে না। তবুও বাচ্চাগুলো তাকে জ্বালাতন করে মারে। বিচ্ছু এক-একটা!

পক্ষীরাজ মাঝে-মাঝে ভাবে, নদী পেরিয়ে একদিন সে ওপারের ওই সোনাখালির জঙ্গলে চলে যাবে। সেখানে অঢেল ঘাস, লতাপাতা, গাছপালা, খাওয়ার অভাব হবে না। নিত্যদিন এই খাওয়ার কষ্ট আর সহ্য হয় না। বাচ্চাগুলোর জ্বালাতনের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। যাওয়াটা তার কাছে কঠিনও কিছু নয়। সে ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু অন্য একটা সমস্যা রয়েছে।

সোনাখালির জঙ্গলে বড় একপাল হাতি আছে। ছোটখাট পাহাড়ের মতো বিশাল চেহারা তাদের। লম্বা, মোটা, সাদা, ধারালো দাঁত। শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে মোটা-মোটা গাছপালা ভেঙে তার ডালপাতা খায়। কিন্তু সেই সোনাখালির জঙ্গলও ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। তার এক পাশে বন

কেটে চওড়া রাস্তা তৈরি হয়েছে, আর-এক দিকে কিসের কারখানা হবে বলে বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে। বেচারিদের খাবারে টান পড়ছে ক্রমশ। এপারের খেতে যখন ফসল পাকে, শাকসবজি গজিয়ে ওঠে, সেই হাতির দল তখন খাবারের লোভে নদী পার হয়ে এপারে চলে আসে। রাতের অন্ধকারে জমিতে নেমে ইচ্ছেমতো ভূরিভোজ সেরে, ফসল মাড়িয়ে নদীতে স্নান করতে নামে। রাত জেগে পাহারা দিয়ে, বাজি-পটকা ফাটিয়ে, মশাল জ্বালিয়েও তাদের নিরস্ত করা যায় না। শুধু খেতখামারই নয়, কখনও তারা আম-কাঁঠাল-আতা-কলা-ধানচালের লোভে গেরস্থবাড়িতেও চলে আসে। রেগে গেলে বাড়িঘর ভেঙে দেয়, লোকজনকেও তাড়া করে।

পক্ষীরাজ খুব ভয়ে-ভয়ে থাকে তখন। অনেক দূরে, ওদের নজরের বাইরে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকে ক'দিন। সবাই তো সমান নয়, দু'-একটা বদরাগীও নিশ্চয়ই আছে ওদের দলে। যদি শুঁড়ে পেঁচিয়ে তাকে... ওদের গায়ের জোরের সঙ্গে সে এঁটে উঠবে না।

অগ্রহায়ণ মাস পড়ে গেল। মাঠে-মাঠে ধান পেকেছে। শীতের সবজিও পুষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই সময় দেখা গেল, সোনাখালি জঙ্গলের হাতির সেই দলটা নদী পার হয়ে এপারে চলে এসেছে। বড়দের পাশাপাশি তিন-চারটে ছোট-ছোট ছানাও রয়েছে সঙ্গে। গাঁয়ের সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল এবার বুঝি ধ্বংস হয়ে যায়!

পক্ষীরাজ লুকিয়ে থাকার মতো একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজছিল। খুব খিদেও পেয়েছিল তার ক'দিন ধরে। হাতির ভয়ে সে নদীর ধারে ঘাস খেতে যেতে পারেনি। বলরাম দাসের কড়াইখেতের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে সে সিমসুদ্ধ একটা কড়াই গাছ মুখে করে ছিঁড়তেই বলরাম দাস ছুটে এসে লাঠি দিয়ে তার পিঠে ঘাকতক বসিয়ে দিল। পক্ষীরাজ চিঁহিহি ডাক দিয়ে কোনও মতে ছুটে পালাল।

ধানের খেতে রাতপাহারা দেওয়া শুরু করেছে সবাই। মশাল, কেরোসিন তেল, হাতপটকা, ক্যানেস্তারা সবার ঘরে-ঘরে মজুত। রাতের বেলা সারা মাঠ জুড়ে হেরিকেনের আলো দেখলে মনে হয়, সারা মাঠ জুড়ে কে যেন আলোর ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে।

পক্ষীরাজ সেই সময় চুপিসাড়ে মাঠে নামে। খুব সন্তর্পণে তাড়াতাড়ি কিছু সবজি খেয়ে নন্দীদের পোড়োবাড়ির পিছনের ইটের গাদার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। পেটের দায়ে এটুকু চুরি না করে তার কোনও উপায় নেই। পোড়োবাড়িটা তার পক্ষে খুব নিরাপদ। প্রথমত, ইটের গাদার ভিতর অজস্র বিষাক্ত সাপের বাসা। সাপের ভয়ে সেখানে কেউ যায় না। কিন্তু সাপের কামড়ে ঘোড়ার কোনও ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয় কারণ, পায়ের নীচে ইট-পাথরের টুকরো পড়লে হাতিরা সে পথ এড়িয়ে চলে।

॥ ৩ ॥

একদিন সন্ধের একটু আগে হাতির দলটা গ্রামে ঢুকে পড়ল। চারদিকে ছোটাছুটি, হইচই পড়ে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে যে যেদিকে পারছে, দৌড়চ্ছে। পিছনে একদল লোক মশাল, পটকা, ইট পাথর নিয়ে হাতিগুলোকে তাড়া করে আসছে। ভয় পেয়ে বা বিরক্ত হয়ে হাতিরা মাঠের দিকে চলে যেতে চাইছে তাড়াতাড়ি। যাওয়ার পথে সামনে যা পড়ছে, মাটির ঘর, উনুন, ধানের গোলা, সব তছনছ করে দিচ্ছে। জোরে পা চালিয়ে তারা বলরাম দাসের উঠোনে পৌঁছে গেল। সেখানে তখন বলরামের এক বছরের ছোট্ট নাতি হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করছিল। একটা মাঝারি হাতি বলরামের নাতির কাছে গিয়ে পা দিয়ে তাকে একটু ধাক্কা দিল, বাচ্চাটা মাটিতে গড়িয়ে পড়েই চিৎকার করে উঠল। এরই মধ্যে হাতির পিছনে তেড়ে আসা লোকজনের ভিতর থেকে কেউ একজন একটা হাতির গায়ে জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে মেরেছে। সেই হাতিটা

রেগে গিয়ে দৌড়ে এসে বলরামের নাতিকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

ঠিক সেই সময় পক্ষীরাজও বলরাম দাসের বাড়ির পাশ দিয়ে

> এরই মধ্যে হাতির পিছনে তেড়ে আসা লোকজনের ভিতর থেকে কেউ একজন একটা হাতির গায়ে জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে মেরেছে। সেই হাতিটা রেগে গিয়ে দৌড়ে এসে বলরামের নাতিকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

তার আস্তানায় লুকোতে যাচ্ছিল। তাকে দেখেই হাতিগুলো যেন মজা পেয়ে গেল। বাহ্, এটা তো বেশ একটা অন্য রকম প্রাণী। গোরু নয়, মোষও নয়, ছাগল-কুকুরও নয়। এরকম জন্তু তারা আগে কখনও দেখেনি। তা হলে এটা কী? প্রকাণ্ড চেহারার দলপতি একটু থমকে শুঁড় তুলে প্যাঁ প্যাঁ করে সঙ্কেত দিল, 'এসো সবাই মিলে এই নতুন প্রাণীটাকে নিয়ে একটু মজা করি।'

পক্ষীরাজের তখন আর পালাবার পথ নেই। পাহাড়ের মতো এমন বিশাল প্রতিপক্ষের মুখোমুখি কখনও হয়নি সে। এত কাছ থেকে ভাল করে দেখারও সুযোগ হয়নি আগে। সে বুঝে গেল, হাতিরা দয়া করে তাকে ছেড়ে না দিলে আজ তার মরণ কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু দলপতির চোখে দয়ার কোনও চিহ্ন নেই। রাগী-রাগী ভঙ্গি করে সে পক্ষীরাজের দিকে এগিয়ে আসছে। বাকিরা তাকে ঘিরে ধরেছে। ওদিকে বলরামের নাতিটা তখন একটা হাতির পায়ের সামনে। দূরে দাঁড়িয়ে বাচ্চার মা তখন নারকেল গাছের গায়ে মাথা কুটে কাঁদছে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল পক্ষীরাজের। আজ যদি তার পা-টা ভেঙে না যেত, যদি বয়সটা কম থাকত, লাফ দিয়ে, বাচ্চাটার একটা পা কামড়ে ধরে ছুট দিয়ে এদের নাগাল এড়িয়ে যাওয়া কোনও ব্যাপারই ছিল না।

মরিয়া পক্ষীরাজ এক মুহূর্ত কী ভেবে নিল। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি চোয়ালে একত্র করে দলপতির হাঁটুর পিছনে মোক্ষম কামড় বসিয়ে দিল। ঘোড়ার দু' পাটিতেই দাঁত থাকে, শক্ত মজবুত দাঁত। সে দাঁতের কামড় সহ্য করতে পারল না দলপতি। তা ছাড়া আকৃতিগতভাবে বড় এবং শক্তিশালী হওয়ার কারণে তারা বাকি জীবনে কখনও আক্রমণের মুখে পড়েনি। তাও এমন একটা অদেখা, অচেনা ছোট প্রাণীর কাছ থেকে। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া দলপতির পা দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে। নিজে বাঁচার এবং বলরামের নাতিকে বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টায় পক্ষীরাজ আবার কামড় বসানোর সুযোগ খুঁজছে।

দলপতি শুঁড় উঁচিয়ে প্যাঁ্যাঁ করে সবাইকে নির্দেশ দিল, 'পিছে হটো সব।' সেই শব্দ শুনে সবাই দিক পালটে তাড়াতাড়ি উলটো দিকে রওনা হল। বলরামের নাতির কোনও ক্ষতি হল না। শুধু সারা শরীরে ধুলোমাটি মেখে একাকার।

বলরাম ছুটে এসে পক্ষীরাজের গলা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, "তোকে একদিন খুব মেরেছিলাম, বাবা। আমাকে ক্ষমা করে দে। তুই না থাকলে আজ আমার ঘরবাড়ি, নাতিটা বাঁচত না।"

বলরামের বউমা ধামায় করে এক ধামা চাল, একখানা পাটালিগুড় এনে পক্ষীরাজের সামনে ধরে বলরামকে বলল, "বাবা, আজ থেকে ও আমার বড়ছেলে। ওর জন্য উঠোনে ঘর বানিয়ে দিন। ও আর কোথাও যাবে না।"

পক্ষীরাজ চালের ধামাটা একটু শুঁকে দেখল, পাটালিগুড়টুকু চাটল একবার। মাথাটা একটু ঝাঁকাল। তারপর খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে নদীদের পোড়োবাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। সন্ধে ঘোর হয়ে গিয়েছে তখন। পোড়োবাড়ি অনেকটা দূরে। একটা কমজোরি পা নিয়ে সেখানে পৌঁছতে পক্ষীরাজের অনেকটা সময় লেগে যাবে।

পুনশ্চ: এর পর আর কোনওদিন সোনাখালির জঙ্গল থেকে হাতিরা বেরিয়ে বিরামপুর আসেনি। মানুষের মতো, তারাও বোধ হয় বড়দের মুখে অদ্ভুত জীবজন্তুর গল্প শুনে-শুনে বড় হয়ে ওঠে।

ছবি: সৌমেন দাস

আমার দাবা

আমার নাম স্বপ্নিল ঘোষ। ছোটোবেলা থেকেই দাবা আমার বড় প্রিয় খেলা। ক্লাস ওয়ানে দাবার বোর্ডের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সঙ্গী হিসেবে বাবা-ই হল সবচেয়ে ভাল লোক। যতদিন গেল, ততই খেলাটা ভাল লাগতে লাগল। ক্লাস ফাইভে আমি ভর্তি হলাম 'দিব্যেন্দু বড়ুয়া চেস অ্যাকাডেমি'তে। সেখানে আমার মতো অনেক দাবাপাগল বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। রবিবার সকালবেলা পড়ে উঠে দাবার বোর্ড সামনে পেলে আমি সবচেয়ে খুশি হই। সাদা ও কালো দুই দলের মধ্যে চলা এই বুদ্ধির যুদ্ধ আমার মনে আনন্দের ঢেউ তোলে। আর এই আনন্দের দোলা অনুভব করতেই আমি গিয়েছি নানান দাবা প্রতিযোগিতায়। দাবা আমার প্রাণ, আমার দুনিয়া। এই দুনিয়ার অফুরান সাগরে ডুব দিলে আর কিছু দেখতে ইচ্ছে করে না। দম আটকে আসে। কিন্তু মুখ তুলতে প্রাণ চায় না। চিরদিনের মতো ডুবে যেতে ইচ্ছে করে আমার এই দুনিয়ায়।

স্বপ্নিল ঘোষ
সপ্তম শ্রেণি, দমদম কিশোর ভারতী হাই স্কুল, কলকাতা।

বাড়িতে প্র্যাকটিস

বাইরে খেলছি

দ্যাখো, ভাবো আর আঁকো

ছবি আঁকতে সবাই ভালবাসে। তাই এবার শুরু হল এই নতুন বিভাগ। এখানে আঁকা অসমাপ্ত ছবিটা শেষ করো দেখি। আঁকা শেষ হলে রং করে ফ্যালো ছবিটাকে।

ছবি: কুনাল বর্মণ

'এমন একটা ফুলের সম্পর্কে লিখে পাঠাও, যার কথা কেউ কখনও শোনেইনি।' লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

সেদিন গিয়েছিলাম পুষ্পমেলায়। সেখানে আমার এমন একটা ফুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যার কথা তোমরা কেউ জান না। সে দেখতে খুব সুন্দর আর তার একটা দারুণ গুণ আছে। সপ্তাহের সাতদিন সে রামধনুর এক-একটা রঙে রঙিন হয়। সরল মনে তার পাশে যে এক মিনিট দাঁড়াবে, তার বাগানে সেই ফুলের গাছ হয়ে যায়। কীভাবে? তার গন্ধ থেকে। সুন্দর গন্ধ মানুষের গায়ে জড়িয়ে বাড়ি যায় ও বাগান আলো করে দেয়। সে মানুষের কথা বুঝতে পারে তার সেন্সরের মাধ্যমে। তাকে কোনও কথা বললে যদি তার ভাল লাগে তবে তার গা থেকে সুন্দর গন্ধ বেরয়। যদি খারাপ লাগে তা হলে খুব বিচ্ছিরি গন্ধ বেরয়, যা থেকে আমরা তার মতামত বুঝতে পারি। সে কিন্তু খারাপ লোকের বাগানে থাকে না। খারাপ লোক তার সামনে দাঁড়ালে সে কালো হয়ে যায়। এই সুন্দর ফুলটা পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজাতে চায়। আমিও তো চাই। তাই আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। আমার বন্ধু-ফুলের সঙ্গে তোমরাও কি বন্ধুত্ব করতে চাও? তবে এসে একটি বার তার সামনে দাঁড়াও আর দ্যাখো তোমার বাগান আলো করে আছে আমার 'আলোধারা'।

আয়ুষ মিশ্র
চতুর্থ শ্রেণি,
বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতন, মেদিনীপুর।

দ্বিতীয়

পরিবেশ ফুল! এইরকম নামের ফুল কি আসলে হয়? আমি বুঝে উঠতে পারছি না। সেদিন যেটা দেখলাম সেটা কি সত্যি না মিথ্যে? তবে বলেই ফেলি কী হয়েছিল। সেদিন দুপুরে বাগানে জল দিতে-দিতে দেখি একটা অদ্ভুত ফুল কাঁদছে। আমি অবাক হলাম। ফুলটা দেখতে খুব সুন্দর। তাতে রামধনুর সাতরঙেরই ছোঁয়া আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে তুমি? তুমি কাঁদছ কেন?" সে বলল, "আমার নাম পরিবেশ ফুল। তোমরাই আমার দুঃখের কারণ। আমার বন্ধুরা এই দূষিত পরিবেশে আর থাকতে পারছে না। তাই আমাকেই কিছু করতে হবে।" আমি বললাম, "আমিও তোমার সঙ্গে আছি।" সে তার কাণ্ড থেকে এক ধরনের রস বের করল, যাতে মাটির সমস্ত অজৈব পদার্থ ডাস্টবিনে জমা হয়ে গেল। সে তার পাপড়িগুলো ঘুরিয়ে পাখার মতো করে চালানোতে আমাদের বাগানের বাতাস দূষণমুক্ত হয়ে গেল। আমারও খুব ভাল লাগল। শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছিল না। আমি তাকে ধন্যবাদ জানানোর আগেই একটা জোরো হাওয়ার দাপট এল। তারপরেই ফুলটা কর্পূরের মতো উবে গেল। আমি মনে-মনে ভাবলাম, 'এমন ফুল যদি প্রতি বাড়িতে থাকত, তবে আমাদের পৃথিবীর ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ একটু হলেও বদলে যেত।'

অঙ্কিতা মণ্ডল
ষষ্ঠ শ্রেণি,
বালুরো বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মালদা।

তৃতীয়

কালো অশুভ রং। কালোকে কেউ ভালবাসে না। কালো ফুল আমি কোনওদিন দেখিনি। কিন্তু আমার পছন্দ এমনই একটা কালো ফুল। সবাই জানবে কালোও ভাল। সেই কালো ফুল থেকে ছড়িয়ে পড়বে হিরের মতো দ্যুতি। ফুলটার তেরোটা পাপড়ি থাকবে। কেননা তেরো সংখ্যা অশুভ। কিন্তু এই তেরোটা পাপড়িই ভরিয়ে তুলবে আমাদের মন। টেনে আনবে রংবেরঙের প্রজাপতিকে। এই ফুল কারও সাহায্যে নয়, ফুটবে স্বাভাবিক নিয়মে। যেখানে-সেখানে। এই ফুল হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে সবাই। এর ক্ষমতা থাকবে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করার। আবার গাছের খাবার তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা থাকবে এর। আর একটা কথা, গাছ যখন ঘুমিয়ে পড়বে রাতে ত্যাগ করবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, এ কিন্তু তখনও ছাড়বে অক্সিজেন। তাই বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ একটুও কমবে না। এককথায় পৃথিবীকে দূষণমুক্ত ও কুসংস্কারমুক্ত করার কাজে ব্রতী হবে আমার এই ফুল। কালো ফুলের গুণে মুগ্ধ হয়ে সবাই তখন ভালবাসবে তাকে। কালোকে আর কেউ ভয় পাবে না বা এড়িয়ে যাবে না।

শ্রীতমা সিংহ
ষষ্ঠ শ্রেণি,
বহরমপুর গার্লস মহাকালী পাঠশালা, মুর্শিদাবাদ।

চতুর্থ

সেদিন মামার বাড়ির বাগানে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ দেখি অনেক ফুলগাছ যেন বৃত্তের আকারে কোনও জায়গাকে ঘিরে রয়েছে। গাছগুলোয় রংবেরঙের ফুল, লাল, হলুদ, সাদা, কমলা, বেগুনি, গোলাপি আরও কত কী! আগ্রহ সহকারে কিছুটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেখান দিয়ে ঢুকে দেখি কী অপূর্ব! একটি অতি সুন্দর ফুলের গাছ। প্রচুর ফুল গাছটিকে আলোকিত করে রয়েছে। তবে ফুলগুলো বড় অদ্ভুত। সাতরঙা ফুল সাতটি পাপড়িযুক্ত। পাপড়িগুলো বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। গাছটির কাছে এগিয়ে গেলাম। আলতো করে একটি ফুল তুলে শুঁকে দেখলাম, কী সুন্দর গন্ধ! পাপড়িগুলোর সংযোগস্থলে একটি মুক্তোর মতো বল। আস্তে করে বলটিতে হাত দিতেই সেটি একটু ঢুকে গেল। ভেসে আসতে লাগল একটি সুন্দর সুর। শুনে মনপ্রাণ ভরে গেল। পাপড়িগুলো আন্দোলিত হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সেটি থেমে গেলে আবার বলটি ঠেলতেই সেই এক কাণ্ড। তখন-ই ছুটতে-ছুটতে মায়ের কাছে এসে ফুলটি দেখাতে যাব, দেখি হাত ফাঁকা। কী জানি, কখন, কীভাবে ফুলটি উধাও হয়ে গিয়েছে।

শতভিষা দাশ
অষ্টম শ্রেণি, কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, নদিয়া।

আরও যারা ভাল লিখেছে

সৌপর্ণ পাল
চতুর্থ শ্রেণি, টিলব্রেল আকাদেমি, বাগনান।

স্নেহা ঘোষ
সপ্তম শ্রেণি, বার্লো বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মালদা।

তরুণিমা গঙ্গোপাধ্যায়
ষষ্ঠ শ্রেণি, ধানাকুড়িয়া গার্লস হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা।

আদ্রিকা নস্কর
সপ্তম শ্রেণি, বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর।

অগ্নিশ রায়
সপ্তম শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান।

শ্রেষ্ঠা ঘোষ
পঞ্চম শ্রেণি, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, কলকাতা।

অর্জিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্চম শ্রেণি, বালুরঘাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর।

শুভদীপ মোই
ষষ্ঠ শ্রেণি, কেন্দুয়াডিহি উচ্চতর বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

তোর্সা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় শ্রেণি, সত্যানন্দ শিশুভারতী, নুবরাজপুর।

পঞ্চম

আমার বাগানে একটা ফুল ফুটেছে। ভারী আজব সে ফুল। একটা টবে মাটি রেখেছিলাম। মজার জন্যে কোনও কিছুর বীজ না পুঁতে জল ও সার দিচ্ছিলাম। কালকে হঠাৎ গিয়ে দেখি একটা আজব ফুল। ফুলটার নাম রেখেছি চাগোড্রেলা। ফুলটার ডাঁটিটা গোলাপের মতো কাঁটাওয়ালা। চামেলির মতো দেখতে ফুলটা সিনড্রেলার মতো সুন্দর। জল ও সার সত্ত্বেও শুকিয়ে যাচ্ছিল। ওটার আবার জল হিসেবে ফলের রস ও সার হিসেবে ভাত পেস্ট করে দিতেই দেখি সতেজ হয়ে উঠল। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! ওটার পরাগসংযোগই হচ্ছে না। কোনও পোকা বা পাখি কিসের ভয়ে কে জানে ওটার ধারেকাছেই আসছে না। হায়! আমার আবিষ্কৃত ফুল আমার কাছেই রয়ে গেল।

শ্রীকন্যা নন্দী
চতুর্থ শ্রেণি,
ডি এ ভি পাবলিক স্কুল, ব্যারাকপুর।

এবারের প্রতিযোগিতা

কিছুদিন পরেই আসছে বসন্ত। নতুন কোনও ঋতু চাও প্রকৃতিতে? কীরকম হবে সেই সময়ের রং, আকাশ আর সব কিছু? যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, আজই লিখে পাঠাও ২৮ জানুয়ারির মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম ও ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ছাপব। খামের উপর কোন সংখ্যার খুদে প্রতিভা পাঠাচ্ছ, লিখবে। ঠিকানা: 'খুদে প্রতিভা', 'আনন্দমেলা', ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
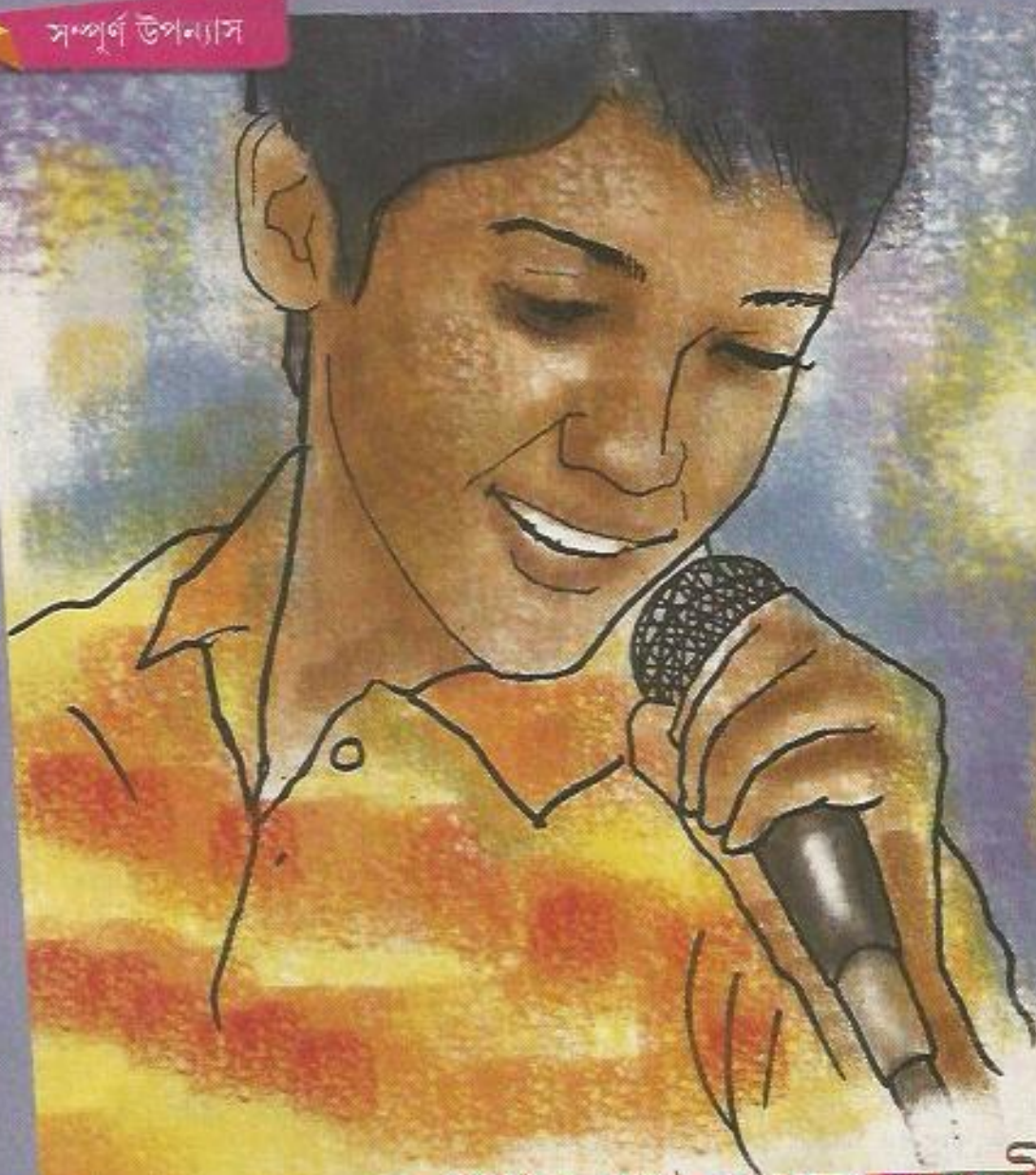
অপারেশন সুরলহরী

চিত্রলেখা দাশ

শরতের নির্মেঘ সকাল। মাখন গলানো নরম রোদ্দুর মাখা ঝকঝকে নতুন একটা দিন। স্নিগ্ধ, মনোরম। আকাশে, বাতাসে আগমনীর গন্ধ। দুর্গাপুজোর আর বেশি দেরি নেই। হাতে গোনা দশটি দিন। প্রতিভাসের মেজাজ বেশ ফুরফুরে। কাজের চাপ নেই। এক রকম শুয়ে-বসে দিন কাটছে। সঙ্গী কিছু গোয়েন্দা অ্যানাল আর ল্যাপটপ।

সকালের প্রথম চা পর্ব শেষ। বাড়িতে আসা সেদিনের গোটাদুয়েক দৈনিকে মন দেয় প্রতিভাস।

আচমকা ডোরবেলের ডিং ডং। বিরামহীন ক্রমলয়ে। মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে তার। এত সকালে কারও তো আসার কথা নেই, তা হলে? আগমনকারীর এত অস্থিরতাই বা কেন?

প্রতিভাসের কপালে ভাঁজ পড়ে। বুধুয়া দরজা খোলামাত্র ড্রইংরুমে মূর্তিমান ঝড়ের ঝাপটা।

"ছোটকা, ছোটকা, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!" বছরপনেরোর অঙ্কিত হাঁপাতে-হাঁপাতে সোফায় এসে বসে।

প্রতিভাসের স্থির দৃষ্টি অঙ্কিতের উপর। ছেলেটার চোখমুখ উত্তেজনায় ফুটছে। সাতসকালে কী এমন ঘটল? বাড়ির কোনও সমস্যা? মনে হয় না। তা হলে দাদা জানত।

"বলি ব্যাপারখানা কী? কাণ্ডেই আটকে থাকবি, না ডালপালারও সন্ধান দিবি?" অধৈর্য হয় প্রতিভাস।

"কাল বিকেল থেকে টাবুনকে পাওয়া যাচ্ছে না," নিশ্বাস চেপে বলে দম ছাড়ে অঙ্কিত।

"টাবুন? টাবুন কে?"

"আমার বন্ধু। স্কুলতুতো।"

"ও: দাখ, পরিচিত কারও বাড়ি গিয়েছে হয়তো। তুই না জেনে হাঁপাচ্ছিস," গা-ছাড়া ভাব প্রতিভাসের।

"না গো ছোটকা, ঘটনাটা হেলাফেলার নয়। যথেষ্ট সিরিয়াস," উত্তেজিত অঙ্কিত।

"কী রকম?" উৎসুক প্রতিভাস।

"গতকাল বিকেলে বাড়ির কাছের ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ আনতে গিয়ে বাড়ি ফেরেনি টাবুন। রীতিমতো ভ্যানিশ।"

"বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি করেনি?" বিস্ময় প্রতিভাসের কণ্ঠে।

"করেনি আবার। কিন্তু পেলে তো!"

"মানে? কোথাও পায়নি? আত্মীয়, পরিচিত কারও বাড়ি যায়নি ছেলেটা?" উদ্বেগে ভাসছে প্রতিভাস।

"না গো। তা ছাড়া যাবেই বা কোথায়? কাল সকাল থেকে কাছের সব আত্মীয়ই তো ওদের বাড়ি।"

"কেন?"

"গত পরশু থেকে টাবুনের দাদুর শারীরিক অবস্থা একদম ভাল নয়। যে-কোনও মুহূর্তে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শমতো সে খবর জানতে পেরে একে-একে সবাই হাজির। তা ছাড়া এই অছিলায় টাবুনের সঙ্গে কিছু সময় কাটানোরও ইচ্ছে," ততক্ষণে অঙ্কিত খানিক ধাতস্থ হয়েছে।

"বুঝলাম। এমন পরিস্থিতিতে টাবুনের বাবার পাশে সকলের থাকা উচিত। কিন্তু টাবুনের সঙ্গে সময় কাটানোর অর্থ?"
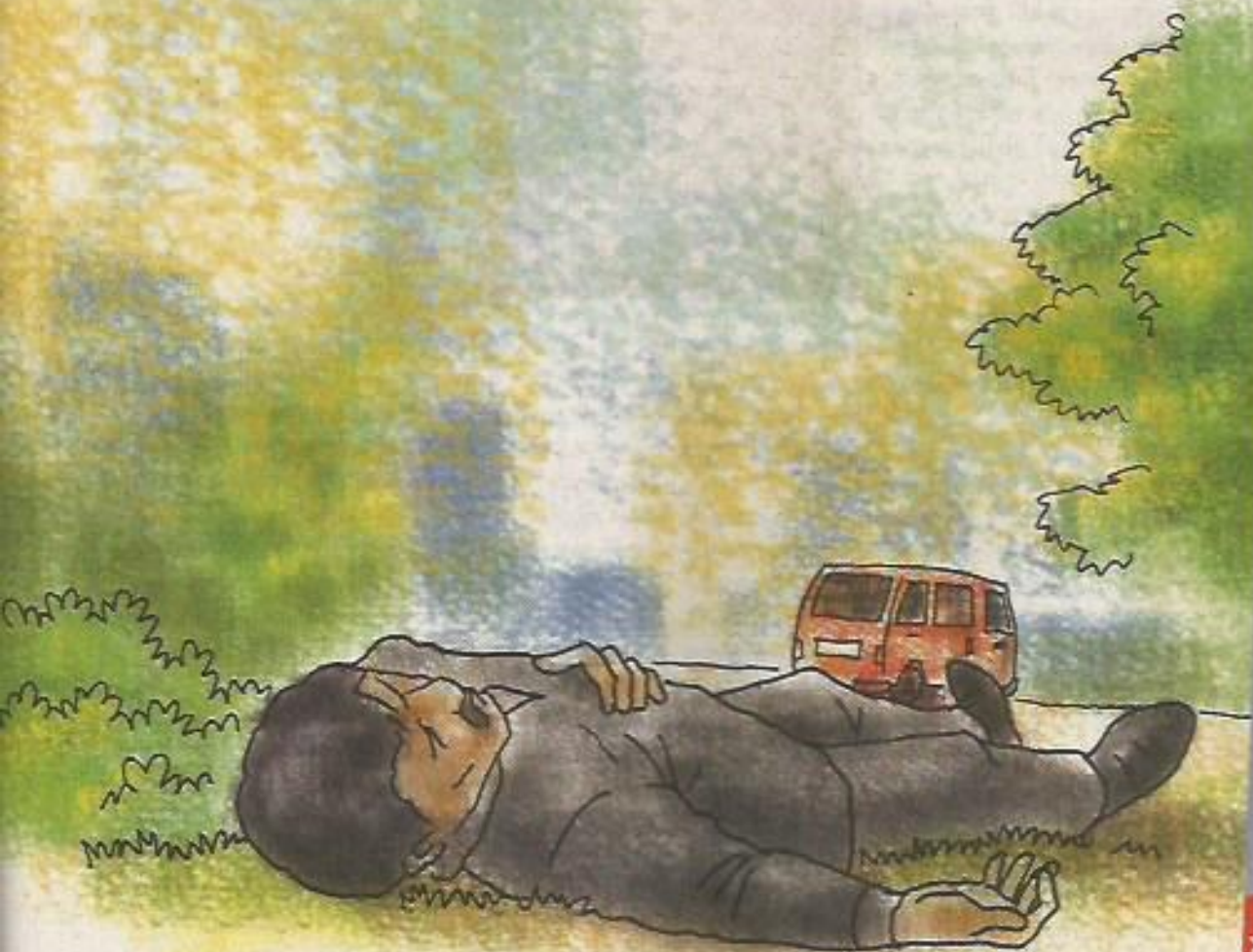
"টিভির 'বাংলা তখন' চ্যানেলে 'সুরলহরী' অনুষ্ঠানটা কি দেখো?"

"সুরলহরী? প্রতিযোগিতামূলক ওই গানের অনুষ্ঠান? দেখি বইকী! কিন্তু ওই অনুষ্ঠানের কথা কেন?"

"সুরলহরীর পাঁচ ফাইনালিস্টের মধ্যে একজন তো টাবুন।"

"মানে কোন ছেলেটি? যত দূর মনে পড়ছে টাবুন নামে তো কোনও প্রতিযোগী নেই।"

একেবারে গোড়ার দিকের কয়েকটি পর্ব বাদ পড়লেও গত কয়েক সপ্তাহ সুরলহরীর প্রতিটি পর্ব দেখছে প্রতিভাস। সময় কাটানো আর ভাললাগা মিলেমিশে একাকার। দু'-একজন বাদে প্রতিটি প্রতিযোগী কেউ যে কারও চেয়ে কম নয়, এ মন্তব্য ওই অনুষ্ঠানের অন্যতম বিচারক প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীময়ী সেনের। প্রতিভাসেরও মত তেমনটাই। প্রত্যেকের পারফরম্যান্স অসাধারণ।

"টাবুন তো বাড়ির নাম। ভাল নাম অর্কপ্রভ। অর্কপ্রভ চ্যাটার্জি।"

পলকের জন্য অন্যমনস্ক প্রতিভাসের সংবিৎ ফেরে অঙ্কিতের কথায়। নিমেষে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঝকঝকে, স্মার্ট এক কিশোরের মুখ। সবচেয়ে সম্ভাবনাময়।

"অর্কপ্রভ চ্যাটার্জি তোর বন্ধু? আগে কখনও বলিসনি তো!"

"প্রয়োজন হয়নি।"

"কিন্তু অঙ্কু, যত দূর জানি এ ধরনের প্রোগ্রাম চলাকালীন প্রতিযোগীরা নির্মাতাদের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট একটি ক্যাম্পাসে থাকে। তা হলে টাবুন বাড়ি এল কী করে?"

"ঠিক বলেছ। টাবুন তো প্রায় মাসতিনেক বাড়ি ছাড়া। সেন্ট্রাল সরণির শিবম অ্যাপার্টমেন্টে থাকত অন্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে। ওখানে ওদের বাড়ির একজনও ছিল। মানে, সব প্রতিযোগীর অভিভাবকেরা থাকছেন প্রতিযোগীদের সঙ্গে। প্রতিযোগিতা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকার কথা ছিল। কিন্তু ওর দাদুর শরীর খারাপের জন্যই তো টাবুনের বাড়ি ফিরে আসা। টাবুনের বাবার অনেক অনুরোধে প্রতিযোগিতার নির্মাতারা একদিনের জন্য টাবুনকে ছেড়েছে। আজ ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল।"

"ব্যাপারটা তুই জানলি কী করে?" প্রশ্ন প্রতিভাসের।

"কাল বিকেলে টাবুনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারি সব। প্রায় ন'টা পর্যন্ত ওদের বাড়িতে ছিলাম। টাবুন ফেরেনি। কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আজ সকালেও ফোন করেছিলাম। ফেরেনি টাবুন।"

"হুঁ। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সত্যি গোলমেলে। টাবুনের বাবা থানায় খবর দিয়েছেন? জানিয়েছেন সুরলহরীর অনুষ্ঠানের নির্মাতাদের?"

"জানি না ছোটকা। ওদের বাড়ির সকলের মনের যা অবস্থা, কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি," ভেজা স্বর অঙ্কিতের।

"চল টাবুনদের বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি," ওঠার তোড়জোড় করে প্রতিভাস।

"সত্যি তুমি যাবে?" মেঘ সরে গিয়ে অঙ্কিতের চোখে-মুখে ঝলমলে রোদ্দুর।

"অফকোর্স। তোর গোমড়া মুখ দেখতে কি আমার ভাল লাগে?"

"তখন থেকে কাকা-ভাইপোয় কী গুজগুজ হচ্ছে?" অন্দর থেকে দেবারতি এসে দাঁড়িয়েছে ড্রইংরুমে।

"গুরুতর ঘটনা। বহুত ঝামেলাও," গম্ভীর কণ্ঠে বলে প্রতিভাস।

"মানে?"

প্রতিভাসের কাছ থেকে বিস্তারিত ঘটনা শুনে দেবারতি চমকে ওঠে, "ওমা সেকী! কী হবে তা হলে? ছেলেটা যে বড্ড ভাল গাইছিল গো!"

"কী হবে জানি না। আপাতত ওদের বাড়ি তো যাই। ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াঘাটা করি। তারপর বোঝা যাবে।"

গাড়ি থেকে নেমে মোরাম বিছানো পথ পেরিয়ে অঙ্কিতের সঙ্গে প্রতিভাস চলে এল সোজা বারান্দায়। ডান পাশের কোণের ঘরে একাধিক উত্তেজিত পুরুষকণ্ঠ। এবার গন্তব্য সেদিকে। পরদা তুলে ভিতরে ঢুকতেই চমক সুপর্ণ বিশ্বাসের।

॥ ২ ॥

দুধ সাদা মাঝারি দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামালেন প্রতিভাস। শহরের ঘিঞ্জি এলাকা থেকে কিছুটা দূরে বলেই হয়তো এখানকার পরিবেশে একটা চনমনে, তরতাজা ভাব। চারপাশ সবুজে-সবুজে ছয়লাপ। রুক্ষ, শুষ্ক প্রকৃতির বুকে টাটকা অক্সিজেনের অফুরন্ত ভাণ্ডার। আসার সময় সরীসৃপের মতো শুয়ে থাকা চকচকে রাস্তার দু'ধারে পরিকল্পনামাফিক দেবদারুর সারি নজর এড়ায়নি প্রতিভাসের। এমনকী, এ বাড়ির ফটকের দু'পাশে সদাহাস্যময় দু'খানা মাঝারি দেবদারু দুলে-দুলে ব্যস্ত অভ্যাগতের অভ্যর্থনায়।

খোলা ফটকের বাইরে একখানা পুলিশের জিপ, গোটাচারেক মোটরবাইক। অর্থাৎ থানার লোকের সঙ্গে আরও কেউ-কেউ বিষয়টি দেখছে। গাড়ি থেকে নেমে মোরাম বিছানো পথ পেরিয়ে অঙ্কিতের সঙ্গে প্রতিভাস চলে এল সোজা বারান্দায়। ডান পাশের কোণের ঘরে একাধিক উত্তেজিত পুরুষকণ্ঠ। এবার গন্তব্য সেদিকে। পরদা তুলে ভিতরে ঢুকতেই চমকে উঠলেন সুপর্ণ বিশ্বাস। লোকাল থানার ও সি। প্রতিভাসের অনেক কেসের সঙ্গী।

"আরে মিঃ মিত্র আপনি? হঠাৎ এখানে? এ যে মেঘ না চাইতেই জল।"

"হঠাৎ নয় মিঃ বিশ্বাস। ভাইপোর কাছ থেকে টাবুনের ব্যাপারটা শুনে চুপ করে থাকতে পারলাম না। তাই আসা।"

"খুব ভাল করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা আপনার ভাইপো কী করে জানল?" কপালে ভাঁজ পড়ল সুপর্ণ বিশ্বাসের।

"টাবুন আমার বন্ধু। বাড়ি এসেছে শুনে কাল দেখা করতে এসে সব জেনেছি," চটপট জবাব দিল অঙ্কিত।

"গুড। বাই দ্য ওয়ে, আপনার কথা ভাবছিলাম। না এলে যেতাম। এসে সময় কমিয়ে দিলেন। কাজের কথায় আসা যাক। হাতে সময় খুব কম। টাবুনকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ নিশ্চিন্ত নই," বলে সুপর্ণ বিশ্বাস টাবুনের বাবাকে বললেন, "আগে মিঃ মিত্রর পরিচয় জানা দরকার আপনাদের।"

পরিচয়পর্ব সেরে আবেগতাড়িত টাবুনের বাবা অভ্রনীল চট্টোপাধ্যায় প্রতিভাসের দু'হাত জড়িয়ে বললেন, "প্লিজ মিঃ মিত্র, টাবুনের জন্য কিছু করুন। সাধ্যমতো পারিশ্রমিক দেব।"

"পারিশ্রমিকের প্রসঙ্গ বাদ দিন মিঃ চ্যাটার্জি। আপাতত সমস্যার সমাধানই মূল লক্ষ্য। বাই দ্য বাই, মিঃ রায় আপনাদের প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুষ্ঠানটি কবে?" প্রতিভাসের দৃষ্টি পরিচালক শমীক রায়ের দিকে।

"পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সাতদিন পর। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সময়মতো অনুষ্ঠানটি করা যাবে কিনা সন্দেহ। ফাইনালের জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। অর্ক অনুপস্থিত। নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য কী করে তৈরি হবে?" হতাশা ঢেকে রাখতে পারেন না শমীক রায়।

"আহ্ শমীক! ওইসব চিন্তা বাদ দাও। ছেলেটাকে আগে খুঁজে বের করা দরকার। সে পর্ব চুকুক। তা ছাড়া অর্কর যা প্রতিভা বেশি ঘষামাজার দরকার হবে না," বলেন প্রযোজক ইন্দ্রজিৎ হালদার।

"ঠিক বলেছেন। এই মুহূর্তে অর্ককে খুঁজে বের করাই মুখ্য," পাশ থেকে মন্তব্য সায়ন দত্তর।

"রাইট, আমরা আমাদের মতো করে চেষ্টা তো করি। তারপর দেখা যাক। মিঃ চ্যাটার্জি, গতকাল ঘটনাটা ঠিক কখন ঘটেছিল?" প্রশ্ন করে প্রতিভাস।

"চারটে নাগাদ। বাবার একটা ওষুধের দরকার ছিল। আমিই যেতাম কিন্তু টাবুন নিজেই ছুটল ওষুধ আনতে। গলির মুখেই দোকান। আধঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। অথচ ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেলেও ছেলের দেখা নেই। ফোন করাতে দোকানের মালিক বাবুলাল জানায়, মিনিটচল্লিশ আগে টাবুন ওষুধ নিয়ে গিয়েছে। অথচ বাড়ি ফেরেনি। এখনও পর্যন্ত ছেলের কোনও খবর নেই। কী হবে, কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। টাবুনের মাকে সামলানো যাচ্ছে না। কান্নাকাটি তো করছেই, খাওয়াদাওয়াও প্রায় বন্ধ। বোন, ভগ্নীপতি কোনও রকমে সামলাচ্ছে ওকে। অন্য আত্মীয়স্বজনরাও চুপচাপ। মাকে কিছু জানানো হয়নি। খবরটা বাবার কানে গেলে কী হবে বুঝতেই পারছেন," থমথমে স্বর অভ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের।

"হুম। বড়ই জটিল সমস্যা। আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জি, এর আগে টাবুন এভাবে কখনও কোথাও কি চলে গিয়েছিল?"

"না, মিঃ মিত্র। আমাদের না জানিয়ে কোথাও যাওয়ার ছেলে টাবুন নয়।"

"এমনও তো হতে পারে স্বেচ্ছায় যায়নি। জোর করে টাবুনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে," আন্দাজে ঢিল ছোড়ে প্রতিভাস।

"মানে তুলে নিয়ে গিয়েছে? কিডন্যাপ?" উত্তেজিত অঙ্কিত।

"আহ্ অঙ্কু, আস্তে," চাপা ধমক প্রতিভাসের।

"দিনের আলোয় কিডন্যাপ! কী করে সম্ভব?" বিস্মিত সুপর্ণ।

"দিন-রাত, আলো-অন্ধকার এ সব কোনও ফ্যাক্টর নয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটে কারও ব্যক্তিগত মর্জিতে, এটা জানবেন মিঃ বিশ্বাস," অকপট হল প্রতিভাস।

"কিন্তু টাবুন তো ছোটটি নয়। জোর করে এমন ঘটনা ঘটলে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তো তার ছিল। তা ছাড়া বিকেল চারটেয় রাস্তায় ভিড় না থাকলেও লোক চলাচল থাকে। কারও না-কারও চোখে পড়তই ঘটনাটা। বাধা দিতই," অস্থির হয়ে বলেন শমীক।

"আপনার ধারণা অমূলক নয় মিঃ রায়। তবে সেরকম কিছু হয়তো ঘটেনি। মনে হয় পরিচিত কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তাই টাবুন নিশ্চিন্তে তার সঙ্গে গিয়েছে। যদিও এই মুহূর্তে সবই আমার অনুমান।"

"টাবুনকে কিডন্যাপ করে কার কী লাভ সেটাই তো বুঝতে পারছি না মিঃ মিত্র?" ক্লান্ত স্বর অভ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের।

"দেখুন মিঃ চ্যাটার্জি লাভ-ক্ষতি যাই হোক, ঘটনাটা ঘটেছে। সে যে বা যারাই করুক উদ্দেশ্যহীনভাবে করেনি। গভীর কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে এর পিছনে। গত তিন মাস যাবৎ শিবম অ্যাপার্টমেন্টে থাকাকালীন কিছু ঘটল না, অথচ বাড়ি আসামাত্র কেউ তাকে তুলে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা শুধু গোলমেলেই নয়, অত্যন্ত সন্দেহজনক। এ কাজ খুব পরিচিত কারও। টাবুনের প্রতিটি মুভমেন্ট সম্পর্কে যে ওয়াকিবহাল। আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জি, ইদানীংকালে আপনার সঙ্গে কারও কোনও রকম মনোমালিন্য হয়েছিল বা শত্রুতা?" ঘটনার গভীরে ঢুকতে চায় প্রতিভাস।

"না, মিঃ মিত্র। ইদানীং কেন, অতীতেও কারও সঙ্গে আমার কোনওদিন কোনও রকম মনোমালিন্য হয়নি। ওসব আমি এড়িয়ে চলি। আর শত্রুতা? না-না, কারও সঙ্গে গলাগলি বন্ধুত্ব না থাকলেও বিদ্বেষ নেই। কাজেই শত্রুতার কোনও প্রশ্নই আসছে না।"

"হুম। ঘটনা ঘটার পর পেরিয়েছে প্রায় আঠারো ঘণ্টা। এর মধ্যে কোনও উড়োফোন এসেছে মিঃ চ্যাটার্জি? মানে, এ সমস্ত ক্ষেত্রে যা হয় আর কী! মুক্তিপণের দাবি? বা তেমন কিছু?" উদ্বিগ্ন প্রতিভাস।

"না, মিঃ মিত্র, এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি।"

"টাবুনের নিজস্ব কোনও সেলফোন আছে মিঃ

চ্যাটার্জি?"

"আছে তো, নম্বর আমার মুখস্থ," চটজলদি নম্বর বলে অঙ্কিত।

"আর-একবার বল অঙ্কু। তড়বড় করিস না। ধীরে-ধীরে।"

অঙ্কিতের বলার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিভাস কাজ শুরু করে দেয়।

"হুঁ, রিং হচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছে না।"

"দাদা, টাবুনকে কেউ ফোন করছে," পরদা সরিয়ে মাঝতিরিশের এক যুবকের প্রবেশ।

"ফোন বাড়িতেই। দেখি একবার," প্রতিভাসের হাতে ফোন দিয়েই যুবক ভিতরে চলে যায়।

প্রতিভাস ব্যস্ত হয়ে পড়েন টাবুনের সেলফোন নিয়ে। কপালে ভাঁজ পড়ে।

"গতকাল বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ টাবুনের ফোনে একটা কল। তারপরেই তার বেরনো। দুইয়ের মধ্যে কোনও সংযোগ আছে কি? সময়ের সাহায্য ছাড়া উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। মিঃ বিশ্বাস এই নম্বরে যোগাযোগ করুন তো একবার।"

পাঁচ মিনিট পর সুপর্ণ বিশ্বাস আর প্রতিভাস ওই বাড়ির বারান্দায়।

"এ তো স্থানীয় একটা পি সি ও-র নম্বর মিঃ মিত্র," সামান্য অবাক হলেন সুপর্ণ বিশ্বাস।

"পি সি ও থেকে টাবুনকে কে ফোন করবে?" বিস্ময় অভনীলের।

"এত অবাক হওয়ার কী আছে! হয়তো কোনও অনুরাগী," শান্ত স্বর প্রতিভাসের।

"তা কী করে সম্ভব? কোনও প্রতিযোগীর ব্যক্তিগত ফোননম্বর আমরা বাইরে বের করিনি। তা ছাড়া প্রতিযোগিতা চলাকালীন বাবা-মা ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলার অনুমতি নেই। আর অর্কপ্রভর ফোন তো আমার কাছেই থাকত," বলেন শমীক রায়।

"আরে! এ নিয়ে এত কথার কী আছে? সময়ে সব জানা যাবে। এই মুহূর্তে মূল সমস্যায় আসা দরকার। না হলে কিনারায় পৌঁছনো সম্ভব নয়। কিপ পেশেন্স," ধীর কণ্ঠ প্রতিভাসের।

॥ ৩ ॥

ঘুমের রেশ কাটছে টাবুনের ধীরে-ধীরে। চোখ খুলতে চারপাশে ঘোর অন্ধকার। একটু-একটু করে সয়ে যেতে বুঝতে পারে, সরু ছোট্ট একখানা কামরায় সে শুয়ে। দিন না-রাত, সকাল না-সন্ধে, কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘরের একমাত্র দরজা আর জানলায় ভারী পরদা। সারা শরীরে যন্ত্রণা। মাথা অসম্ভব ভার। ধীরে-ধীরে ঘটনাগুলো মনে পড়ছে। দাদুর ওষুধ আনতে গলির মুখের দোকানে গিয়েছিল। ওষুধ কিনে বেরতেই দোকানের উলটো দিকের ফুটপাথে দেখা শিবম অ্যাপার্টমেন্টের সিকিউরিটি গার্ড পবনদার সঙ্গে। এই দেখা হওয়ার ব্যাপারটা ফোনে আগেই জানানো ছিল। এগিয়ে কথা বলতে-বলতে বাড়ির উলটো পথে হাঁটা শুরু করে টাবুন। খানিক এগোতেই বিপত্তি। এক ধাক্কায় পবনদাকে রাস্তায় ফেলে তিন-চারজন লোক দুরন্ত গতিতে ওকে নিয়ে সোজা একখানা সাদা মারুতি ভ্যানে তোলে। বাধা দেওয়ার সময়, সুযোগ কোনওটাই পায়নি সে। কালো কাপড়ে ঢাকা থাকায় চোখ ছাড়া লোকগুলোর মুখ দেখতে পায়নি সে। পলকে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধের রুমালখানা নাকে চেপে ধরল দু'জন। নিমেষে চোখের সামনে কালো পরদা। জ্ঞান হারাল টাবুন। আর কিছুটি মনে নেই।

উঠে বসল টাবুন। মাথার কাছের ছোট টেবিলে একখানা জলের বোতল। তেষ্টাও পেয়েছে খুব। কয়েক ঢোক জল গলায় ঢালতে খানিক সুস্থবোধ করল সে। ওষুধ নিয়ে যেতে পারেনি। তা হলে দাদু কেমন আছেন কে জানে। দু'চোখ জলে টইটম্বুর। দাদুকে দেখতে পাবে তো?

এক ধাক্কায় পবনদাকে রাস্তায় ফেলে তিন-চারজন লোক দুরন্ত গতিতে ওকে নিয়ে সোজা একখানা সাদা মারুতি ভ্যানে তোলে। বাধা দেওয়ার সময়, সুযোগ কোনওটাই পায়নি সে। কালো কাপড়ে ঢাকা থাকায় চোখ ছাড়া লোকগুলোর মুখ দেখতে পায়নি সে।

প্রায় ছুটে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে-দিতে চিৎকার করে টাবুন, "কে আছো? দরজা খোলো, দরজা খোলো।"

দরজা খোলা মাত্র এক মুঠো টাটকা বাতাসের সঙ্গে এক ঝলক আবছা আলো ঝাঁকিয়ে ঘরে ঢোকে। তার মানে চারপাশে এখনও দিন। ঘোমটা মাথায় মাঝবয়সি এক নারীমূর্তির ধীর পায়ে প্রবেশ। হাতে ফাইবারের ডিশে মাখন লাগানো চার পিস পাউরুটি আর ডিমসেদ্ধ। সঙ্গে এক কাপ চা। টেবিলে ওগুলো নামিয়ে মুখ খোলে নারীমূর্তি, "এই তো ঘুম ভেঙেছে খোকাবাবুর। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। আগে খাও। পরে কথা।"

চেঁচায় টাবুন, "না খাব না। কে তুমি? এখানে কেন এনেছ আমায়? শিগগিরি বাড়ি পৌঁছে দাও। দাদুর যে খুব অসুখ।"

"আস্তে খোকা, আস্তে। আমি লতিকা। একদম জোরে চেঁচিও না। অন্যরা শুনতে পাবে। ওদিকের ঘরে চারজন তাস খেলছে। চুপচাপ খেয়ে নাও।"

অবাক টাবুন, "কোথায় আমি?"

"বলতে পারব না। তবে কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে এ জায়গাটা।"

টাবুনের গলার কাছে একদলা কান্না। এরা কারা? কেন

তাকে এখানে তুলে এনেছে? তবে কি নিজের প্রিয়জনদের আর কোনওদিনই দেখতে পাবে না সে? কেঁদে ফেলে টাবুন।

লতিকা সস্নেহে বলে, "কেঁদো না খোকাবাবু। মন খারাপ কোরো না। খেয়ে নাও। না খেলে মনে জোর পাবে না।"

খিদে পেলেও খাওয়ার ইচ্ছা হল না টাবুনের। লতিকার জোরাজুরিতে খেতে হল।

"কাল এসে ইস্তক আজ বিকেল পর্যন্ত তুমি ঘুমোচ্ছিলে। এত সময় খালিপেট। শরীর খারাপ হবে।"

চমকে উঠল টাবুন। চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। অথচ কিছুটি বুঝতে পারেনি। হা ভগবান!

মা-বাবার কী অবস্থা কে জানে! একে দাদু অসুস্থ তায় তাঁর খোঁজ নেই। কী নিদারুণ আতান্তরে পড়েছে সবাই। এতক্ষণে হয়তো থানা-পুলিশ শুরু হয়েছে। কিন্তু পুলিশ যদি তার কোনও সন্ধান না পায় কী হবে? একবার যদি কোনওভাবে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত! তাড়াহুড়োয় বেরনোর সময় সেলফোনটাও আনতে পারেনি। কী আফসোস! কী আফসোস!

"এখানে আমায় কেন ধরে এনেছে তুমি জান মাসি? কারাই বা এরা?"

"চার-পাঁচজন ছোকরা এনেছে। কেন জানি না।"

"এখানে থাকো অথচ জায়গাটার নাম জান না, তা কি করে হয়? মিথ্যে বলছ। তুমিও এদের লোক।"

"না খোকা, আমি এখানে থাকি না। বাবুর বাড়ি থেকে এ ছোকরাগুলো কাল আমায় তুলে এনেছে। তোমার দেখভালের জন্য।"

"জোর করে তুলে এরা আমায় ধরে রেখেছে। সবাই খারাপ লোক। এরা বাবুর বাড়িতে ঢুকল কী করে?"

"যে বাড়িতে কাজ করি তারা বহুত পয়সাওয়ালা। আমায় নিয়ে পাঁচজন কাজের লোক। বাবুর বড় ছেলের সঙ্গে এই ছোকরাগুলোর বহুত দোস্তি। কি সন্ধেয় বাড়িতে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া। পরশু সন্ধেয় মালকিনকে এক ছোকরা বলে দিনসাতেকের জন্য চেনাজানা একজন কাজের লোক দরকার। মালকিন আমায় ছেড়ে দিল। সত্যি জানি না ওরা তোমায় এখানে কেন এনেছে," দম দেওয়া পুতুলের মতো বলে গেল লতিকা।

চমকাল টাবুন। সাতদিনের চুক্তিতে লতিকা এখানে। অর্থাৎ টাবুনের এখানে থাকার মেয়াদ সাতদিন। কিন্তু সাতদিন কেন? এই ক'টা দিন লোকগুলো তাকে নিয়ে কী করবে? সাতদিন পর তার কী হাল হবে? আচমকা মস্তিষ্কে তীব্র আলোড়ন উঠল তার। তাকে ধরে রেখে বাবার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে না তো? চারপাশে এমন ঘটনা হামেশা ঘটছে। অপহরণ করে বিশাল অঙ্কের টাকার চাপ। না পেলে মৃত্যুর ফরমান। কিন্তু বাবা অত টাকা পাবেন কোত্থেকে? অসুস্থ দাদুকে সামলাতেই নাজেহাল। দু'-পাঁচ টাকা তো নয়, দাবি হাজারে, লাখে। টাকা না পেলে তারও তো বাঁচার আশা নেই।

মনে থইথই উদ্বেগ। আতঙ্কের চোরাস্রোত। বাবা-মাকে আর কোনওদিন দেখতে পাবে না? দাদু-ঠাকুরমাকেও নয়। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে টাবুন।

॥ ৪ ॥

ভোররাত থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। পূর্বাভাস বেশ আরও বাড়বে। চলবে কম করে দিনচারেক। ভেজা ঠান্ডার আমেজে প্রতিভাসের ভেঙে যাওয়া ঘুমে নতুন আঁটোসাঁটো বাঁধন। কিন্তু কপাল মন্দ। খানিক পরেই ফোনের গুঁতো। বিরক্তির চেয়ে মনে চোরা উদ্বেগ। দিনের আলো ফুটতে না-ফুটতে কার ফোন? অতীনবাবুর নয় তো? টাবুনের খবর? ফিরে এসেছে ছেলেটা?

দ্রুত বিছানা ছাড়ে প্রতিভাস।

"ইয়েস মিঃ বিশ্বাস, এমন অসময়ে? ডেডবডি? কার? মাই গড! এখন আপনি কোথায়? ওকে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাচ্ছি।"

ঘড়ির কাঁটা সবে পাঁচটায়। দিনের আলো এখনও তেমন পরিষ্কারই নয়। হলে কী হবে বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে সাতসকালেই শিবম অ্যাপার্টমেন্টের সামনের চত্বর ভিড়ে ভিড়াক্কার। এধার-ওধার ছড়ানো-ছিটানো দ্বীপের মতো সাধারণ মানুষের জটলা। পরিচিত বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ব্যস্ত আলোচনায়। সকলের নজর এড়িয়ে প্রতিভাস কোনও রকমে অ্যাপার্টমেন্টের হলঘরে পৌঁছয়।

লোকজন থাকলেও থমথমে পরিবেশ। এক কোণে সোফায় ঘাড় নিচু করে বসে আছেন সুপর্ণ বিশ্বাস। পাশে শমীক রায়, ইন্দ্রজিৎ হালদার। উদ্‌ভ্রান্ত, বিধ্বস্ত। চোখমুখে শঙ্কার মেঘ। পায়ের শব্দে ঘাড় তুলে প্রতিভাসকে দেখেও নীরব সুপর্ণ। খানিক দূরে জনাপাঁচেক যুবক ব্যস্ত চাপা আলোচনায়। রিসেপশনের মেয়েটি ব্যস্ত। নাকি ব্যস্ততার ভান কে জানে। দৃষ্টি এদিকেই।

"ব্যাপারটা খোলসা করে বলুন তো মিঃ বিশ্বাস," নীরবতা ভাঙেন প্রতিভাস।

"সেভাবে বলার কিছু নেই। একটা পার্টি অ্যাটেন্ড করে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে রাত প্রায় দুটো। শুতে যাওয়ার মুখে পশুপতির ফোন। তড়িঘড়ি এসে এই সাঙ্ঘাতিক ঘটনার মুখোমুখি," জানান শমীক রায়।

"পশুপতি কে?" প্রশ্ন করে প্রতিভাস।

"পশুপতি ঘোষ। এই অ্যাপার্টমেন্টের ম্যানেজার।"

"হুম। তা বডি প্রথম কে দেখে? পশুপতিবাবু?"

"না স্থানীয় এক যুবক। কাছাকাছি থাকে। বাড়ি ফিরছিল। পবনকে চেনে। ওভাবে ওকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে খবর দেয় পশুপতিকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বারকয়েক ডাকাডাকিতেও পবনের কোনও সাড়া না পেয়ে জানায় মিঃ বিশ্বাসকে। উনি এসে সব দেখেশুনে জানান পবন মৃত," ঝড়ের গতিতে বিস্তারিত জানিয়ে দম ফেলেন শমীক।

"আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন মিঃ মিত্র, পবনের দেহে কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। কোনও রক্তপাত ঘটেনি। বেকায়দায় যে মুখ থুবড়ে পড়েছে তাও নয়। যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। অথচ মৃত। এ কেমন করে সম্ভব?

আপাতত বডি ফরেনসিকে। অপেক্ষা করতে হবে পি এম রিপোর্টের জন্য," জানান সুপর্ণ। এখন খানিকটা ধাতস্থ তিনি।

"অ্যাপার্টমেন্টের মালিককে খবর না দিয়ে পশুপতিবাবু আপনাকে জানাল কেন মিঃ রায়?" প্রতিভাসের কপালে ভাঁজ পড়ল।

"মালিক মানে জয়জিৎ? সে তো এখন পুণেতে ব্যবসার কাজে। দিনপনেরোর জন্য গিয়েছেন। এ ক'টা দিনের জন্য অ্যাপার্টমেন্টের যাবতীয় দায়িত্ব আমায় দিয়ে গিয়েছেন।"

"বুঝলাম। পশুপতিবাবু কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?" চারপাশে চঞ্চল দৃষ্টি প্রতিভাসের।

"এই সময়টা পশুপতিবাবু খুব ব্যস্ত। সুরলহরীর প্রতিযোগীদের প্রাতঃকালীন দেখভালের দায়িত্ব তো ওরই। ঘুম ভাঙানো, ব্যায়ামের প্রস্তুতি, রেওয়াজে পাঠানো এইসব," সাফাই গান ইন্দ্রজিৎ হালদার।

"তার মানে পশুপতিবাবু এই অ্যাপার্টমেন্টেই থাকেন?"

"তা একরকম বলতে পারেন। তবে সাময়িক। প্রতিযোগিতা চলাকালীন এই ব্যবস্থা। শেষ হলে বাড়ি যাওয়ায় কোনও বাধা নেই।"

"পবন সিংহ কোথায় থাকত?"

"অ্যাপার্টমেন্টের পিছনে ওর নির্দিষ্ট ঘর।"

"মানে এই ক্যাম্পাসেই। তা ক্যাম্পাসেই যদি থাকত তা হলে বাইরে বেরিয়েছিল কেন? বিশেষত ডিউটির সময়?"

"পরশু দুপুরে বাড়ি থেকে পবনের এক আত্মীয়ের আসার কথা ছিল। তাই ছুটি নিয়েছিল। বেরিয়েছিল পরশু দুপুর একটায়। ফেরার কথা গতকাল সকালে। কিন্তু বিকেল পেরিয়েও না ফেরায় ওর মোবাইলে যোগাযোগ করি বেশ কয়েকবার। কোনও সাড়া পাইনি। সুইচ্‌ড অফ ছিল। তারপর তো এই অঘটন। ছেলেটার এমন পরিণতি ভাবতে পারছি না স্যার," অপরিচিত এক পুরুষকণ্ঠ জানাল।

ঝটিতি পিছনে ফেরে প্রতিভাস। সামনে বছরতিরিশের দোহারা চেহারার ভীত, সন্ত্রস্ত এক পুরুষ। উসকোখুসকো চুল। চোখ-মুখ ফ্যাকাসে। জড়সড় এক প্রতিকৃতি।

"আপনি?" স্থির দৃষ্টি প্রতিভাসের।

"আজ্ঞে পশুপতি ঘোষ," ঢোক গিলে কোনও রকমে উত্তর দেয় অপরিচিত পুরুষটি।

"পবনের ছুটি নেওয়ার কথা জানাওনি কেন?" কঠোর গলায় জানতে চান শমীক রায়।

"আপনি ব্যস্ত মানুষ। তাই এই সামান্য ব্যাপারে বিরক্ত করতে চাইনি স্যার," ইতস্তত পশুপতির নিস্তেজ কণ্ঠ।

"প্রতিযোগিতা চলাকালীন এখানকার কর্মীদের যে বাইরে যাওয়া বন্ধ। তা হলে?"

"সরাসরি যারা যুক্ত তারা বাদে অন্যরা প্রয়োজনে বেরতে পারে," জানান শমীক।

"এ আবার কেমন নিয়ম! যাকগে বাদ দিন। ওসব আপনাদের ব্যাপার। আসল কথায় আসছি, যে আত্মীয়দের আসার কথা ছিল তারা আগে কখনও এসেছিল?"

"না স্যার, এর আগে পবন কোনওদিন ছুটি নিয়ে বাইরেও যায়নি। প্রথমবার বলে তাই আপত্তি করিনি।"

"কবে নাগাদ পবন এখানে ঢুকেছিল?"

"প্রায় বছরখানেক আগে।"

"এর মধ্যে একবারও ছুটি নেয়নি, বাইরেও যায়নি। আশ্চর্য!"

"কাছাকাছি দোকানটোকানে গেলেও অনেকদিনের ছুটি নিয়ে বাইরে থাকেনি।"

"ওর বাড়ির লোকজনও এখানে কখনও আসেনি?"

"না স্যার।"

"হুম, চলুন তো পবনের ঘরটা একবার দেখি।"

তালা ভেঙে ঘরে ঢুকতে ভ্যাপসা গন্ধ আর গুমট। জানলা খুলতে স্বস্তি। ঠান্ডা বাতাস আর হাওয়ার চলাচল।

দশ বাই বারোর ঘরখানার গোছানোর পারিপাট্য না থাকলেও অগোছালো নয়। সাদামাটা ঘরের মাঝবরাবর নিভাঁজ বিছানার এক ধারে পরিচ্ছন্ন একখানা বালিশ। দেওয়ালে টাঙানো দড়িতে পরনের জামাকাপড়, গামছা, লুঙ্গিও সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্নভাবে রাখা। ডান ধারের টেবিলে মামুলি কিছু প্রসাধনী। সাধারণ রোগযন্ত্রণার কিছু ওষুধের অর্ধব্যবহৃত গোটাকয়েক পাতা। কাছাকাছি সময়ের বাংলা নামী দৈনিকের এক তাড়া বান্ডিল। টেবিলের মাঝের বাদামি বাঁধাই নোটবুকখানা নেড়েচেড়ে স্বস্থানে রাখে প্রতিভাস। তেমন কিছু নেই। মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসেব ঠাসা।

প্রতিভাস দেখছে। দৃষ্টি ছুটছে ঘরের এমাথা ওমাথা। উপর নীচ। আচমকা থমকে দাঁড়াল।

"পশুপতিবাবু টেবিলের তলা থেকে সুটকেসটা বের করুন তো।"

"হ্যাঁ, স্যার এই যে," পলকে প্রতিভাসের হুকুম তামিলে তৎপর পশুপতি।

প্রতিভাসের নির্দেশে সুটকেস হাঁটকানো শুরু সুপর্ণের। ধোপদুরস্ত কয়েকপ্রস্থ জামাকাপড়, একখানা নিভাঁজ বিছানার চাদর, খানকতক শীতের পোশাক, একটা পেটমোটা ফাইল। সব একে-একে বিছানায়। একদম তলায় একখানা মাঝারি কাগজের মোড়ক। কষে বাঁধা।

খুলতে জোর চমক। পাঁচখানা একশো টাকার নোটের বান্ডিল। নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের তকমা আঁটা। ঝকঝকে তকতকে, যেন ছাপাখানা থেকে সদ্য বেরিয়েছে।

"মাই গড, এত বান্ডিল! এ যে অনেক টাকা। পবনের কাছে এল কোত্থেকে?" বিস্মিত প্রতিভাস। উত্তেজিতও। অন্য সকলেরও একই অবস্থা।

"বলতে পারব না স্যার," অজানা আশঙ্কায় পশুপতির মুখ নিমেষে রক্তশূন্য।

"সেটাই স্বাভাবিক। বান্ডিলগুলোর নিশ্চিত কোনও গোপন গপ্পো আছে। আচ্ছা পশুপতিবাবু, ইদানীংকালের

মধ্যে পবনের সঙ্গে কি কারও বিশেষ ভাবসাব হয়েছিল? নির্দিষ্ট কারও সঙ্গে বেশি মেলামেশা দীর্ঘ সময় কাটানো? তেমন কিছু?"

"সে রকম কিছু চোখে পড়েনি। এমনিতে মিশুকে ছিল পবন। সবার সঙ্গে মেলামেশা করত। মন খুলে কথা বলত। জোসিলের সঙ্গে তো আবার বেশি ভাব-ভালবাসা ছিল। জোসিয়া ওকে পছন্দ করত। গানের ছেলেমেয়েরা মাঝে-মাঝে ওকে পাকড়ে গল্পের আসর বসাত।"

"মিঃ বিশ্বাস, দেখুন তো ব্যাঙ্কের কোনও বইটই আছে নাকি।"

আঁতিপাতি খোঁজাই সার। হদিশ নেই কোনও ব্যাঙ্কের বইয়ের।

"একবার ফাইলখানা দেখি," হাত বাড়িয়ে দেয় প্রতিভাস।

সামান্য খোঁজেই মেলে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান। ব্যাঙ্কের পাস বই। হাবিজাবি কাগজে চাপা। যদিও চমক লাগানো কোনও খবর নেই। প্রতি মাসে মাসোহারা বাবদ প্রাপ্য অর্থের ঢোকা আর প্রয়োজনে বেরনোর ইতিবৃত্ত। জমার ঘরে বিশাল কোনও অঙ্কের পুঁজি নেই বইয়ে। সেটাই স্বাভাবিক। একজন সিকিউরিটি গার্ডের মাসমাইনে আর কত? খরচখরচা বাদ দিয়ে ক'টা টাকাই বা জমে? তার মানে পবনের পাসবই থেকে টাকাগুলো বেরয়নি। কেউ দিয়েছে। অপ্রয়োজনে নিশ্চয়ই নয়। বিশেষ কোনও কাজে কি? একটা খটকা। রহস্যের কেমন একটা সোঁদা গন্ধ। মোড়কের কাগজে তীক্ষ্ণ নজর প্রতিভাসের। নিনসাতেক আগের নামী হিন্দি দৈনিকের ভিতরের পাতা। অর্থাৎ কাছাকাছি সময়ে টাকার লেনদেন হয়েছে।

"না স্যার। পবনের বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়ায়। ঠিকানা বলেনি। যোগাযোগের কোনও নম্বরও দেয়নি। আমাদের চাহিদামতো স্থানীয় একটি সিকিউরিটি সংস্থা ওকে এখানে পাঠিয়েছিল। ওদের কাছে পবনের বিস্তারিত কথা হয়ে থাকতে পারে," সাফাই পশুপতির।

"আশ্চর্য! সংস্থা রাখলেও ওর যাবতীয় ডিটেল্‌স আপনাদেরও রাখা উচিত ছিল। যাক যা হওয়ার তা হয়েছে। আপাতত ওই সংস্থার ঠিকানা আর কনট্যাক্ট নম্বর দিন।"

প্রায় ঘণ্টাতিনেকের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ সেরে প্রতিভাস এখন সুপর্ণর অফিসে। সঙ্গে শমীক রায়, ইন্দ্রজিৎ হালদার। ভাবনা নয়, ঘটনার গভীরে পৌঁছতে চাইছে প্রতিভাস। চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন। আড়চোখে দেখে সুপর্ণ মন দিলেন ফাইলে।

ভোররাত থেকে শুরু হওয়া ঝামেলার রেশ চলছেই। থানা-পুলিশের হ্যাপা। মিডিয়ার কৌতূহল। পরিস্থিতি এখনও স্থিতিশীল নয়। সেজার মুখে ইন্দ্রজিৎ হালদারের শূন্য দৃষ্টি সামনে। ঘটনার ঘনঘটায় নাজেহাল শমীক রায়ও। মনে তীব্র তোলপাড়। সুরলহরীর মূল কর্ণধার হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পুরোটাই। নির্ধারিত সময়সূচির সার্থক রূপায়ণ না হলে অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত স্পনসরদের কেউ তাঁকে ছেড়ে কথা বলবে না। হাতে বেশি সময় নেই। এখনও পর্যন্ত অর্কর কোনও খবর নেই। আসল ঘটনা চেপে দাদুর অসুস্থতার দোহাই দিয়ে আপাতত ছেলেটার অনুপস্থিতির সাফাই দিলেও সন্তুষ্ট নয় কেউ। রেওয়াজের গাফিলতিতে বিরক্ত বিচারকবৃন্দ। অ্যাপার্টমেন্টে প্রতিযোগীদের সঙ্গে থাকা অভিভাবকদের মনে চাপা অসন্তোষ। কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপারটি নিয়ে সকলেই ক্ষোভে ফুটছে। অর্কপ্রভর উধাও হওয়া কোনওভাবেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জানাজানি হলে চারপাশে হইচই পড়ে যাবে। তা ছাড়া সুরক্ষার দোহাই দিয়ে বাকি প্রতিযোগীদেরও ক্যাম্পাস ছাড়তে কতক্ষণ? এই মুহূর্তে পরিস্থিতির স্রোতে অসহায় আত্মসমর্পণ-করা ছাড়া তাঁর করণীয় কিছু নেই। এক সমস্যার সমাধান হতে না-হতে পবনকে নিয়ে অন্য এক জটিলতা। অন্য রকম রহস্য। এ সবের শেষ কোথায় কে জানে!

অর্কপ্রভর উধাও হওয়া কোনওভাবেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জানাজানি হলে চারপাশে হইচই পড়ে যাবে। তা ছাড়া সুরক্ষার দোহাই দিয়ে বাকি প্রতিযোগীদেরও ক্যাম্পাস ছাড়তে কতক্ষণ।

"স্যার, ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের মিঃ রায় এটা দিয়ে গেলেন," হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে সেকেন্ড অফিসার রজত নাথ সাদা একখানা খাম দিল সুপর্ণর হাতে।

দ্রুত ভিতরের কাগজে চোখ বুলিয়ে সুপর্ণর কপালে ভাঁজ। নিমেষে কাগজখানার হস্তান্তর প্রতিভাসের কাছে। সেই তরফেও ভুরুর ওঠানামা।

"স্ট্রেঞ্জ! পশুপতিবাবুর কথা অনুযায়ী পবন কোনও নেশা করত না। তা হলে ছোকরার পেটে অত নেশার বস্তু ঢুকল কী করে? সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ।"

"কী বলছেন মিঃ মিত্র?" চমক শমীক রায়ের।

"আমি নই। পি এম রিপোর্ট বলছে নেশার বস্তু আর মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খাওয়াই পবনের মৃত্যুর কারণ।"

"কী করে সম্ভব? পশুপতি ভুল তো কিছু বলেনি। শুধু আমরা নই, অ্যাপার্টমেন্টের সকলে জানে পবন নেশা করে না। তেমনটা হলে পবনের চাকরি কবেই নট হয়ে যেত।"

"আপনি হয়তো ঠিক বলছেন। তার মানে পবনকে জোর করে কেউ নেশার জিনিস আর ঘুমের ওষুধ গিলিয়েছে। গোটা ঘটনাটা পূর্ব পরিকল্পিত। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেউ এমনটি করেছে। আমি নিশ্চিত পবনকে হত্যাই করা হয়েছে," মন্তব্য প্রতিভাসের।

"হত্যা? পবনকে? কেন?" বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝদরিয়ায় এসে পড়েন শমীক। বোকা বনেছেন সুপর্ণ। ইন্দ্রজিৎ বাক্যহীন।

"কেন-র উত্তর হত্যাকারী ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। আপাতত সময়ের স্রোতে গা ভাসানো আর তদন্ত ছাড়া কিছু করার নেই। বাই দ্য বাই এবার ওঠা দরকার। বেলা অনেকটাই গড়িয়েছে। প্রায় এগারোটা। হাতে সময় কম। বাকি অনেক কাজ। তাড়াতাড়ি সারা দরকার। চলুন মিঃ বিশ্বাস, এগনো যাক," চেয়ার ছাড়ে প্রতিভাস।

"পবনের হত্যার ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত মিঃ মিত্র?" প্রশ্ন ইন্দ্রজিৎ হালদারের।

"কিছুটা। ঘটনাবিন্যাস তেমনটাই ভাবতে বাধ্য করছে। তার জন্য অবশ্য পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তবে আগে টাবুনের ব্যাপারটির হেস্তনেস্ত। পরে পবনের ভাবনা।"

॥ ৫ ॥

কেটে গিয়েছে তিন-তিনটে দিন। তদন্তের গতিপ্রকৃতি এখনও অজানা। এগোচ্ছে না থমকে দাঁড়িয়ে বোধগম্য নয় অঙ্কিতের কাছে। যে-কোনও প্রশ্নেই ছোটকার মুখে কুলুপ। অথচ হাত গুটিয়ে যে বসে, তাও নয়। যখনই চোখে পড়েছে, কানে এসেছে মোবাইলে বকরবকর। কালিমার রিপোর্ট যখন, তখন নাকি বেরিয়েও যাচ্ছে। তার মানে কিছু একটা করছে ছোটকা। কিন্তু বলছে না, বা বলতে চাইছে না। কেন? অঙ্কিতের প্রতি বিরূপ? সে তো কিছু করেনি। তা হলে ছোটকার এমন আচরণ কেন? নাহ্ আজ পাকড়াতেই হবে ছোটকাকে।

ঘড়ির কাঁটা আটটায়। প্রতিভাস বেরবেন বলে প্রস্তুত। বাইরের পোশাকে সোজা জলখাবারের টেবিলে এসে বসেছেন। আচমকা হুড়মুড়িয়ে ঢুকল অঙ্কিত।

"আরে, অঙ্কু যে! এত সকালে? খবর সব ঠিকঠাক তো?"

"আমার খবরে তোমার কী? বেশ তো আছ নিজের মতো," অভিমান অঙ্কিতের।

"বুঝেছি। রাগ হয়েছে বাবুর," চাপা হাসি প্রতিভাসের।

"হওয়ারই তো কথা। কাল সারা সঙ্গে থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য মুখিয়ে ছিল ছেলেটা, অথচ কথা বললে না। স্টাডিতে ঢুকে বসে রইলে। এ তোমার কেমন ব্যবহার?" বিরক্তি সেবাব্রতির।

"সরি অঙ্কু। রাগ করিস না রে। টাবুনের ব্যাপারটা নিয়ে বড্ড ডিসটার্বড। যেন একটা গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছি।

সময় একটু লাগছে বটে, তবে চিন্তা করিস না। শক্তযো পৌঁছবই," আশ্বাস দেন প্রতিভাস।

"তার মানে তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ ছোটকা?" অঙ্কিতের সারা মুখ উত্তেজনায় চকচকে।

"উঁহুঁ। এখন কোনও কথা নয়। আগে টাবুনকে ফিরিয়ে আনি। তারপর গপ্পো। সকলকে নিয়ে সেলিব্রেশন," নরম স্বর প্রতিভাসের।

আচমকা ল্যান্ডফোনে ঝনঝন। রিসিভার দেবারতির হাতে। ও প্রান্তে সুপর্ণ বিশ্বাস. "গুড মর্নিং, মিঃ মিত্র আছেন?"

"আছেন। ধরুন দিচ্ছি।"

রিসিভার প্রতিভাসের হাতে চালান করে দেবারতি সটান রান্নাঘরে। সুপর্ণর ফোন মানে বেরনোর তাগাদা। রিসিভার রাখামাত্র প্রতিভাসের তাড়াহুড়োর শুরু।

টোস্ট চিবোতে-চিবোতে প্রতিভাস বললেন, "হ্যাঁ রে অঙ্কু, টাবুনের ভ্যানিশের ব্যাপারটা তুই ছাড়া আর কে-কে জানে? মানে, তোর বন্ধুরা বা অন্য কেউ?"

"কেউ জানে না। সেদিন আমি একা গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি। ঘটনাটা জানার পর কিছু আন্দাজ করেছিলাম। চুপচাপই ছিলাম। বন্ধুরা জানে না কেউ। ওরা জানেই না যে টাবুন বাড়ি এসেছিল।"

"গুড। ফয়সলা না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপই থাক। এক কাজ কর। আজ এখানে থেকে যা। কাজগুলো সেরে আসি। সন্ধ্যায় জমিয়ে গপ্পো হবে। দেবারতি, দুপুরে আসা হবে না। আমার জন্য ওয়েট কোরো না। খেয়ে নিও তোমরা।"

গাড়ি ছুটছে সাবলীল ছন্দে। তপন পাকা ড্রাইভার। ভিড়ভাট্টা কাটিয়ে মসৃণ গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সিটের নরম গদিতে বসে চোখ বুজে ভাবছেন প্রতিভাস। ভাবনার গভীরে ডুবছেন। কেন টাবুনকে অপহরণ করা হল, এখনও বোধগম্য নয়। টাকার দাবি করে এখনও পর্যন্ত কোনও ফোন নেই। এর একটাই অর্থ, টাকার জন্য এই অপহরণ নয়। তা হলে কীসের জন্য? প্রতিভাসের মন বলছে খুব কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে অপহরণ কাণ্ডের নায়ক। মনে দোলাচল। ভাবনায় কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

"স্যার পৌঁছে গিয়েছি," ব্রেক কষল তপন।

পলকে কালো কাচের জানলা দিয়ে প্রতিভাসের দৃষ্টি বাইরে। বাঁ পাশের ফুটপাথ ঘেঁষা পাবলিক বুথ 'কানেক্টর'। মনে হয় খানিক আগে খুলেছে। বছরকুড়ির এক ছোকরা ধূপ নিয়ে ব্যস্ত। গতকাল একে চোখে পড়েনি। কাউন্টার ফাঁকা। মালিক নজরে আসছে না। হয়তো এখনও আসেনি।

মুহূর্তে মোবাইলে ডাক। বোতাম টিপল প্রতিভাস, "হ্যাঁ, বলুন মিঃ বিশ্বাস। পৌঁছেছি। পিছনেই আছেন? ওকে। না মালিক এখনও ঢোকেনি। আরে, ওই তো আসছে। হ্যাঁ, ঢুকে গিয়েছে। এক্ষুনি নয়। একটু দম নিক ব্যাটা। মিনিটপাঁচেক পর ঢুকছি। সময়মতো চলে আসবেন। বাই।"

ওদিকে বুথে ঢুকে ভিতরের ঘর থেকে রেজিস্টার খাতা দুটো নিয়ে বুথের মালিক শিশির সোজা কাউন্টারে।

"হ্যাঁরে কমল, কালকের ডি টি পি-গুলো সব কমপ্লিট তো?" সামান্য গলা তোলে শিশির।

কমল দরজার মুখে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছিল। নিমেষে উত্তর দিল, "কমপ্লিট। দাদা একটা কথা বলার ছিল।"

"বলে ফ্যাল।"

"ওই সবুজ গাড়িটা কিছুক্ষণ থেকেই দোকানের সামনে। জানলায় কালো কাচ। ভিতরের লোক দেখা যাচ্ছে না। খানিক আগে একটা পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়াল গাড়িটার পিছনে। কী ব্যাপার বলুন তো?" চাপা গলা কমলের।

বুথে ঢোকার সময় শিশিরও ব্যাপারটা লক্ষ করেছে। জনবহুল না হলেও নতুন বাজার এলাকায় বসতি কম নয়। যথেষ্ট দোকানপাটও আছে। কোথাও কোনও গন্ডগোল হয়েছে বলে তো মনে হত না। আসার পথে তেমন কোনও বিশৃঙ্খলাও চোখে পড়েনি। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল। কেউ কিছু বলল না। তা হলে?

বাইরের লোক ভিতরের কাউকে দেখতে না পেলেও বুথের মালিককে দেখতে প্রতিভাসের কোনও অসুবিধে হয়নি। সুপর্ণকে মিসড কল দিয়েই সুপর্ণ বুথমুখো হল।

খাতা থেকে মুখ তুলে প্রতিভাসকে দেখে কপালে ভাঁজ শিশিরের। ঈষৎ গম্ভীর।

"দাদা যে। আজ কী মনে করে? ফোন না ডি টি পি?" হালকা হওয়ার চেষ্টা করেন শিশির।

"কোনওটাই নয়। কাল যে ব্যাপারে এসেছিলাম সেই নিয়েই আলোচনা আছে," গম্ভীর স্বর প্রতিভাসের।

"আরে বাবা কাল তো বললাম, সারাদিন গাদাগুচ্ছের লোক ফোন করতে আসে। ওইভাবে কাউকে কি মনে রাখা সম্ভব?" সামান্য গলা চড়ায় শিশির।

"সারাদিনের কথায় আসছি না। নির্দিষ্ট সময়টা তো বলেছি। বিকেল সাড়ে তিনটে। তা ওই সময় আপনার বুথে কাস্টমারের লম্বা লাইন থাকে নাকি?"

কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায় শিশির। সামনে কঠোর মুখে খাকি পোশাকের সুপর্ণ। মনে শঙ্কা। একে এক নাছোড় কাস্টমার। তায় আবার পুলিশের উঁকিঝুঁকি। এ কী উটকো ঝামেলা রে বাবা।

"আসুন স্যার, আসুন," শিশিরের কণ্ঠে ঝুরঝুরে বিনয়।

"আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন মিঃ মিত্র?" শিশিরের দিকে আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে সুপর্ণর দৃষ্টি এখন প্রতিভাসের দিকে।

"কোথায় আর পেলাম? সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি," জানান প্রতিভাস।

"শুনুন শিশিরবাবু, মিঃ মিত্র আমাদের ডিপার্টমেন্টের অফিসার। ওঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পেলে কিন্তু ঝামেলা হবে," কড়া ধমক দেন সুপর্ণ।

"বিশ্বাস করুন স্যার। মিথ্যে আমি বলছি না। সেদিন নির্দিষ্ট ওই সময়ে যে ফোন করতে এসেছিল, তাকে সেভাবে খেয়াল করিনি। প্রতিদিন ওই সময়ে বুথ ফাঁকাই থাকে। সেদিনও ছিল। সময় কাটাতে বইয়ের পাতায় ডুবে ছিলাম। বুথে ঢুকে কথা বলতে চাইলে সোজা অঙ্গুলি নির্দেশ

ফোনে। লোকটিও কথা বলে পয়সা রেখে বেরিয়ে যায়।"

"কবেকার কথা স্যার?" পাশ থেকে মন্তব্য কমলের।

"গত পরশুর আগের দিন বিকেল সাড়ে তিনটে," মুখ খোলেন সুপর্ণ।

"গত পরশুর আগের দিন? আজ শুক্র। পরশু বুধ। আগের দিন মানে মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটে। সাড়ে তিনটে," আওড়াতে-আওড়াতে চোখ বোজে কমল। মিনিটখানেক।

"মনে পড়েছে স্যার। মনে পড়েছে। ভিতরের ঘরে ছিলাম আমি। ওখান থেকে চোখে পড়েছে লোকটাকে। বেশ নার্ভাস। মিনিটখানেক কথা বললেও পুরো সময়ে রুমাল মুখে বোলাচ্ছিল। কে জানে কেন। কথা শেষ হতেই টেবিলে পয়সা রেখে হাওয়া। দাদা বইমুখো। খেয়াল করেনি। পয়সা বের করার সময় লোকটার পকেট থেকে একটা চিরকুট সোজা মেঝের পড়ল। তুলে নিয়ে দেওয়ার জন্য বাইরে বেরলেও চোখে পড়েনি লোকটাকে," ঝড়ের গতিতে বলে কমল।

"গুড। তোমার স্মরণশক্তি সত্যিই প্রশংসনীয়," বাহবা দেন প্রতিভাস।

"মনে থাকত না, চিরকুটটার জন্য মনে আছে। আরও একটা ব্যাপার স্যার। বলব?" আড়চোখে কমল দেখে নেয় শিশিরকে।

"সেই মুহূর্তে বেরিয়ে ভিতরে আর ঢুকিনি। বাইরেই পায়চারি করছিলাম আধঘণ্টা। হ্যাঁ, প্রায় আধঘণ্টা পর ওই লোকটাকে আবার চোখে পড়ে। বছরচোদ্দোর একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ওই রাস্তা দিয়েই এগিয়ে গেল সামনে। চিরকুটটা দেব বলে ডাকলাম। ঘুরে তাকালও। পরক্ষণে বাড়িয়ে দিল হাঁটার গতি," এক নিশ্বাসে বলে দম ছাড়ে কমল।

"লোকটাকে আবার দেখলে চিনতে পারবে ছেলেটাকে?" প্রশ্ন প্রতিভাসের।

"অবশ্যই," আত্মবিশ্বাসী কমল।

"মিঃ বিশ্বাস, ফোটোদুটো দিন তো। আন্দাজের ঢিল দেখি কোথায় পৌঁছয়।"

ফোটোদুটো দেখতেই উত্তেজিত কমল।

"এই লোকটা। হ্যাঁ, স্যার এই লোকটাই। সঙ্গে এই ছেলেটাই তো ছিল।"

চমকে ওঠেন সুপর্ণ আর প্রতিভাস। দু'তরফে দৃষ্টি বিনিময়, নীরব কথার চালাচালি হয়।

"তুমি নিশ্চিত ফোটোর এই দু'জনকেই সেদিন দেখেছিলে?" পুনরায় যাচাই করে নেন প্রতিভাস।

"একশোভাগ স্যার," নিজের প্রতি আস্থায় টইটম্বুর কমল।

"চিরকুটটা তোমার কাছে আছে কমল?" নিমেষে প্রসঙ্গান্তরে চলে যান প্রতিভাস।

"আছে, দাঁড়ান দিচ্ছি," প্রায় ছুটে ভিতরে ঢুকে পলকে বাইরে আসে কমল।

"এই নিন স্যার।"

চিরকুটে চোখ বুলিয়ে প্রতিভাসের কপালে ভাঁজ। এ আবার কী? দেখান সুপর্ণকে। সে তরফেও ধন্ধ।

"চিরকুটটা তুমি দেখেছ?" কমলকে প্রশ্ন করেন সুপর্ণ।

"দেখেছি। বুঝিনি কিছু। গোটাদশেক ইংরেজি অক্ষর পাশাপাশি থাকলেও জাস্ট মিনিংলেস। কোন ওয়ার্ডই হয় না। এ আবার কী! এটার কি কোনও দরকার আছে?"

"এখনই কিছু বোঝা সম্ভব নয়। আপাতত চিরকুটটা রাখি। পরে দেখা যাবে কাজের না ফালতু।"

পাশ থেকে এতক্ষণ সব শুনছিল শিশির। এবার মুখ খোলে।

"একটা কৌতূহল ছিল স্যার।"

"হ্যাঁ, বলুন না," নরম স্বর প্রতিভাসের।

"ফোটোর ওই দু'জন কে? কেনই বা আপনাদের এই খোঁজখবর?"

"বিশেষ কেউ নয়। সাধারণ নাগরিক। ঘটনাও তেমন কিছু নয়। জাস্ট একটা রুটিন এনকোয়ারি আর কী!" পরিস্থিতি সামলালেন সুপর্ণ।

"এবার আমরা বেরব শিশিরবাবু। একটা কথা, এই খোঁজখবরের ব্যাপারে কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা নয়। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। কমল, যে সাহায্যটুকু করলে তার জন্য ধন্যবাদ," মুখ ছাড়েন সুপর্ণ আর প্রতিভাস।

বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে চাপা আলোচনা শুরু হল সুপর্ণ আর প্রতিভাসের মধ্যে।

"এ মুহূর্তে ঘটনা কিছুটা পরিষ্কার মিঃ বিশ্বাস। ফোটো দেখে টাবুন আর পবনকে শনাক্ত করেছে কমল। কমলের কথানুযায়ী ঘটনার দিন চারটে নাগাদ পবন আর টাবুনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। তারপর থেকে দু'জনই বেপাত্তা। বোঝা যাচ্ছে টাবুনের অপহরণে পবনের হাত ছিল। টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে দিয়ে কেউ এই কাজ করিয়েছে। অপহরণকারীদের হাতে পবনই তুলে দিয়েছে টাবুনকে। ভবিষ্যতে মুখ খুললে ধরা পড়ার আশঙ্কায় পবনহত্যা। এর একটাই অর্থ, পরিচিত কেউ টাবুন অপহরণের সঙ্গে যুক্ত। মনে হয়, গানের প্রতিযোগিতার কেউ এই কুকর্মের নায়ক।"

"এখনই কিছু বোঝা সম্ভব নয়। আপাতত চিরকুটটা রাখি। পরে দেখা যাবে কাজের না ফালতু।" পাশ থেকে এতক্ষণ সব শুনছিল শিশির। এবার মুখ খোলে, "একটা কৌতূহল ছিল স্যার।" "হ্যাঁ, বলুন না," নরম স্বর প্রতিভাসের।

চমকে ওঠেন সুপর্ণ, "এ আপনি কী বলছেন মিঃ মিত্র? প্রতিযোগিতার কেউ কেন এমন করবে?"

"নিশ্চিত নই, অনুমান মাত্র। এ ক'টা দিন তো শুধু অন্ধকারেই হাতড়েছি। আজ সামান্য আলোর দেখা পেলাম। দেখা যাক গন্তব্যে পৌঁছনো যায় কিনা। তবে আপাতত মুখে কুলুপ এঁটে আমরা আমাদের মতো কাজ করি।"

"ঠিক বলেছেন। পরবর্তীতে কী করণীয় মিঃ মিত্র?" প্রশ্ন সুপর্ণর।

"এক কাজ করুন। আপনার গাড়ি থানায় পাঠিয়ে আমারটায় চলে আসুন। রাস্তার সামনেটা একটু ঘুরে আসি। টাবুনকে নিয়ে পবন ওদিকেই গিয়েছিল। যদিও তিনটে দিন পেরিয়েছে। গতকাল ভোর রাত থেকে আবার কিছুটা সময় বৃষ্টিও হয়েছিল। কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। বোঝাও যাবে না কিছুটি। তবু এগনোও যাক। বরাত জোরে যদি কিছু মেলে। তারপর এখান থেকে সোজা শিবম অ্যাপার্টমেন্ট।"

থানায় গাড়ি পাঠিয়ে সুপর্ণ প্রতিভাসের বাহনে চড়লেন।

"তপন, আপাতত ডান দিক ঘেঁষে গাড়ি চালাও। আস্তে-আস্তে। ফেরার পথে অন্য ধার দিয়ে এলেই হবে," গাড়িতে উঠে নির্দেশ দেন প্রতিভাস।

শম্বুকগতিতে গাড়ি এগোচ্ছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিভাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জানলার দু'ধারে। রাস্তায় খুব একটা লোক চলাচল নেই। তেমন দোকানপাটও যে আছে তা নয়। রাস্তার বাঁ ধারে ফুটপাথ ঘেঁষা বুথের পরেই গোটাদুয়েক ছোটখাট পানের দোকান। পাশে মাঝারি আকারের একখানা চায়ের দোকান। দোকানি আপাতত মাছি তাড়াচ্ছে। সামান্য জায়গা ছেড়ে পাশাপাশি দু'খানা মাঝারি গড়নের দোতলা বাড়ি। তারপরই পাঁচিল ঘেরা বেশ কিছুটা খালি জায়গা।

রাস্তার ডান ধারে খানিক তফাতে-তফাতে শুধুই বসত। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে কিছু দূরের এই জায়গা আগে পতিত ছিল। ধীরে-ধীরে জনপদ গড়ে উঠেছে। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে বসত ঘন হতে সময় লাগবে না। টাবুনদের পাড়াটাও খুব একটা পুরনো নয়। বাড়িগুলো হাল ফ্যাশনের। এখনও সাফসুতরো; চকচকে। ওদের পাড়া থেকে এই জায়গা খুব একটা দূর নয়। নির্জনও। অপারেশনের আগে শুধু টাবুনদের বাড়িই নয়, অপহরণকারী এ জায়গাটাও দেখেছে। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত। তার মানে টাবুনের বাড়ি আসার খবর অপহরণকারীর কাছে ছিল। আর তা ফাঁস হয়েছিল পবনের কাছ থেকে। টাবুনই হয়তো কোনও একসময়ে বাড়ি যাওয়ার খুশিতে পবনকে জানিয়েছিল। আর তারপর তো ঘটনার ঘনঘটা।

"কী ব্যাপার মিঃ মিত্র একেবারে চুপ করে গেলেন যে?" সুপর্ণর আলতো ঠেলায় সম্বিত ফেরে প্রতিভাসের।

"আরে তেমন কিছু নয়। তপন জাস্ট এখানে গাড়িটা একবার দাঁড় করাও তো। হ্যাঁ এখানেই। মিঃ বিশ্বাস, এই জায়গাটা একটু ভাল করে দেখা দরকার। নিশ্চিত নই, অনুমান এখান থেকেই টাবুন গায়েব হয়েছে। জায়গাটার পারিপার্শ্বিক রসায়ন ভাল করে লক্ষ করুন। না, আপনার নামার দরকার নেই। জানেনই তো খাকি পোশাকের প্রতি জনতার কৌতূহল একটু বেশি। লোক চলাচল কম হলেও খবর ছড়াতে একজনই যথেষ্ট।"

বাইরে বেরিয়ে প্রতিভাসের নজর এধার-ওধার। এমনিতেই পুরো এলাকাটা নির্জন। নির্দিষ্ট এই জায়গায় একদম ফাঁকা। রাস্তার বাঁ ধারে পাঁচিল ঘেরা কিছু খালি জমি। ডান ধারও খালি। বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে জলাজমি। গাড়িটা দাঁড়িয়েছেও জলাজমির সামনে।

পায়ে-পায়ে এগোতে-এগোতে প্রতিভাসের তীক্ষ্ণ নজর রাস্তা সংলগ্ন ফুটপাথে। সুরকি বিছানো থাকলেও মাঝে-মাঝে সবুজ ঘাসের উঁকিঝুঁকি। হাবিজাবি জিনিসের ছড়াছড়ি। ফাঁকা জায়গার প্রকৃত সদ্ব্যবহার আর কাকে বলে! বিক্ষিপ্ত বেশ কিছু পলিপ্যাক। কুঁচকানো দোমড়ানো। খানিক তফাতে বেশ চকচকে একখানা পলিপ্যাক। একটু যেন অন্য রকম। আস্ত। কী ভেবে তুলে নেন। ভারী ঠেকছে। ভিতরে হয়তো কিছু আছে। হাত ঢোকাতে মেলে কয়েকটা ওষুধের পাতা। প্রেসক্রিপশন, রসিদ। চোখ বুলাতেই চমক। আরে এ তো টাবুনের দাদুর প্রেসক্রিপশন। রসিদ 'আরোগ্য মেডিকেলস'-এর। ওখান থেকেই তো টাবুন ওষুধ কিনেছিল। অর্থাৎ ওখান থেকেই অপহৃত টাবুন। গাড়িতে তুলে অপহরণকারীদেরই কেউ পলিপ্যাক ছুড়েছে বাইরে। কাউকে গায়েব করাতে এই জায়গা একদম ঠিকঠাক। চারপাশে বারকয়েক নজর বুলিয়ে প্রতিভাস গাড়ির দিকে এগোন।

শিবম অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতেই শশব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে পশুপতি।

"স্যার, স্যার এদিকে বহুত ঝামেলা," হাঁফাচ্ছে লোকটা। উত্তেজিত ও। থমকে দাঁড়ান প্রতিভাস ও সুপর্ণ।

"ঝামেলা! কীসের ঝামেলা?" ঠোঁট ফাঁক প্রতিভাসের।

"দোতলার অফিস ঘরে প্রতিযোগীদের বাড়ির লোকের সঙ্গে সুরলহরীর কর্মকর্তাদের তুমুল কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছে। অভিভাবকরা কেউ আর ছেলেমেয়েদের রাখতে নারাজ। তাঁরা ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে যেতে চাইছেন। অর্কের অনুপস্থিতির জন্যই এমনটা ঘটেছে। ঝড়ের গতিতে জানায় পশুপতি।

প্রতিভাসের কপালে ভাঁজ। সুপর্ণ গম্ভীর। নীরব দৃষ্টি বিনিময়ে দু'জনের চোখে চোখে কথা। টাবুনের ব্যাপারটা তা হলে কি জানাজানি হয়ে গিয়েছে?

"চলুন তো দেখি," চাপা স্বর প্রতিভাসের।

দোতলায় ওঠার মুখে শমীক রায়ের মুখোমুখি। মুখভর্তি বিরক্তি।

"এ কী ফ্যাসাদে পড়লাম বলুন তো। একে তো ঝামেলার পর-ঝামেলা। তায় আবার উটকো চাপ। কেউ থাকতেই চাইছে না। এভাবে কাউকে ছাড়া কি সম্ভব! প্রোগ্রাম এখনও কমপ্লিট নয়। অর্ককে বাড়ি ছেড়ে কী ঝামেলায় পড়লাম!" তেতো স্বর শমীকের।

"পশুপতিবাবু, উপরটা সামলান। আমরা আসছি," নরম স্বর প্রভাসের।

"ঠিক আছে স্যার," প্রায় লাফিয়ে সিঁড়ি টপকাল পশুপতি।

চারপাশে নজর বুলিয়ে প্রতিভাসের অনুচ্চ কণ্ঠ, "টাবুনের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে নাকি?"

"না-না। আমরা কয়েকজন ছাড়া কেউ জানে না।"

"ওকে। চলুন।"

শমীকের সঙ্গে সুপর্ণ আর প্রতিভাসকে দেখে ইন্দ্রজিৎ আর সায়নের সারা মুখে খুশির ছররা। মনে স্বস্তির উড়ান।

কিন্তু খাকি পোশাকের সুপর্ণর দর্শনে চার অভিভাবকের মুখ ফ্যাকাসে। মনে তিরতিরে শঙ্কা। কর্তৃপক্ষকে এভাবে হ্যারাস করা হয়তো ঠিক হয়নি। বোধ হয় বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে বাধ্য হয়ে এরা পুলিশের শরণাপন্ন। পর্যায়ক্রমে সকলের মুখে নজর বুলিয়ে প্রতিভাস বলে, "ঘাবড়াবেন না। কিন্তু আপনাদের সমস্যাটা ঠিক কী? কীসের অসুবিধে? প্রতিযোগিতা শেষ হতে আর মাত্র তিনদিন বাকি। এতদিন যখন থাকলেনই বাকি ক'টা দিনে আপত্তি কেন? আপনারা অবুঝের মতো আচরণ করলে ছেলেমেয়েগুলো ঠিক থাকে কী করে? প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্বের জন্য যথেষ্ট একাগ্রতা প্রয়োজন। না হলে সাফল্য সম্ভব নয়। সকলেই তো চাইবে সেরা হতে। আমার অনুরোধ, ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন।"

"আপনার কথা শুনলাম। বুঝলামও। কিন্তু সত্যি করে একটা কথা বলুন তো, এখানে নিয়মমাফিক কি সব কাজ হচ্ছে? সর্বত্র বেনিয়মের ছড়াছড়ি। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার আগে অর্কপ্রভ বাড়ি যায় কী করে?" চাঁচাছোলা মন্তব্য মাঝচল্লিশের পল্লবের।

"বুঝেছি অর্কের ব্যাপারটা নিয়েই আপনাদের ক্ষোভ। অন্যায্য নয়। তবে কার্যকারণ ছাড়া তো কিছু হয় না। বিশেষ কারণে নিয়মের বাইরে গিয়ে কর্তৃপক্ষ অর্ককে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। দিনকয়েক আগে অর্কর দাদুর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়ে পড়েছিল। যায়-যায় অবস্থা। নাতিকে একবার চোখে দেখার আকুতি। অন্যায় জেনেও অর্কের বাবা কর্তৃপক্ষের কাছে অর্ককে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার আবেদন করেছিল। আপনারাই বলুন, এমন পরিস্থিতিতে চুপ করে কি বসে থাকা যায়? মানবিকতারও তো একটা প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্নের উত্তরে অর্ককে ছাড়া," পরিস্থিতি স্বাভাবিকের চেষ্টা প্রতিভাসের।

"ব্যাপারটা খুলে জানালেই হত। এভাবে ভুল বোঝাবুঝি হত না," জানান বছরচল্লিশের সুমনা।

"জানানোর সুযোগ আর কোথায় দিলেন ম্যাডাম? এসে পর্যন্ত তো কথার পিঠে কথা," ক্ষোভ শমীকের।

"আগে জানাতে পারতেন," নরম স্বর অতীনের।

"সেভাবে আর সময় পেলাম কোথায়। পবনের ঘটনাটা আচমকা ঘাড়ে চেপে বসল," জানাল শমীক।

"দেখুন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এখন তো জানলেন। এবার সিদ্ধান্ত আপনাদের," মুখ খুললেও যথেষ্ট অস্থির প্রতিভাস। টাবুনের ব্যাপারে দ্রুত ফয়সালা দরকার। অযথা সময় নষ্ট ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না।

খানিক তফাতে সরে চার অভিভাবকের ক্ষণকালীন চাপা আলোচনা।

"না, ঠিক আছে। আর তো তিনদিন। প্রতিযোগিতা শেষ হোক। তারপর বাড়ি ফেরা," চিবুক ফাঁক অঞ্জনার।

"গুড। সঠিক সিদ্ধান্ত। তবে একটা অনুরোধ আপনাদের কোন ওরকম অসন্তোষের প্রভাব প্রতিযোগীদের উপর যেন না পড়ে। নিজেদের মতো তৈরি হতে দিন ওদের," অনুনয় সায়নের।

"অর্কর দাদু এখন কেমন আছেন?" প্রশ্ন পল্লবের।

"খুব একটা যে ভাল তা নয়। আই সি ইউ-তে আছেন। অবস্থা স্থিতিশীল," শমীক জানায়।

দলটা ফিরে যেতে স্বস্তির শ্বাস সুরলহরীর কর্তৃপক্ষের।

"থ্যাঙ্কস মিঃ মিত্র। পরিস্থিতি এত তাড়াতাড়ি আয়ত্তে আসবে ভাবিনি। সকাল থেকে একবার লেজে-গোবরে হতে হয়েছে মশাই। চলুন, নীচে যাই। বদ্ধ ঘরে দম আটকে আসছে। পশুপতি, একটু চায়ের ব্যবস্থা করো," হাঁক ছেড়ে শমীক।

"হ্যাঁ স্যার যাই," দৌড় পশুপতির।

রিসেপশনের একধারে চায়ে চুমুক দিয়ে টাবুন প্রসঙ্গে চাপা আলোচনা পাঁচজনের।

"তা হলে বুঝতেই পারছেন পবন হত্যা বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। টাবুন অপহরণের সঙ্গে রয়েছে গভীর সংযোগ," মন্তব্য প্রতিভাসের।

"তার মানে অপহরণকারী পরিচিত কেউ," উদ্বেগ ইন্দ্রজিতের।

"সে কথা আগেই বলেছি। আপনাদের এই গানের প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুক্ত কেউ এই কর্মকাণ্ডের নায়ক। পুরো না হলেও কিছুটা নিশ্চিত। বাকিটা তদন্তসাপেক্ষ।"

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন টাবুনকে স্পটে আনতে পবনের ব্যবহার। কাজ ফুরলে মুখবন্ধে পবনের ইহলীলা সাঙ্গ," বলে সায়ন।

"একজ্যাক্টলি সো।"

"কে হতে পারে? আর কেনই বা তার এমন মতিভ্রম ভাবার কথা। ছেলেটা কোথায় আছে, কেমন আছে কে জানে!" চাপা শ্বাস শমীকের।

"আঙ্কল।"

পলকে আলোচনা বন্ধ। চোখ তুলতেই সামনে বছরপনেরোর এক কিশোর। সাধাসিধে সারল্যের প্রতিমূর্তি।

"এ কী! রনি তুমি! এখানে কেন? আর তো তোমার এই ক্যাম্পাসে ঢোকার কথা নয়," তীক্ষ্ণ স্বর শমীকের।

"ঢুকিনি তো। আজ একটা খবর কানে এল। ভুল না -ঠিক জানতে আসা," নির্বিকার রনি।

"তা কী খবর শুনি," জিজ্ঞাস্য ইন্দ্রজিতের। স্থির দৃষ্টি রনিতে।

"অর্কপ্রভকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না?"

ভেজা স্বর রনির।

জোর চমক পাঁচজনের। কেউ কারও মুখের দিকে
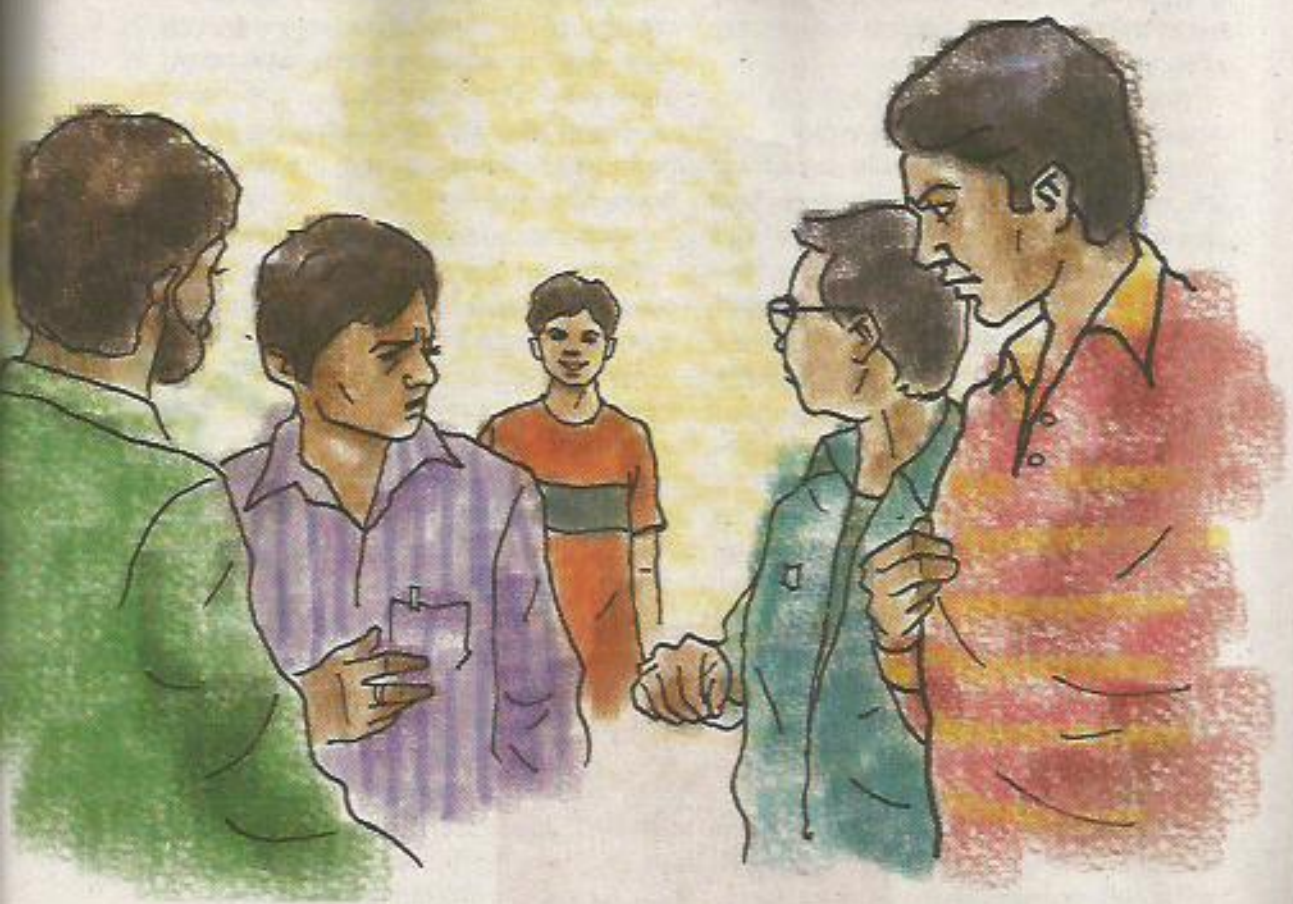
তাকাতে ভরসা পাচ্ছে না। ছেলেটির সামনে কোনওরকম অস্বাভাবিকতা। যেতে চাইছে না কেউ। কোনওরকমে সামলাচ্ছে নিজেদের।

"এ সব কালতু কথা কোত্থেকে শুনেছ?" স্বাভাবিকের ভান শমীকের।

প্রতিভাসের তীক্ষ্ণ নজর রনির মুখে। চেনা-চেনা লাগছে। কিন্তু কবে, কোথায় দেখেছে মনে পড়ছে না। তবে যতটা সাধাসিধে লাগছে মনে হয় আদতে ছেলেটি তা নয়। সারল্যের আড়ালে কেমন একটা রুক্ষতা। দৃষ্টিতে অস্থিরতা। মুখে চাপা উল্লাস।

"কালতু নয় আঙ্কল। সামনের পেট্রল পাম্পে গিয়েছিলাম। সেখানেই কানে এল। চার-পাঁচজন ছেলে বলাবলি করছিল।"

"যত সব বাজে কথা। মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সিকিউরিটি, সিকিউরিটি। এই ছেলেটা এখানে ঢুকল কী করে? ইমিডিয়েটলি একে এখান থেকে বের করো," উচ্চস্বর শমীকের।

"মিঃ রায়, কনট্রোল ইয়োরসেল্ফ," পাশ থেকে মৃদু স্বর প্রতিভাসের।

"এখনও দাঁড়িয়ে কেন রনি, যাও," খাকি পোশাকের সুপর্ণকে চেয়ার ছাড়তে দেখে সামান্য থমকাল রনি।

"যাচ্ছি স্যার," নিমেষে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেও রনির ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি নজর এড়াল না প্রতিভাসের।

ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুক্ষণের জন্য সবাই চুপ করে যায়। এক সময় নীরবতা ভঙ্গ সায়নের, "রনি ভুল তো কিছু বলেনি। কিন্তু যে ঘটনা আমরা পাঁচজন ছাড়া আর কেউ জানে না। পশুপতিবাবুও নয়। সে খবর রনি জানল কী করে এটা কিন্তু ভাবার।"

"ছেলেটা কে মিঃ রায়?" প্রতিভাসের স্থির দৃষ্টি শমীকে।

"রনি? সুরলহরীর একজন প্রতিযোগী ছিল। পঞ্চম পর্বের পর বাদ পড়ে। ডেঁপো ছোকরা। মাতব্বর টাইপের। যে ক'টা দিন এখানে ছিল আমাদের তো জ্বালিয়েছে, অন্য প্রতিযোগীদের বিরক্ত করতে ছাড়েনি। যারা এলিমিনেটেড হয়েছে আমাদের আমন্ত্রণ ও অনুমতি ছাড়া এখানে তাদের ঢোকা বারণ। অথচ সাহস দেখুন ছেলেটার। সিকিউরিটির নজর এড়িয়ে সোজা আমাদের মুখোমুখি," উত্তেজিত শমীক।

"সুরলহরীর প্রতিযোগী? চোখে পড়েছিল বটে। তাই চেনা লাগছিল। তবে ব্যাপারটা আমাকেও ভাবাচ্ছে। ছেলেটা টাবুন সম্পর্কে এত নিশ্চিত খবর পেল কোত্থেকে?

এ মুহূর্তে কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দরকার। কাজেই কোন ওরকম মাথা গরম নয়," বলে প্রতিভাস।

"টাবুনদের বাড়ি থেকে খবরটা ফাঁস হয়নি তো? কোন খবর একবার অম্রনীলবাবুকে?" উদ্বেগ সায়নের।

"নো। এখানে টাবুন সম্পর্কিত কোনও আলোচনা নয়, চার ধারে লোকজনের যাতায়াত। আপনাদের টিমের লোকজনও আসা-যাওয়া করছে, কারও কানে যেতে কতক্ষণ! ব্যাপারটা জানাজানি হলে ঝামেলা কিন্তু আপনাদের। এখান থেকে বেরিয়ে কয়েকটা কাজ সারার আছে। ভাবছি যাওয়ার পথে টাবুনদের বাড়িতে একবার ঢুঁ মারব। বিস্তারিত জানাব আপনাদের। চলুন মিঃ বিশ্বাস, এবার ওঠা যাক।"

॥ ৬ ॥

দিনের আলো ফুটেছে অনেক আগে। কানে আসছে পাখপাখালির কলরব। ঘরলাগোয়া বাথরুমে হাত-মুখ ধুয়ে টাবুন বিছানায়। সেই শুয়ে-বসে সময় কাটানো। এছাড়া করার আর কী-ই বা আছে! হিসেবমতো আজ চারদিন হল বন্ধঘরে। মুহূর্তের জন্যও বেরনো সম্ভব নয়। বাইরে থেকে দরজায় তালা। পাশের ঘরে চার-পাঁচজন ছেলে সব সময় মজুত।

লতিকামাসি বলছিল, দশ-পনেরো মিনিট ছাড়া তাদের কেউ না-কেউ বন্ধ ঘরের সামনে উঁকি দিয়ে যায়। এমনকী, খাবার সময় লতিকামাসির সঙ্গে দু'জন থাকে পাহারায়। খাওয়া শেষে বাসন নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে।

পুলিশ! চমকে উঠেছে টাবুন। তবে কি তারা এই ডেরার সন্ধান পেয়েছে! কারা তাকে তুলে এনেছে জানতে পেরেছে! আশার আলো। সে কি এবার বাড়ি ফিরতে পারবে? আবার সবাইকে দেখতে পাবে! দাদু, ঠাকুরমা, বাবা, মা সকলকে।

শুধু কাল বিকেলে জলখাবার নিয়ে লতিকামাসি একা এসেছিল। সামান্য সময়ের জন্য কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল টাবুন। তবু মুখ খুলতে প্রথমে বাধা।

"আগে খাও। দেখি ছেলেগুলো কী করছে। পরে কথা," চাপা স্বর লতিকার।

বেরিয়ে মিনিটখানেকেই ঘরে।

"ছেলেগুলো মনে হয় কোনও ঝামেলায় পড়েছে। পুলিশের কথা বলাবলি করছে," ফিসফিসানি লতিকার।

পুলিশ! চমকে উঠেছে টাবুন। তবে কি তারা এই ডেরার সন্ধান পেয়েছে! কারা তাকে তুলে এনেছে জানতে পেরেছে! আশার আলো। সে কি এবার বাড়ি ফিরতে পারবে? আবার সবাইকে দেখতে পাবে! দাদু, ঠাকুরমা, বাবা, মা সকলকে। খুশির চোরাস্রোতে বিপদের অনুপ্রবেশ। দাদু এখন কেমন আছে? ঠিক আছে তো! মা নিশ্চয়ই খুব কান্নাকাটি করছে। ঠাকুরমা চাপা স্বভাবের। জানলেও কাউকে বুঝতে দেবে না। চেপে রাখবে। মনে-মনে কষ্ট পাবে। বাবা ঠিকঠাক সব সামলাতে পারছে তো! গলার কাছে এক দলা কান্না। দু'চোখ জলে টইটম্বুর। তারপর সেই জল গাল গড়িয়ে নামল।

লতিকার ব্যথিত দৃষ্টি টাবুনে। বাড়ির লোকের জন্য খোকাবাবুর মনে নিশ্চয়ই কষ্ট। হবেই তো। কিন্তু সে যে নিরুপায়। নীরব দর্শকমাত্র।

কোনও রকমে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা লতিকার।

"চোখের জল মুছে ফেলো খোকাবাবু। ছেলেগুলো দেখলে ঝামেলা হবে। ভাববে আমি কিছু বলেছি। বড় দাদাবাবুর কানে গেলে বকবে আমায়।"

আচমকা বাইরে একটি ছেলের উচ্চকণ্ঠ, "ও ঘরে এতক্ষণ ধরে কী করছ মাসি?"

নিমেষে নিজেকে সামলে চোখের জল মোছে টাবুন। ঠিক তখনই গামছা ঢাকা একখানা মুখের উঁকি। চঞ্চল দৃষ্টি টাবুনে। আপাদমস্তক জরিপ।

"যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। এই তো ঢুকলাম। খাওয়া হোক ছেলেটার," জানায় লতিকা।

"ঠিক আছে," ছোকরার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘরের চারধারে।

"কীরে, তোর কোনও অসুবিধে হচ্ছে নাকি! অবশ্য হলেও করার কিছু নেই। চালিয়ে নে কোনও রকমে। ক'টা দিন তো!" খিকখিক হাসি ছেলেটির।

বেরনোর জন্য ঘুরেও থমকে দাঁড়ায়।

"ওর খাওয়া হলে আমাদের চা-টা দাও মাসি। কবে যে এ ঝামেলার শেষ কে জানে! আর ভাল্লাগে না। চা দাও। চা দাও মাসি।"

"মাথাফাথা সব জ্যাম হয়ে আছে। বস তো ঘরে আরাম করছে। যত ভোগান্তি আমাদের," গজগজ ছোকরার।

ছেলেটার কোনও কথাই কানে টাবুনের ঢুকছে না। ভাবনায় বিচরণ। ক'টা দিন কেন? তারপর তার কী হবে? ছেলেগুলো তাকে মেরে ফেলবে না তো? আর কোনওদিন কাউকে দেখতে পাবে না? খানিক আগের আশার আলোয় অন্ধকারের হাতছানি।

আচমকা হাট করে খুলে গেল পাল্লা। লাফিয়ে ভিতরে এক ঝলক আলো। ভাবনা উধাও। উঠে বসল টাবুন।

"কী রে ঘুমোচ্ছিস নাকি! অবশ্য এছাড়া আর করবিই বা কী," সামনে গামছায় মুখ ঢাকা কালকের ছোকরা।

"গল্প জুড়েছিস মনে হচ্ছে," পিছনে মুখ ঢাকা আর-এক ছোকরার।

"বাচ্চা ছেলেটার সঙ্গে কী আর গল্প করব? ওই একটু কথা বলা। আমরা আড্ডা মারছি। আর এ দেখার তো

সেদিন থেকে মুখ বন্ধ। এর পর হয়তো কথা বলতেই ভুলে যাবে," মন্তব্য প্রথম ছেলেটির।

"বেশি দরদ দেখাতে হবে না। বস চটে যাবে," দ্বিতীয় ছেলেটি যথেষ্ট সাবধানি।

"ছাড় তো ওর কথা। বাবার টাকা ওড়াতে ওস্তাদ। আজ পর্যন্ত কোনও ভাল কাজ করেছে? একেও যে কেন এখানে আটকে রেখেছে কে জানে! এদিকে এই ব্যাপারে পুলিশের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কী যে হবে কে জানে," শঙ্কা প্রথম ছেলেটির।

"কিস্যু হবে না। টাকার জোরে বস ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। অযথা কোনও ব্যাপারে মাথা না ঘামানোই ভাল। আমাদের আর কী! সাহায্য চেয়েছে তাই আসা। কাজ করব পয়সা নেব। কাজ ফুরালেই হাওয়া," বেপরোয়া দ্বিতীয় জন।

কথাবার্তা শুনে টাবুনের মনে হল ছেলেগুলো খুব একটা খারাপ নয়। তথাকথিত কোনও এক বসের পাল্লায় পড়ে তাকে তুলে এনেছে। সামান্য হলেও তার প্রতি সহানুভূতিশীল। মনের কথা এদের বলা যায়।

"শুধু-শুধু আমায় এখানে আটকে রেখেছ কেন? বাড়ি পৌঁছে দাও না," ঠোঁট ফাঁক টাবুনের।

ক্ষণিকের জন্য ছেলেদু'টির স্থির দৃষ্টি টাবুনে।

"আমরা নই। বস আটকে রেখেছে তোমায়। ছাড়া তার মর্জি," জানায় প্রথমজন।

"বাড়ির সকলে খুব দুশ্চিন্তায়। একে দাদুর অসুখ। খুবই বাড়াবাড়ি। তায় আমার অনুপস্থিতি। বাবা-মা যে কষ্ট পাচ্ছে গো," আকুল স্বর টাবুনের।

ছেলেদু'টি কিছু বলার আগেই পাশের ঘর থেকে চিৎকার অন্য একজনের, "তখন থেকে কী বকবক করছিস। বেরো তাড়াতাড়ি। বাপি আসছে।"

"আরে বাপ রে! এখানে দেখলে ঝামেলা করবে। চল-চল," হুড়মুড়িয়ে বেরল দু'জনে। নিমেষে দরজায় তালা লাগিয়ে পাশের ঘরে।

বাপি! নামটা কানে যেতে কপালে ভাঁজ টাবুনের। চেনা নাম। কোথায় যেন শুনেছে। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছে না। কে হতে পারে! স্মৃতি হাতড়ে ব্যর্থ টাবুন। অগত্যা সময়ে গা ভাসানো। মন খারাপে শোয়া।

সন্ধ্যা ঘেঁষে বাড়ি ফেরা প্রতিভাসের। সারাদিনের ধকলে শরীর জুড়ে চুরচুরে ক্লান্তি। সোফার নরম গদিতে ঝুরঝুরে স্বস্তি। ফুরফুরে আরাম।

"তারপর অঙ্কুবাবু সারাটা দিন কেমন কাটল?" গ্লাসের জলে গলা ভিজিয়ে বলল প্রতিভাস।

"ভাল ছোটকা। খুব ভাল। খাওয়া, ঘুম আর ল্যাপটপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। ফাঁকে কাকিমার সঙ্গে আড্ডা। তোফা," উৎফুল্ল অঙ্কিত।

"বাহ! তা হলে বাবুর রাগ কমেছে। গুড। তার মানে মন ফ্রেশ। মাথা সাফ। কাজেই দায়িত্বটা দেওয়া যায়," খুশি প্রতিভাস।

"কীসের দায়িত্ব?"

"চিরকুট রহস্য উদঘাটন।"

"মানে!" অবাক অঙ্কিত।

"ধর এটা।" চিরকুটটা অঙ্কিতকে দিল প্রতিভাস।

"এটা কী গো?" চিরকুটে আলগোছে নজর অঙ্কিতের।

"একটা কাগজের টুকরোয় কয়েকটা ইংরেজি অক্ষর। পাশাপাশি থাকলেও মিনিংলেস। বারকয়েক নজর বুলিয়েও বুঝতে পারিনি। আবার চিরকুটটা ফেলে দিতেও ভরসা পাইনি। দ্যাখ তো এতে অর্থবহ কিছু খুঁজে পাস কিনা। ততক্ষণে ফ্রেশ হয়ে নিই আমি।"

চিরকুটে গভীর মনোযোগ অঙ্কিতের। পাশাপাশি ব্লক লেটারের দশটি ইংরেজি অক্ষর। 'IABACEFGHB' এ আবার কী! কোনও স্পেলিংই তো হয় না। তা হলে নিছক কয়েকটা অক্ষর! নেহাত খেয়ালখুশিতে লেখা!

"কী ব্যাপার অঙ্কু? ল্যাপটপ বন্ধ! ওই কাগজের টুকরোয় কী অত দেখছিস?" ড্রইংরুমে দেবারতি।

"ছোটকা দিয়ে গেল। কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না," মাথা চুলকায় অঙ্কিত।

"দেখি একবার," হাত বাড়ায় দেবারতি। কাগজ নিয়ে মিনিটপাঁচেক মস্তিষ্কের কসরতে হাল ছাড়ে দেবারতি।

"না রে মাথায় কিছু আসছে না। কার মাথা থেকে এসব যে বেরয় কে জানে!" ফুট কাটে দেবারতি।

"তা হলে দু'জনেই ব্যর্থ," লঘু পায়ে প্রতিভাস ড্রইংরুমে।

পিছনে বুধুয়া চা আর স্ন্যাক্সের ট্রে নিয়ে। পলকে টেবিলে রেখে উধাও।

"তুমি এটা কোথায় পেলে ছোটকা?" প্রশ্ন অঙ্কিতের।

চায়ে চুমুক দিয়ে সকাল থেকে ঘটে যাওয়া পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রতিভাসের।

"পড়েছে পবনের পকেট থেকে। বুধো কুড়িয়েছে কমল। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ ছোটকা। কাগজটা কিন্তু রাফলি ছেঁড়া নয়। নিখুঁত মাপে কাটা। চকচকে। যত দূর মনে হচ্ছে কোনও প্যাডের কাগজ। আর লেখাও যত্ন করে। দায়সারা নয়। আপাতদৃষ্টিতে মিনিংলেস মনে হলেও আদতে কিন্তু তা নয়। গভীরে আছে কোনও রহস্য," মন্তব্য অঙ্কিতের।

বারকয়েক চিরকুটটা নাড়াচাড়া করে মুখ খোলে প্রতিভাস, "ঠিক ধরেছিস তো! আমি অত খেয়াল করিনি। অবশ্য সারাদিনের দৌড়ঝাঁপে সেভাবে দেখার সুযোগও পাইনি।"

"চিরকুটটা আর-একবার দাও তো। দেখি লেটারগুলোর কী রহস্য!" চিরকুটের গভীরে ডুব অঙ্কিতের।

"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে রনি ছেলেটি সুবিধের নয়। আগ বাড়িয়ে টাবুনের ব্যাপারটা বলতে আসাই সন্দেহজনক। যে ঘটনা তোমরা পাঁচজন ছাড়া আর কেউ জানে না তা ও জানল কী করে? সোজাসুজি না বলে পরোক্ষে ও টাবুনের অপহরণের কথাই তোমাদের শুনিয়েছে। আমার মনে হয় রনিকে বাজিয়ে দেখা দরকার," বলে দেবারতি।

"দেখো আমরা, পাঁচজন ছাড়া আর কেউ জানে না বললে একটু ভুল হবে। টাবুনের বাবা, মা, পিসি, পিসেমশাই জানে। বাড়িতে উপস্থিত অন্য আত্মীয়দের কাছে ব্যাপারটা কায়দা করে চেপে যাওয়া হয়েছে। যদিও বাড়ি এলেও আচমকা টাবুনের অনুপস্থিতিতে তাদের কৌতূহল ছিলই। প্রতিযোগিতা ও কর্তৃপক্ষের চাপের দোহাই দিয়ে পরিস্থিতি সামলেছেন অশনীলবাবু। কাজেই টাবুনদের বাড়ি থেকে ফাঁস হয়নি। আমাদের তরফ থেকে তো নয়ই। তা হলে!" হঠাৎ চুপ প্রতিভাস।

অস্থির পায়চারি ঘরের এধার-ওধার। মুহূর্তে সোফায়। চোখ বুজে ভাবনায়। সেবারতি ভুল কিছু বলেনি। রনির যেচে টাবুনের কথা বলতে আসা সত্যিই অস্বাভাবিক। কারও কাছ থেকে টাবুনের কথা শোনার বিষয়ও পুরোপুরি অসত্য। টাবুনের অপহরণ রনির অজানা নয়। কিন্তু জানা কীভাবে? প্রত্যক্ষে, না পরোক্ষে। উত্তেজিত প্রতিভাস। সেলফোনে সুপর্ণর সঙ্গে যোগাযোগ। চাপা গলায় মিনিটকয়েক আলোচনা শেষে সুস্থির। তবু চোখ বোজা। মনে হয়তো পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্তুতি।

"পেয়েছি। পেয়েছি। ছোটকার অক্ষরগুলোর মানে খুঁজে-পেয়েছি গো।" অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে হইহই উচ্ছ্বাস অঙ্কিতের।

উত্তেজিত প্রতিভাস। বলে কী ছেলেটা! সেবারতির মনে খুশির উড়ান।

"মনে হয় অক্ষরগুলোর আড়ালে লুকানো কোনও সেল নম্বর। এই দেখো," প্রতিভাসের সামনে চিরকুট মেলে ধরে অঙ্কিত।

অক্ষরগুলোর নীচে অবস্থান গত সংখ্যার বিন্যাস। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রতিভাসের।

মনে হয় ঠিকই ধরেছে অঙ্কু। ঠিক দশটি সংখ্যাই সাজানো। নিজের সেলফোনের বোতাম টিপতে গিয়েও থেমে যায়। যদিও ধীরে চলো নীতিতে বিশ্বাসী নয় প্রতিভাস তবু এক মুহূর্তে হিসেব করে পা ফেলা দরকার। তাড়াহুড়োয় পিছলানোর সম্ভাবনা। গন্তব্যে পৌঁছানোয় বিলম্ব। সুপর্ণ আসুক। ওর সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ।

মিনিটপাঁচেকেই হইহই করে ঢোকে সুপর্ণ।

"এদিকে মশাই আবার এক উটকো ঝামেলা। গত দিনচারেক থেকে নতুন কলোনিতে নাকি চার-পাঁচজন অচেনা ছোকরার যাতায়াত শুরু হয়েছে। ঘাঁটি গেড়েছে নাকি কলোনির শেষপ্রান্তের কোনও এক দোতলায়। খানিক আগে পাড়ার এক বাসিন্দা খবরটা জানাল। চারপাশে যা চলছে কে যে কোথায় কী উদ্দেশ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকছে কে জানে! তো সে যাই হোক আজকের রাতটা ভদ্রলোককে অপেক্ষা করতে বলেছি। কাল সকালে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেব। বাই দ্য ওয়ে, আপনার হঠাৎ জরুরি তলব কেন?"

"আগে সুস্থির হয়ে বসুন। চা খান। তারপর আলোচনা। হয়তো অনুমান। তবুও মন বলছে টাবুন উদ্ধার এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে এগতে হবে খুব সাবধানে। ছক কষে," উত্তেজনা চেপে শান্ত স্বর প্রতিভাসের।

"বলেন কী!" উত্তেজনা চেপে শান্ত স্বর প্রতিভাসের।

"সে ব্যাপারেই আলোচনা। তাই জরুরি তলব।"

"আগে আলোচনা হোক। চা-টা পরে," প্রায় আধঘণ্টা চাপা আলোচনা সুপর্ণ আর প্রতিভাসের।

"বছরপনেরোর একটা ছেলের পক্ষে এমন কাণ্ড ঘটানো কি সম্ভব মিঃ মিত্র? তা ছাড়া এতে ওর মোটিভটাই বা কী?" সুপর্ণর মনে তীব্র দোলাচল।

"অপরাধীর নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত মোটিভ বোঝা এমনই সম্ভব নয়। সে রনি হোক বা অন্য কেউ। এ মুহূর্তে আমাদের এগোতে হবে। যদিও ঘটনায় এখনও যথেষ্ট ধোঁয়াশা। তবুও সামান্য আলোর উঁকিঝুঁকিতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার কারও কাছ থেকে শোনা কথার সত্যতা যাচাই করতে আসেনি রনি। এসেছিল টাবুনের অপহরণের পরিপ্রেক্ষিতে সুরলহরীর কর্তৃপক্ষের হাবভাব বুঝতে। আপনি নোটিস করেছিলেন কিনা জানি না। ফেরার সময় ওর চাপা হাসিতে ঔদ্ধত্যের ব্যঞ্জনা আমার নজর এড়ায়নি। তবে রনি একা নয়। আরও কেউ আছে ওর সঙ্গে। সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এত পরিকল্পনামাফিক টাবুন অপহরণ অথবা পবন হত্যা সম্ভব নয়। তবে এ মুহূর্তে শুধু অনুমানের ভিত্তিতে আমাদের এগনো। সফলতা আসবে, না ব্যর্থ হবে আমাদের প্রয়াস জানি না। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে। হাতে সময় খুব কম। চলুন বেরনো যাক।"

> সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাড়িতে। নাহ্! ছিটেফোঁটা আলোর দেখা নেই। অর্থাৎ বাড়ির সদস্যরা নিদ্রামগ্ন। নিশ্চিন্তে নিদ্রায়। নিমেষে ক্ষিপ্রগতিতে সকলে সদর দরজায়। সামান্য কসরতে দরজা খুলে সোজা বাড়ির ভিতর।

॥ ৭ ॥

ঘড়ির কাঁটায় রাত ন'টা হলেও মনে হচ্ছে গভীর রাত। নতুন কলোনির এদিকটা এমনিতেই ফাঁকা। রাস্তার দু'পাশে ছড়ানো-ছিটানো গোটাকয়েক অর্ধসমাপ্ত বাড়ি। কাজেই মানুষজনের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। তার উপর লোডশেডিংয়ের সৌজন্যে চারপাশে নিকষ কালো অন্ধকার। একদম শেষপ্রান্তে দোতলা বাড়িটার সামনে দাঁড়াল জনাদশেক ছায়ামূর্তি। আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা। এধার-ওধার নজর বুলিয়ে গেট ঠেলে দলটা সোজা বাগানে।

এগোয় নিঃশব্দে। লঘু পায়ে। সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

বাড়িতে। নাহ! ছিটেফোঁটা আলোর দেখা নেই। অর্থাৎ বাড়ির সদস্যরা নিদ্রামগ্ন। নিশ্চিন্তে নিদ্রায়। নিমেষে ক্ষিপ্রগতিতে সকলে সদর দরজায়। সামান্য কসরতে দরজা খুলে সোজা বাড়ির ভিতর।

"ওদিকে সব ঠিকঠাক তো মিঃ বিশ্বাস?" চাপা স্বর প্রতিভাসের।

"নিশ্চিন্তে থাকুন। ঢুকেই প্রদ্যোৎকে মিস্‌ড কল দিয়েছি। গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলল বলে।" ততোধিক চাপা স্বর সুপর্ণর।

"ওকে। চলে আসুন সবাই। কুইক।"

টর্চের মৃদু আলোয় শুরু অপারেশন। একতলার তিনখানা ঘরে আসবাবের প্রাচুর্য থাকলেও জনমানবশূন্য। আশাহত দলটা। এমনটা হওয়ার তো কথা নয়। প্রতিভাসের কপালে ভাঁজ। উদ্বেগে ভাসছে মন। অনুমানের ভিত্তিতে ঝাঁপালেও গত ঘণ্টাদুয়েকের ম্যারাথন অনুসন্ধানে নিশ্চিত সাফল্যের হাতছানিতে এগিয়েছে প্রতিভাস ও সুপর্ণ। তা ছাড়া রনির সেলফোনের বর্তমান অবস্থিতি কলোনির এই বাড়িতেই। থানা থেকে তো তেমন ইনফরমেশনই এসেছে। তা হলে!

দলটা সবেগে করিডোরে। দৃষ্টি কোণের ঘরে। তালাবন্ধ। সুপর্ণর নির্দেশে একজন কনস্টেবলের প্রচেষ্টায় পাল্লা খুলতেই সকলের নজর ঘরজুড়ে বিক্ষিপ্ত রান্না-খাওয়ার সরঞ্জাম।

অগত্যা দোতলা অভিযান। করিডোরে ঘেঁষা তিনখানা ঘরের প্রথম দুটো ভিতর থেকে বন্ধ। শেষের ঘর বাইরে থেকে বন্ধ। পাল্লায় তালা। দলটায় টানটান উত্তেজনা। সুপর্ণর নির্দেশে দোতলায় ওঠার মুখে মোতায়েন দু'জন কনস্টেবল।

বাকিদের নিয়ে দুটো দলে ভাগ হয়ে সুপর্ণ ও প্রতিভাসের দুরন্ত ক্রিয়াকাণ্ডের শুরু। দেওয়ালে আলোর উৎসমুখ। সুইচ টিপলেই দরজায় তুমুল করাঘাত। মিনিটপাঁচেক। দুটো ঘরের ভিতরেই চাপা গুঞ্জন।

"রনি, জানি তুমি ভিতরে আছ। এক্ষুনি না খুললে আমরা কিন্তু দরজা ভাঙব," উচ্চ কণ্ঠে প্রতিবাদ প্রতিভাসের।

নিমেষে সব চুপচাপ। দরজা বন্ধই।

"আর-এক মুহূর্ত দেরি নয়। পুলক, দরজা ভাঙো," নির্দেশ সুপর্ণর।

নিমেষে সকলে তৎপর। কাজ শুরু। বারকয়েকের সম্মিলিত পদাঘাতে পাল্লা ভেঙে চুরমার। তৎক্ষণাৎ আরও কয়েকজনের সঙ্গে প্রদ্যোৎ দোতলায়। ক্ষিপ্রগতিতে কয়েকজন কনস্টেবল ঘরের ভিতর থেকে রনিসমেত চার ছোকরাকে বের করে।

"একি! আমাদের এভাবে ধরছেন কেন? কী করেছি আমরা?" উদ্ধত রনি।

"কী করেছ জান না? অর্কপ্রভ কোথায়?" রাগে মুখ-চোখ লাল প্রতিভাসের।

"অর্কপ্রভ কোথায় তার আমি কী জানি! জানার কথা পুলিশকাকুর। কী পুলিশকাকু, অর্কপ্রভ কোথায়?" বিকারহীন রনি। ঠোঁটে চাপা হাসি।

বিস্মিত প্রতিভাস। হতবাক। অবাক সুপর্ণ। এত বড় অন্যায় করেও কোনও হেলদোল নেই ছেলেটার। কী উদ্ধত আচরণ!

কয়েক মুহূর্ত। নিজেকে সংযত করতে পারে না প্রতিভাস। সপাটে চড় মারে রনির গালে।

"অভদ্র, অসভ্য ছেলে। বড়দের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জান না? কাকিকে ডেকো আগে। পরে দেখা যাবে এত বোলচাল কোথায় থাকে!" শাণিত দৃষ্টি প্রতিভাসের।

আচমকা পাশের বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে দরজায় সজোরে আঘাত। বারবার। তার মানে ঘর খালি নয়। ভিতরে কেউ আছে। সকলে শশব্যস্ত। পলকে সুপর্ণর বন্দুকের গুলিতে তালা চূর্ণবিচূর্ণ। সামান্য ধাক্কায় উন্মুক্ত পাল্লা। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে বাইরে লতিকা। খাকি পোশাকের দলটাকে দেখে আঁতকে ওঠে। পুলিশ! চকিতে চোখ-মুখ ফ্যাকাসে। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুক দুরদুর। এবার নিশ্চিত হাজতবাস। কেন এসেছে এরা তা তো অজানা নয়!

"আমি কিছু করিনি বাবু। আমি কিছু করিনি। এরা আমাকেও তুলে এনেছে। ভিতরে খোকাবাবু আছে। তাকে বাড়ি পৌঁছে দিন। মনে বড্ড কষ্ট পাচ্ছে খোকাবাবু। দাদুর জন্য শুধুই কাঁদছে," হাউমাউ লতিকার।

পরক্ষণে পাশে নজর। রনির কটমট দৃষ্টি। থমকে গেল স্বতঃস্ফূর্ততা। মুখ শুকিয়ে আমসি লতিকার।

সেদিকে তাকিয়ে আশ্বাস সুপর্ণর, "ভয় পেও না মাসি। ওরা তোমার কিছু করতে পারবে না। আমরা আছি।"

ততক্ষণে টাবুনকে নিয়ে প্রতিভাস ঘরের বাইরে। সকলের মুখে সাফল্যের হাসি। নিশ্চিন্তের শ্বাস। সুপর্ণ জড়িয়ে ধরে টাবুনকে। মুক্তির আশ্লেষে টাবুনের চোখে জল। ভেজা চোখে খাকি পোশাকের দলে নজর বুলিয়ে রনিতে টাবুনের স্থির দৃষ্টি।

"রনি তুমি! তোমাকেও ধরে এনেছে? কাকুরা উদ্ধার করল?" এত ক্লান্তিতেও টাবুনের চোখে খুশির আলো।

"ওকে কেউ ধরেনি টাবুন। রনি আর ওর বন্ধুরা তোমায় তুলে এনে এখানে আটকে রেখেছিল," জানায় প্রতিভাস।

"সে কী রনি! কেন?" চুপচুপে বিস্ময় টাবুনের।

"কেনর উত্তর রনিই দেবে। দিতে হবেই। কিন্তু আর সময় নষ্ট নয়। থানায় ফিরে আগে তোমার বাবাকে খবরটা জানাতে হবে টাবুন। ইমিডিয়েট ছোকরাগুলোর গতি করুন মিঃ বিশ্বাস। কুইক," তাড়া প্রতিভাসের।

বাবার কথায় খুশিতে ভাসা টাবুনের। মাকে দেখতে পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা মন। কিন্তু দাদু! উদ্বেগের চোরাস্রোত, সমগ্র সত্তায়।

"দাদু! দাদু কেমন আছে?"

"খুব ভাল না হলেও কিছুটা সুস্থ। টেনশন কোরো না। উনি ভাল হয়ে যাবেন। হয়তো কিছু সময় লাগবে। প্রদ্যোৎ, ছোকরাগুলোকে ভ্যানে তুলে তোমরা যে যার উঠে পড়ো। মাসি, আমাদের সঙ্গে এসো। চলো টাবুন। আসুন মিঃ মিত্র," এগোয় সুপর্ণ। অনুসরণ সকলের।

ঘড়ির কাঁটায় রাত বারোটা। কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে গত কয়েকদিনের ঘটা যাওয়া ঘটনায় আজই যবনিকা টানতে

স্বতঃপ্রবৃত্ত সুপর্ণ ও প্রতিভাস। সুপর্ণর ফোন পেয়ে শিবম অ্যাপার্টমেন্টে হাজির শমীক রায়, সায়ন দত্ত, ইন্দ্রজিৎ হালদাররা। উত্তেজনায় ফুটছে। অর্কপ্রভকে পাওয়ার খবরে সকলে খুশিতে ভাসছে। যদিও বিস্তারিত কিছু জানে না। জানে না কে এই জঘন্য কর্মকাণ্ডের নায়ক। শুধু জেনেছে অর্কপ্রভকে উদ্ধার করা হয়েছে। গত দিনচারেকের দুশ্চিন্তার মুক্তিতে স্বস্তি। শুধুই স্বস্তি। এত রাতেও অ্যাপার্টমেন্ট চত্বর আলোয় ভাসছে। হলঘরে আলোর বন্যা। সুপর্ণর নির্দেশে ছোটখাট জমায়েতের প্রায় সকলেই হাজির।

সুরলহরী কর্তৃপক্ষের আচমকা ফোন পেয়ে বিচারকবৃন্দ উপস্থিত হলেও রীতিমতো বিস্মিত।

শ্রীমধী সেন তো শমীককে বলেই ফেললেন, "কী ব্যাপার মিঃ রায় এত রাতে হঠাৎ তলব? কোন অঘটন?"

"অঘটন ঘটলেও আপাতত রেহাই। একটু ধৈর্য ধরুন ম্যাডাম। সব জানতে পারবেন।"

সুপর্ণর তলবে উপস্থিত মিডিয়া। ব্যস্ত চলাচলে।

জিপ থেকে নেমে টাবুন আর লতিকাকে নিয়ে প্রতিভাস ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢোকে। কনস্টেবলদের প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দেয়। পরক্ষণে জনাচারেক কনস্টেবলের প্রহরায় রনির দলসমেত হলঘরে সুপর্ণ।

জিপ থেকে নেমে টাবুন আর লতিকাকে নিয়ে প্রতিভাস ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢোকে। কনস্টেবলদের প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দেয়। পরক্ষণে জনাচারেক কনস্টেবলের প্রহরায় রনির দলসমেত হলঘরে সুপর্ণ।

ছেলেকে দেখে আঁতকে ওঠে রজত অগ্রবাল। জমায়েতে তাকে দেখেছে শমীক।

"এ কি রনি! তোমার এ দশা কেন? একে তো দু'দিন বাড়ি ছাড়া। তায় হাতে হাতকড়া! ব্যাপার কী ইন্সপেক্টর?" রজত সুপর্ণের মুখোমুখি হন।

"ব্যাপার ছেলের মুখ থেকেই শুনবেন। ভাল লাগবে। না বললে আমরা তো আছি। এখন চুপচাপ বসুন," গম্ভীর সুপর্ণ।

"সে না হয় শোনা যাবে। কিন্তু হাতে হাতকড়া কেন সেটা তো বলবেন মিঃ বিশ্বাস," উত্তেজিত রজত।

"আপনার গুণধর পুত্রের কীর্তির পাওনা আর কী!" ব্যঙ্গোক্তি সুপর্ণর।

"টাবুন, টাবুন। কোথায় আমার টাবুন?" ঝড়ের বেগে প্রবেশ মাঝচল্লিশের সঙ্গীতা চট্টোপাধ্যায়ের। আলুথালু বেশবাস। উস্কোখুস্কো চুল। চোখের তলায় কালি। বিষাদের প্রতিমূর্তি।

"মা, মাগো," ছুটে এসে সঙ্গীতাকে জড়িয়ে ধরে টাবুন।

হাউহাউ কান্না সঙ্গীতার। কাঁদছে টাবুন। শব্দহীনতায় ভাসছে হলঘর। উপস্থিত সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। শুধুই সকলের নীরব দৃষ্টি বিনিময়।

কয়েক মিনিট। পাশ থেকে দেবারতির মৃদু স্বর, "প্লিজ মিসেস চট্টোপাধ্যায় একটু সংযত হোন। টাবুন তো ফিরে এসেছে। আর ভয় কী!"

কোনও রকমে নিজেকে সামলে সঙ্গীতার রুদ্ধস্বর, "ঠিক বলেছেন। টাবুন তো এখন আমার কাছে। আর কাঁদব না।"

"মিসেস মিত্র, প্লিজ ওঁকে নিয়ে বসুন। হ্যাঁ, সামনেই বসুন না। তুমি মায়ের কাছে থাকো টাবুন। মিঃ চট্টোপাধ্যায় প্লিজ!" অনুনয় সুপর্ণর।

ভেজা চোখে টাবুনের মাথায় হাত বুলিয়ে চেয়ার দখল অভ্রনীল চট্টোপাধ্যায়।

জমায়েতে নজর বুলিয়ে প্রতিভাস শুরু করে, "এত রাতে সকলকে বিরক্ত করার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। গত দিনচারেক সুরলহরী কর্তৃপক্ষ এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। কাউকে জানানো সম্ভব ছিল না। বেশি লোক জানাজানিতে পরিস্থিতি ঘোরালো হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ছিল দুশ্চিন্তাও।"

"তাই তো কর্তৃপক্ষকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে ওঁর আসা। উনি একজন রহস্যভেদী," গম্ভীর স্বর সুপর্ণর।

"রহস্যভেদী! তার মানে রহস্য মোড়া কোনও ঘটনার উপস্থাপনা! গ্রেট!" মন্তব্য আর-এক বিচারক জয়ন্ত সরকারের।

প্রতিভাসের স্থির দৃষ্টি জয়ন্ত সরকারে।

"ঠিক ধরেছেন। সে প্রসঙ্গে আসছি। গত সোমবার সুরলহরীর প্রতিযোগী অর্কপ্রভ একদিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিল। অবশ্যই কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে। আসলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ওই সময় অর্কর দাদুর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়েছিল। নাতিকে দেখার প্রবল আকুতি। সে কারণেই বাড়ি যাওয়া অর্কর। ফেরার কথা ছিল পরের দিন। অর্থাৎ মঙ্গলবার। যদিও ফেরা হয়নি। ফিরতেও পারেনি ছেলেটা। কেন জানেন? মঙ্গলবার দিনের আলোয় অপহৃত হয়েছিল অর্কপ্রভ।"

মুহূর্তে হলঘরে গুনগুন, ফিসফাস। বিস্ময়ের সম্মিলিত বিস্ফোরণ।

"সে কী! দিনের বেলায় এমন কাণ্ড!"

"হ্যাঁ। দিনের আলোয়। একবারে ছকে বাঁধা পরিকল্পনা। পাবলিক বুথ থেকে ফোনে ডাকা হয়েছিল অর্ককে। ডেকেছিল পবন সিং। সে সময় অর্কর দাদু একখানা ওষুধেরও প্রয়োজন ছিল। ওষুধ আনা হবে। পবনের সঙ্গে দেখাও হবে। এমনটা ভেবেই অর্কর বেরনো। পবন এই অ্যাপার্টমেন্টের সিকিউরিটি গার্ড ছিল। পরিচিত। যতটুকু শুনেছি প্রতিযোগীদের সঙ্গে আপনার ভালই ছিল

সোলজারটির। এটাই কাজে লাগিয়েছিল অপহরণকারী। তো সে যাই হোক। ওষুধ কিনে বেরোতেই পবনের সঙ্গে দেখা অর্কর। কথায়-কথায় হাঁটাপথে কিছুটা এগনো। আর তারপরই অপহরণকারীর খপ্পরে। গাড়িতে তুলে উধাও গোপন ডেরায়। উদ্ধারের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওখানেই থাকা অর্কর," ধীর বক্তব্য প্রতিভাসের।

"ও মাই গড! কী সাঙ্ঘাতিক ঘটনা!" আঁতকে ওঠেন শ্রীময়ী সেন।

"কে এমনটা করেছে মিঃ মিত্র? আর কেন?" প্রশ্ন জয়ন্ত সরকারের।

"কে করেছে এখনই জানবেন। তবে কেন সে বিষয়টি বোধগম্য নয় আমাদেরও। আমরা নিশ্চিত টাকার জন্য নয় এই অপহরণ। কারণ মুক্তিপণ দাবি করে মিঃ চাটার্জির কাছে কোনও ফোনই আসেনি। রনি, এ ব্যাপারে তুমি কি কোনও আলোকপাত করতে পার?" প্রতিভাসের স্থির দৃষ্টি রনিতে।

"রনি! এর মধ্যে রনি আসছে কেন মিঃ মিত্র?" উচ্চ কণ্ঠ রজতের।

"কারণ আছে বলেই আসছে। শুনলে আশ্চর্য হবেন গাড়ির কাছে আনার জন্য মানে অপহরণকারীর হাতে অর্ককে তুলে দেওয়ার জন্য পবনকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। পবনের ঘর থেকে আমরা সে টাকা উদ্ধার করেছি। শুধু তাই নয়। পরে পবনের মুখ বন্ধ করার জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে। কী নিখুঁত পরিকল্পনা বলুন তো!" প্রতিভাসের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি জমায়েতে।

"সে আর বলতে! কিন্তু এসব করছে কে?" অধৈর্য 'দিনের আলো' দৈনিকের সংবাদদাতা উন্নয়ন বাগচি।

"চোখের সামনে দেখেও বুঝতে পারছেন না! স্ট্রেঞ্জ! সব ঘটনার মূল নায়ক রনি। রনি অগ্রবাল।"

"রনি! মিথ্যে বলছেন আপনি। রনি এমন কাজ করতেই পারে না। অসম্ভব।" উত্তেজিত রজত অগ্রবাল।

বিস্মিত সকলে। বছরপনেরোর একটি ছেলের এমন কাজ! অবিশ্বাস্য!

"অযথা চেঁচিয়ে সময় নষ্ট করবেন না মিঃ অগ্রবাল। এর বিরুদ্ধে সব প্রমাণ আমাদের হাতে। রনি, মুখ খুলবে। না অন্য ব্যবস্থা নেব," কঠোর স্বর সুপর্ণর।

"স্যার, এই ছেলেগুলোই গত দিনচারেক নতুন কলোনিতে যখন-তখন যাতায়াত করত।" জানায় নতুন কলোনির বাসিন্দা পবিত্র মজুমদার।

"তেমনটাই আন্দাজ করেছিলাম। শনাক্তের জন্যই আপনাদের কয়েকজনকে ডাকা। তা হলে মিঃ বিশ্বাস উটকো ঝামেলার রেহাই মিলল। হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম। সেরকমটাই তো হওয়ার কথা। কলোনির শেষ প্রান্তের দোতলাতেই তো অর্ককে আটকে রেখেছিল রনি ও তার দলবল। বাড়িটা তো আপনার, তাই না মিঃ অগ্রবাল?" প্রতিভাসের স্থির দৃষ্টি রজতে।

ঘাড় ঝুলে পড়েছে রজত অগ্রবালের। লজ্জায়, অপমানে কারও দিকে তাকানোর শক্তিটুকুও নেই। সমাজে তাঁর একটা সম্মান আছে। আছে ভালমানুষের পরিচিতি। তাঁর ছেলে হয়ে রনির এমন কুকর্ম! এই বয়সে! ভাবা তো দূর। কিছুতেই মানতে পারছেন না।

"স্পিক আউট রনি স্পিক আউট। অনেক রাত হয়েছে। সকলে ক্লান্ত। এ ক'টা দিনে অর্কর অনেক ধকল গিয়েছে। ওর বিশ্রাম দরকার," তাড়া সুপর্ণর।

"বলার কিছু থাকলে তো বলব," নির্বিকার রনির নেই কোনও হেলদোল। কৃতকর্মের জন্য নেই এতটুকু অনুশোচনাও।

"আমি সব বলব স্যার," আচমকা মুখ খোলে রনির এক সঙ্গী।

"একটা কথা বললে থাবড়ে মুখ ফাটিয়ে দেব," নিষ্ফল আস্ফালন রনির।

"বেয়াদপ ছেলে কোথাকার! লজ্জা বলে কিছু নেই। অনিল, সঞ্জীব এটাকে চেপে ধরে রাখো। হ্যাঁ, বলো কী বলছিলে। তা, তোমার নামটি কী?" হ্যাঁচকা টানে রনিকে এক পাশে সরিয়ে সঙ্গীর উপর দৃষ্টি সুপর্ণর।

"আজ্ঞে স্যার বিপ্লব। হ্যাঁ স্যার, রনির কথাতেই গত মঙ্গলবার বিকেলে অর্ককে তুলে আমরা কলোনির দোতলায় ঢোকাই। ওটা রনিদেরই বাড়ি। পবন এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছে। সে জন্য পবনকে রনি নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিল। আমাদের প্রত্যেককে দশ হাজার করে দিয়েছিল। অর্ককে তুলতে সাহায্য করার জন্য। রনির ইচ্ছেতেই ওকে সাহায্য করা। কিন্তু ও যে কেন ছেলেটাকে তুলে এনেছিল জানি না স্যার," অকপট স্বীকারোক্তি সঙ্গীর।

"তার মানে পবনকেও তোমরা হত্যা করেছ?" প্রশ্ন সুপর্ণর।

"আমরা তিনজন নই স্যার। রনি। রনি ঠান্ডা পানীয়ে পুরো দু'পাতা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল পবনকে।" জানায় বিপ্লব।

"এর পর আপনার আর কিছু বলার আছে মিঃ অগ্রবাল?" ঠান্ডা স্বর প্রতিভাসের।

নীরব রজত অগ্রবাল। ভাষাহীন দৃষ্টি রনির মুখে।

"অস্বীকারের আর কোনও পথ খোলা নেই। তুমিই নাটের গুরু। কোনও ধানাইপানাই নয়। এবার চটপট বলে ফেল কেন করেছ এসব," কঠোর প্রতিভাস।

হলঘর জুড়ে নিশ্ছিদ্র নীরবতা। সকলের পলকহীন, কৌতূহলী দৃষ্টি রনিতে। মিডিয়া স্থাণুবৎ। এতটুকু ছেলের এমন মানসিকতায় সবাই হতবাক। কীসের তাড়নায় এমনটা ঘটানো!

"হ্যাঁ। আমিই এসব করেছি। কেন জানেন? স্বপ্নভঙ্গের হতাশায়। ভেবেছিলাম সুরলহরী জয়ী হব। ট্রোফি সাজিয়ে রাখব ড্রইংরুমে। সবাইকে দেখাব। কপাল মন্দ। ফাইনালের আগেই বাদ। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আউট। স্বপ্ন ভ্যানিশ। প্রতিযোগিতা চলাকালীন অর্কর সঙ্গে ভালই ভাবসাব হয়েছিল। বাদ পড়লেও অর্কর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পবনদার মারফত। অর্কর ফাইনালে পৌঁছনোর খবর শুনে নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। অর্ক ট্রোফি পাবে! এ হতে পারে না। আমি আর অর্ক একই রকম গাইছিলাম। আমি বাদ। অথচ ও ফাইনালে। মানতে পারিনি। আমি ট্রোফি পাইনি। ওকেও পেতে দেব না। শুরু পরিকল্পনা। সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুজরান। মিলেও গেল। একদিন ছাড়ে অর্কর বাড়ি যাওয়ায় সোনায় সোহাগা। চটজলদি রূপায়ণ। অর্কর অপহরণ। পবনদাকে খতম। স্যার, যা করার আমিই করেছি। সব আমার পরিকল্পনা। তন্ময়, পলাশ, অপূর্ব ওদের কোনও দোষ নেই। সঙ্গ দিয়ে শুধু সাহায্য করেছে। ওদের ছেড়ে আমায় শাস্তি দিন," তেজী স্বর রনির। ঘাড় নিচু। ঝড় থেমে শান্ত প্রকৃতি। নীরব ধারাপাতে স্বাভাবিকে ফেরা।

চমক সকলের। কী সাংঘাতিক ছেলে! হারজিতের রসায়নে শুধু একখানা ট্রোফির জন্য এমন কাণ্ড! শুধু অপহরণই নয়। মানুষ খুন পর্যন্ত। আপাতত স্বীকার যে করেছে এতেই স্বস্তি।

"কথায় আছে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। কিছু যদি না-ও করে সঙ্গ দিয়েই তোমার সঙ্গীরা আজ দোষী। কাউকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার আমাদের নেই। সে দায়িত্ব আইনের। অন্যায় পথে কোনওদিন গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না রনি। স্বপ্ন অধরাই রয়ে যায়। একবার ব্যর্থ হলেও উপযুক্ত পরিশ্রমে সাফল্য নিশ্চিত। প্রবাদে আছে, ফেলিয়োর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। নিজেকে ভাল করে তৈরি করলে ভবিষ্যতে সাফল্য পেতেই। জীবনের প্রতি পদে-পদে হারজিতের লড়াই থাকবেই। জিতলে স্বাভাবিকে খুশির উড়ান। হারলে কষ্ট পেলেও মানিয়ে নিতে হয়। যা করেছ তার জন্য এখন আক্ষেপ করলেও কিছু নেই। আইন আইনের পথে চলবে। তোমার চলা ও সেই পথে রনি," মন্তব্য প্রতিভাসের।

"শোনো রনি, তোমার ভুল ভাঙানো দরকার। প্রতিযোগিতার বিচারের দায়িত্বে ছিলাম আমরা চার বিচারক। প্রতিটি সিদ্ধান্ত চারজন মিলে নেওয়া। তুমি আর অর্ক এক রকম গাইছিলে না বলেই তুমি বাদ। অর্ক ফাইনালে। এমনটাই তো হওয়া উচিত। তাই না রনি!" বক্তব্য প্রতীক ভট্টাচার্যের।

"রনি যা করেছে জানি তার কোনও ক্ষমা নেই মিঃ বিশ্বাস?" সুপর্ণর হাত আঁকড়ে আকুল প্রশ্ন রজত অগ্রবালের।

"ঠিক কীভাবে বাঁচানোর কথা বলছেন বলুন তো মিঃ অগ্রবাল। পারলে না ঢুকিয়ে বাইরে বহালতবিয়তে আপনার ছেলের খোরার ব্যবস্থা করা! সবই তো শুনলেন। আপনার মতো সজ্জন ব্যক্তির কাছ থেকে এমন অনুরোধ আইনের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর অর্থ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। তা সম্ভব নয় মিঃ অগ্রবাল। পুলক, ছেলেগুলোকে নিয়ে যাও। আপাতত ফাটকে ঢোকাও। কাল পরবর্তী পদক্ষেপ," নির্দেশ সুপর্ণর। নীরবে হলঘর পরিত্যাগ রজত অগ্রবালের।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাত এগিয়েছে। ঘড়ির কাঁটায় দুটো। জমায়েত পাতলা। কভারেজ সেরে ফিরেছে মিডিয়া। বিচারকবৃন্দও বাড়িমুখো। অন্যরাও যে যার গন্তব্যে, মন স্বাভাবিকে ফেরাতে প্রিয়জনের সান্নিধ্য একান্ত প্রয়োজন। সে কারণে সুরলহরী কর্তৃপক্ষ খানিকটা সময় অর্ককে বাড়িতে কাটানোর অনুমতি দিয়েছে। কাল বিকেলে ফিরবে শিবিরে। পরবর্তীতে জোরদার প্রস্তুতি।

"চলুন মিঃ চ্যাটার্জি আপনাদের পৌঁছে দিই," অনুরোধ সুপর্ণর।

"চলুন আমরাও এগোই," অনুসরণ প্রতিভাস ও দেবাব্রতির।

নিশ্চিন্ত শমীক। খুশি সায়ন, ইন্দ্রজিৎ। যাক, সুরলহরীর ফাইনাল তা হলে হচ্ছে।

ছবি: রৌদ্র মিত্র

শব্দসন্ধান

১	২	■	■	৩	■	৪	৫
৬		৭	■	৮	৯		
১০			■	১১			
■	১২			■	■	■	
১৩	■	■	■	১৪	১৫	১৬	■
১৭	১৮	১৯	২০	■	২১		২২
২৩				■	২৪		
২৫		■		■	■	২৬	

পাশাপাশি

১। বায়সপক্ষী।
৪। এখন, এবার।
৬। মৃদু। ভারীর উলটো।
৮। অন্যের অধীন।
১০। কাজে ব্যাপৃত।
১১। ধ্বংস।
১২। পথের পাঁচালীর তৃতীয় সর্গ 'অক্রূর সংবাদ'... 'আম্রাঁটি___'।
১৪। স্বপ্নকে কবিতায় যা বলে।
১৭। জাঁকজমক।
২১। রতনে___চেনে...প্রাচীন প্রবাদ।
২৩। বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলনের স্বনামধন্য শহিদ।
২৪। উর্দুতে 'মশাই'। বাংলাতেও শব্দটা ব্যবহার করা হয়।
২৫। অন্ধকার।
২৬। তালের প্রথম মাত্রা।

উপর-নীচ

১। হিন্দিতে গল্প।
২। কলকণ্ঠে আওয়াজ।
৩। অন্য।
৪। অধ্যয়ন করা হয়েছে এমন।
৫। ___র কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। রুই___।
৯। 'সারা'কে উলটে দিলেই যা হয়।
১৩। গরমকালে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এটি খাওয়ার খুব দরকার হয়।
১৫। মার্গসঙ্গীতের একটি রাগ।
১৬। খ্যাঁদানাক হলে শুদ্ধভাষায় এটি বলা হয়।
১৮। প্রশ্রয়, চিহ্ন।
১৯। আরব্যরজনীতে এই কাল্পনিক পাখির অনেক উল্লেখ আছে।
২০। সুন্দরবনের একটি নদী।
২২। নক্সসংখ্যক।

গত সংখ্যার সমাধান

শালুক

নিজের হাতে

বরফের দেশে না গিয়ে বাড়িতেই বানাও পেঙ্গুইন

উপকরণ: একটা হজমিগুলির শিশি, মাউন্টবোর্ড, আঠা, কাঁচি, অ্যাক্রিলিক রং।

কীভাবে করবে: ছবি অনুযায়ী আকৃতিদু'টি প্রথমে মাউন্টবোর্ড থেকে কেটে নিতে হবে। ত্রিভুজটি দিয়ে হবে পেঙ্গুইনের ঠোঁট ও অন্যটি দিয়ে হবে পেঙ্গুইনের ডানা। এবার শিশির দু'পাশে ডানাদু'টি আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। ত্রিভুজটি ঠোঁটের মতো ভাঁজ করে শিশির ঢাকনার গায়ে আটকে দাও। দ্যাখো, গোটা শিশিটা কেমন পেঙ্গুইনের চেহারা নিয়েছে। শেষে পুরো আকৃতিটা পেঙ্গুইনের রঙে রং করে দাও। ব্যস, এবার কে বলবে এই পেঙ্গুইন বরফের দেশ থেকে আসেনি!

গুরুপ্রসাদ দে
ফোটো: প্রদীপ আদক

২ ১

বুবুনের শিম্পাঞ্জি

জয় সেনগুপ্ত

সেদিন বাবা-মা'র সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখে এসে এক অদ্ভুত বায়না করল বুবুন।

চিড়িয়াখানায় গিয়ে মনে হয়েছিল সে যেন এক অন্য জগতে এসে পড়েছে। এই প্রথম চিড়িয়াখানায় যাওয়া বুবুনের। সামনাসামনি এত রকম জীবজন্তু তো আগে কখনও দেখেনি। যা দেখেছে, টিভিতে। এত রকম জীবজন্তু, বাঘ, ভল্লুক, গন্ডার, কুমির, জলহস্তী, শিম্পাঞ্জি, আরও কত কী! নানা ধরনের সাপ। অজস্র রংবেরঙের পাখি। সেগুলোর বেশির ভাগের নামই তো সে জানে না। বাবা-মা হয়রান হয়ে পড়ছিল ওকে সামলাতে। প্রশ্নের পর-প্রশ্ন করছিল বাবাকে, আর মাঝে-মাঝেই মায়ের হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল এদিক-ওদিক।

ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল মিনুমাসিদের সঙ্গে। ওরাও এসেছে

চিড়িয়াখানায়। মিনুমাসি, মেসোমশাই, তাঁদের দুই মেয়ে ভুটু আর মিমি। ভুটু বুবুনেরই বয়সি, মিমি কিছুটা বড়। ওদের পেয়ে বুবুনের আহ্লাদ বেড়ে গেল আরও। মেসোমশাই বললেন, "এত পশুপাখির মধ্যে কোনটা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগল বুবুন?"

বুবুন একটু ভেবে উত্তর দিল, "শিম্পাঞ্জি। কীরকম বুদ্ধিমান প্রাণী ওরা বলো তো মেসো! ঠিক মানুষেরই মতো হাবভাব, তাই না?"

মেসোমশাই ফোটো তোলার জন্য বুকপকেট থেকে মোবাইলটা বের করে একটা জিরাফের দিকে তাক করে বললেন, "শিম্পাঞ্জিকে ঠিকমতো ট্রেনিং দিলে ওরা বুদ্ধির দৌড়ে হয়তো আমাদের হারিয়ে দেবে।"

মিনুমাসিদের বাড়িতে পোষ্য আছে, একটা স্পিচ, আর একটা পাগ। খুব সুন্দর কুকুর দুটো, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। মিমি ভ্রু কুঁচকাল, "কেন, কুকুরের বুদ্ধি কম কীসে? ট্রেনিং দিলে ওরাও শিম্পাঞ্জির চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।"

ভুটুও সায় দিল মিমির কথায়। তবে পিসেমশাই তখন মোবাইলে ফোটো তুলতে ব্যস্ত। ওদের কথায় কান দিলেন না।

বাড়ি ফিরেই বুবুন বলল, সে ওই রকম একটা বাচ্চা শিম্পাঞ্জি পুষবে। বাবা-মা তো শুনে অবাক, শিম্পাঞ্জি আবার কেউ পোষে নাকি! পোষার জন্য পশুপাখির কি অভাব আছে? কত রকম কুকুর, রংবেরঙের সুন্দর-সুন্দর পাখি...সেসব ছেড়ে কিনা শিম্পাঞ্জি! কিন্তু বুবুন তা শুনলে তো! সে কান্নাকাটি জুড়ে দিল।

মা হেসে বললেন, "এরকম উদ্ভট শখ তোর হল কেন বল তো বুবুন, শিম্পাঞ্জি আবার কেউ পোষে?"

বাবা আদর করে বুবুনের চুলটা একবার ঘেঁটে দিলেন, "আমি তোকে একটা পাগ এনে দেব। মিনুমাসিদের পোষ্যদের চেয়েও সুন্দর। দেখবি, তোর পায়ে-পায়ে ঘুরবে সারাক্ষণ।"

"না, কুকুর আমি পুষব না। কুকুর তো অনেকের বাড়িতেই আছে। কুকুর আমার ভাল লাগে না। আমি শিম্পাঞ্জি পুষব," বুবুন মাথা নিচু করে বলল, "আমায় একটা শিম্পাঞ্জির বাচ্চা এনে দাও। সেটা আস্তে-আস্তে বড় হবে এখানে।"

বুবুনের বাবা-মা ভাবলেন, হঠাৎ একটা অদ্ভুত খেয়াল মাথায় এসেছে তাঁদের ছেলের, দু'-একদিন পরই সব ভুলে যাবে। তাঁরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে বুবুনকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করলেন।

সেদিনকার মতো কোনও রকমে বুবুনকে চুপ করানো গেলেও, পরদিন আবার সে শুরু করল বায়না। একটা বাচ্চা শিম্পাঞ্জি তাকে এনে দিতেই হবে। বুবুন এবার ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে উঠবে, সামনেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। লেখাপড়ায় খুবই ভাল বুবুন। ক্লাসে প্রতি বছর পরীক্ষায় প্রথম তিনজনের মধ্যে থাকে। কিন্তু শিম্পাঞ্জির চিন্তায় তার লেখাপড়ায় ক্ষতি হতে লাগল। বাবা বুবুনের মাকে বললেন, "ওকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে। কে জানত, এরকম অদ্ভুত বায়না করবে।"

মা বললেন, "বুবুন, তোর মনে নেই অয়ন তোকে কী বলেছিল? ভুলে গেলি সেকথা?"

বুবুনের মনে পড়ে গেল তার ক্লাসমেট, স্কুলে তার বেস্টফ্রেন্ড অয়নের কথা। অয়নের বাড়িতে একটা অ্যালসেশিয়ান ছিল। মাসছয়েক আগে সে মারা যায়। অয়ন ভীষণ ভালবাসত তাকে। অ্যালসেশিয়ানটা মারা যাওয়ায় খুব দুঃখ পেয়েছিল। স্কুলে বসে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ। ক'দিন নাকি খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। অয়নের বাবা-মা ছেলের ওই অবস্থা দেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর কোনওদিন কোনও পশুপাখি পুষবেন না তাঁরা। অবলা এই সব জীব মারা গেলে বাড়ির লোকের ভীষণ কষ্ট হয়। আসলে এত মায়া পড়ে যায় এদের উপর...

অয়ন বুবুনকে বলেছিল, "কুকুর, বিড়াল, পাখি আর কোনওদিন পুষব না, জানিস। এরা বেশিদিন বাঁচে না আর মারা গেলে ভীষণ কষ্ট হয় সকলের। পুষতে হলে কচ্ছপ পুষব। কারণ, কচ্ছপের আয়ু বহু বছর। আমি একদিন মারা যাব, কিন্তু কচ্ছপ বেঁচে থাকবে আরও অনেক-অনেকদিন।"

বুবুন শুনে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অয়নের দিকে।

আজ মা অয়নের কথা তুলে বোঝাতে লাগলেন বুবুনকে। বললেন, "অয়নকে দেখেছিস তো, পশুপাখি মারা গেলে কীরকম কষ্ট হয়! কী করবি শিম্পাঞ্জি পুষে! তার চেয়ে একটা ছোট রঙিন কচ্ছপ পোষ, যেগুলো অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখে। বাবা একটা অ্যাকোয়ারিয়াম আর কচ্ছপ কিনে দেবে তোকে।"

কিন্তু বুবুন কোনও কিছুই শুনতে রাজি নয়। সে জেদ ধরে বসে আছে, তার শিম্পাঞ্জি চাই-ই।

এক সপ্তাহ হয়ে গেল, বুবুনের মাথা থেকে শিম্পাঞ্জির ভূত নামল না। উলটে তার বায়না আরও বেড়েই চলল। বাবা-মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। লেখাপড়াও ডকে উঠল বলতে গেলে। আর দু'দিন পরেই এখানে আসবেন বুবুনের বড়পিসি আর পিসেমশাই। তাঁরা কী ভাববেন বুবুনকে এই অবস্থায় দেখলে! চিন্তায় পড়লেন বুবুনের বাবা-মা।

বুবুনের বড়পিসি আর পিসেমশাই কলকাতায় থাকেন। পিসেমশাই

কলকাতার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর। রোবট নিয়ে গবেষণা করছেন এখন। খুব ব্যস্ত মানুষ। বড়পিসি মাঝে-মাঝেই আসেন বুবুনদের ভবেশ্বরের বাড়িতে। এবার দু'জনে একসঙ্গেই এসেছেন, অনেক কষ্ট করে সময় বের করেছেন পিসেমশাই। বুবুনের জন্য ওঁরা এনেছেন অনেক কিছু, জামাপ্যান্টের পিস, একটা এয়ারগান, আর-একটা দারুণ ক্রিকেট ব্যাট। বুবুন ক্রিকেট খেলতে খুব ভালবাসে।

এত উপহার পেয়েও কিন্তু বুবুন খুশি হল না। চোখেমুখে তার আনন্দের কোনও চিহ্ন নেই। পিসি-পিসেমশাই একটু অবাক হলেন। বড়পিসি বললেন, "বুবুন, তুই ওরকম মনমরা হয়ে আছিস কেন? এগুলো পছন্দ হয়নি?"

পিসি-পিসেমশাইকে বুবুন তার দুঃখের কথা জানাল। বাবা তাকে কিছুতেই একটা বাচ্চা শিম্পাঞ্জি পুষতে দিচ্ছেন না। তার স্কুলের বন্ধুদের প্রায় সকলের বাড়িতেই পোষা জীবজন্তু আছে, কারও বাড়িতে পাখি, কারও বাড়িতে কুকুর, আবার কারও অ্যাকোয়ারিয়াম ভর্তি সুন্দর-সুন্দর সব লাল-নীল মাছ। তা হলে সে একটা শিম্পাঞ্জি পুষতে চেয়েছে তো, কী এমন অপরাধ করে ফেলেছে! তার বাবার তো আর টাকার অভাব নেই, একটা বিশাল নামী বিদেশি কোম্পানিতে উঁচু পদে চাকরি করেন তিনি। টাকার জন্য তো আর শিম্পাঞ্জি কেনা আটকাবে না! তা হলে কেন কিনে দিচ্ছেন না!

বাবার মুখে সেই চিড়িয়াখানায় যাওয়ার দিন থেকে সব ঘটনা শুনলেন পিসেমশাই। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। একটু পরে বললেন, "ঠিক আছে, বুবুনের যখন শিম্পাঞ্জি পোষার এত শখ, তখন আমিই ওকে একটা শিম্পাঞ্জি উপহার দেব না হয়।"

বাবা বললেন, "তুমি কী বলছ গো সুব্রতদা, শিম্পাঞ্জি পুষবে কী! আর তা ছাড়া এসব বন্যপ্রাণী তো বাড়িতে রাখাও নিষেধ সরকারিভাবে!"

পিসেমশাই বাবাকে শক্ত-শক্ত ইংরেজিতে কী সব বললেন, বুবুন কিছুই বুঝতে পারল না। তবে, বাবা আর 'না' করলেন না। হাসি-হাসি মুখে পিসেমশাইকে বললেন, "ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, একটা বাচ্চা শিম্পাঞ্জি এনেই দাও বুবুনকে।"

পিসেমশাই বললেন, "তবে বুবুন, মাসখানেক অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। আমি আর তোমার পিসি তো দু'-তিনদিন পরই বাড়ি ফিরে যাব, এখানে আসব আবার পরের মাসে। আর ও মাসের আটাশ তারিখে তোমার জন্মদিন। সেদিনই পাবে তোমার বাচ্চা শিম্পাঞ্জি।"

> তার স্কুলের বন্ধুদের প্রায় সকলের বাড়িতেই পোষা জীবজন্তু আছে, কারও বাড়িতে পাখি, কারও বাড়িতে কুকুর, আবার কারও অ্যাকোয়ারিয়াম ভর্তি সুন্দর-সুন্দর সব লাল-নীল মাছ।

বুবুন একটু দমে গেল। তারপর বলল, "এক মাস পর!"

"আরে, এক মাস দেখতে-দেখতে কেটে যাবে," পিসেমশাই হাসলেন।

একমাস খুব উৎকণ্ঠায় কাটাল বুবুন। নিয়মিত ফোন করতে লাগল পিসেমশাইকে।

বুবুনের জন্মদিনের ঠিক দু'দিন আগে, রোববার পিসি-পিসেমশাই এলেন। গাড়ির পিছনের ডালা খুলে বের করা হল বড়সড় একটা পিসবোর্ডের বাক্স। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "বাক্স করে কী এনেছ সুব্রতদা?"

পিসেমশাই হাসলেন, "এতে রয়েছে বুবুনবাবুর বাচ্চা শিম্পাঞ্জি।"

বুবুন এতক্ষণে বাড়ির ভিতর থেকে চলে এসেছে। পিসেমশাইয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে। পিসেমশাই বুবুনকে বললেন, "এর মধ্যে আছে শিম্পাঞ্জি, তোমার জন্মদিনের উপহার।"

বুবুন একটু আশ্চর্য হল। বলল, "বাক্সের মধ্যে শিম্পাঞ্জি।"

পিসেমশাই বললেন, "কেন, বাক্সের মধ্যে শিম্পাঞ্জি থাকতে পারে না?"

"নিশ্বাস নিতে না পেরে মারা যাবে তো!"

"কিচ্ছু হবে না। বাক্সের পিছন দিকে ফুটো করা আছে। দাঁড়াও, বাক্সটা ভিতরে নিয়ে গিয়ে আগে বের করি ওকে।"

পিসেমশাই, বাবা আর পিসেমশাইয়ের গাড়ির ড্রাইভার, তিনজনে ধরাধরি করে বাক্সটা বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। বুবুনও হাত লাগাল। বেশ ভারী বাক্সটা। হবে না-ই বা কেন? বাচ্চা হলেও একটা শিম্পাঞ্জির ওজন কি কম?

সবাই মিলে ঘরে ঢোকার পর, পিসেমশাই বললেন, "দাঁড়াও, এবার এটা খুলি।"

সেলোটেপ দিয়ে আটকানো ছিল বাক্সটা। খোলার পর দেখা গেল, সত্যিই তার মধ্যে আছে একটা তিন ফুট লম্বা শিম্পাঞ্জি। একটা লোহার খাঁচার মধ্যে বসে আছে। ওদের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছে। বুবুন আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

"এখন কিন্তু এই খাঁচার মধ্যেই থাকবে ও," পিসেমশাই বাক্সের ভিতর থেকে খাঁচাসমেত শিম্পাঞ্জিটাকে বের করে আনলেন।

বুবুন বলল, "ওকে বাইরে বের করবে না?"

"করব, তবে আজ নয়, কিছুদিন পর। এখন ও তো এই বাড়ির কাউকে চেনে না। হঠাৎ খেপে যেতে পারে। কিছুদিন যাক। ও একটু ধাতস্থ হয়ে নিক, তারপর খাঁচা থেকে বের করা হবে।"

শিম্পাঞ্জিটা জামাপ্যান্ট পড়ে

আছে মানুষের মতো, শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে, আর রোমশ হাত দুটোর কিছুটা অংশ।

পিসেমশাই বললেন, "ওকে একদম খাঁচা থেকে বের করবে না বুবুন। দু'-তিন মাস পর আমি আবার আসব, তখন ওকে বের করব। ওকে তো একটা চিড়িয়াখানা থেকে নিয়ে এসেছি। এখন একদম নতুন পরিবেশ। বাইরে বেরিয়ে কিন্তু ও তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিতে পারে।"

"এখন তো তুমি আছো পিসেমশাই, এখন একবার বের করো না, পরে আবার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ো," বুবুন খাঁচাটার গায়ে আলতো করে হাত ঠেকিয়ে বলল।

পিসেমশাই বুবুনের মাথায় হাত দিলেন। বললেন, "বললাম না, এখানে নতুন পরিবেশ। তোমরা একদম অচেনা ওর কাছে। আবার আসব যখন, তখন বের করব ওকে।"

"ঠিক আছে," মলিন মুখে বলল বুবুন।

একটু চুপ করে থেকে বুবুন বলল, "চিড়িয়াখানা থেকে ওকে কীভাবে এখানে আনলে পিসেমশাই?"

"চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর আমার বন্ধু, সেই স্কুল বয়স থেকেই। স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম। ওকে বলেই নিয়ে এসেছি।"

"ওকে আবার চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে না তো?" বুবুন উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল।

"না-না। ও এখন এখানেই থাকবে।"

"ও কী খাবে?" প্রশ্ন করল বুবুন।

"ফলটল দেবে। কলা দেবে," পিসেমশাই বললেন।

শিম্পাঞ্জিটা হাত-পা নাড়ছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বুবুনও ওর সামনে গিয়ে হাত-পা নাড়তে লাগল। বুবুন বলল, "আমি ওর নাম দেব খোকন। ও এখন একেবারেই বাচ্চা তো!"

পরদিন থেকে সারাদিন খোকনকে নিয়েই পড়ে রইল বুবুন। এর মধ্যে বুবুনের ইশকুলের কয়েকজন বন্ধু এসে খোকনকে দেখে গিয়েছে। খোকন সবাইকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। মাঝে-মাঝে হাত-পা নাড়ে আর চোখ পিটপিট করে। পিসেমশাই দু'দিন পরই কলকাতা ফিরে গেলেন।

খোকন কিন্তু কোনও কিছুই খায় না। না কলা, না অন্য কোনও ফল। খেতে দেওয়া হয়, কিন্তু সেগুলো সবই পড়ে থাকে খাঁচার ভিতর। বুবুন পিসেমশাইকে ফোন করল। পিসেমশাই বললেন যে, একদম নতুন জায়গা তো, তাই এখন কিছু খাচ্ছে না। সময়মতো ঠিকই খাবে ও। তারপর বললেন, "তোমার মাকে একবার ফোনটা দাও তো।"

মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন পিসেমশাই। ফোন রেখে মা বললেন, "চিন্তা করিস না বুবুন, দেখবি, আজ থেকেই হয়তো খাওয়াদাওয়া শুরু করবে তোর খোকন।"

সত্যিই তাই। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বুবুন দেখল, খোকনের কাছে রেখে আসা ফলগুলোর একটাও নেই। তার মানে ও সব খেয়ে নিয়েছে। বুবুন একছুটে মাকে গিয়ে বলে এল সেকথা। মা কিছু বললেন না, শুধু মুচকি হাসলেন।

প্রতিদিন বুবুন সকালে উঠে খোকনের কাছে যায়। বুবুন হাত-পা নাড়ে। খোকনও হাত-পা নাড়ে। গলা দিয়ে কীরকম একটা ঘরঘর আওয়াজ করে। কখনও বসে, আবার কখনও উঠে দাঁড়ায়। বুবুন শুধু ভাবে আবার কবে পিসেমশাই আসবেন আর খাঁচা খুলে শিম্পাঞ্জিটাকে বাইরে বের করবেন। একসময় স্নান সেরে খাওয়াদাওয়া করে বুবুন স্কুলে চলে যায়। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে প্রথমেই যায় খোকনের কাছে। বেশ কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কাটায়।

সন্ধেবেলা পড়া শেষ করে আবার খোকনের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে মজা করে বুবুন। তারপর রাতের খাওয়া সেরে আবার কিছুক্ষণ কাটায় খোকনের সঙ্গে। পরদিন আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

এভাবেই চলছিল। অঘটনটা ঘটল ক'দিন পরে। সেদিন বাবা অফিসে। বুবুনের স্কুলের ছুটি এখন। মা পাশের বাড়িতে মিতাকাকিমার কাছে গিয়েছেন।

মা বেরিয়ে যাওয়া মাত্র বুবুন উঠে পড়ল। এ ক'দিন শিম্পাঞ্জির খাঁচাটা বুবুনকে খুলতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু

খোকন বাইরে বেরিয়ে কী করে সেটা আজ তাকে দেখতে হবে। পিসেমশাই যতই বারণ করুন না কেন, তাকে আজ কৌতূহল নিবারণ করতেই হবে।

বুবুন খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। শিম্পাঞ্জিটা পিটপিট করে তাকাচ্ছে বুবুনের দিকে। খাঁচাটায় তালা দেওয়া নেই। একটা হুক দিয়ে আটকানো। বুবুন হুকটা টেনে খাঁচাটা খুলে দিল। খোলামাত্র কয়েক সেকেন্ড একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খোকন। তারপর আস্তে-আস্তে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে এল। বুবুন দেখল, শিম্পাঞ্জিটার জামার পিছনে পিঠের ঠিক মাঝখানে কী একটা লাগানো আছে, ছোট্ট চাকার মতো। জিনিসটা জামা ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। খোকন তখন একটু এগিয়ে গিয়ে ডাইনিং টেবিলটার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কিন্তু এই চাকার মতো জিনিসটা কী! এতদিন তো এটা তার চোখে পড়েনি! কারণ, খোকন সব সময় সামনের দিকে মুখ করেই বসে বা দাঁড়িয়ে থাকত। বুবুন চাকাটায় হাত দিল। বুঝতে পারল, চাকাটা খোকনের গায়ের সঙ্গে লাগানো আছে। বুবুন একটু ভাবল, তারপর টানাটানি করতে লাগল চাকাটা। চাকাটা খুব শক্ত করে আঁটা রয়েছে খোকনের গায়ে। বুবুন বাঁ দিকে ঘোরাতেই ঘুরে গেল সেটা। এবার চেষ্টা করল ডান দিকে ঘোরাতে। ডান দিকেও ঘুরছে এটা। ডান দিকে কিছুটা ঘোরাতেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। খোকন প্রচণ্ড জোরে নড়ে উঠল। তারপর ছোটাছুটি করতে লাগল ঘরময়। হঠাৎ একলাফে ডাইনিং টেবিলে উঠে পড়ল। পরক্ষণেই সেখান থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে। আবার এক লাফে সামনের বুক শেলফটার উপর উঠল। এবার ভয় পেয়ে গেল বুবুন।

"খোকন, নেমে আয়, নেমে আয়," বলে চেঁচাতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে খোকন।

এবার বুক শেলফ থেকে এক লাফে খোকন আলমারির মাথায়। তারপরই বিরাট একটা লাফ। আর লাফ দিতেই ফুল স্পিডে ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানটার সঙ্গে ধাক্কা খেল। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল মাটিতে। তারপর ঘাড় কাত করে শুয়ে রইল।

বুবুন দেখল খোকন নিস্পন্দ হয়ে

শিম্পাঞ্জিটা পিটপিট করে তাকাচ্ছে বুবুনের দিকে। খাঁচাটায় তালা দেওয়া নেই। একটা হুক দিয়ে আটকানো। বুবুন হুকটা টেনে খাঁচাটা খুলে দিল।

পড়ে রয়েছে আর ফ্যানে ধাক্কা খেয়ে তার শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে নানা ধরনের তার। পায়ের চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে স্টিলের হাত। ফাঁক হয়ে যাওয়া মাথার ভিতরে দেখা যাচ্ছে চকচকে স্টিল।

মা ফিরে এসে দেখলেন, বুবুন খোকনের পাশে বসে কাঁদছে। মাকে সব বলল ও। মা বুবুনকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "দুঃখ করিস না বুবুন, ওটা রোবট ছিল। তোর পিসেমশাইয়ের তৈরি। জ্যান্ত শিম্পাঞ্জি তো বাড়িতে আনা সম্ভব নয়।"

"রোবট ছিল?" বুবুন অবাক হয়ে গেল।

"হ্যাঁ," মা বললেন, "তোর পিসেমশাইয়ের নিজের হাতে তৈরি ওটা। জানিস তো, পিসেমশাই রোবট নিয়ে গবেষণা করেন। তোর বায়না শুনে ওঁর মাথায় এই প্ল্যানটা আসে। রোবট তৈরি করে তার উপর নকল শিম্পাঞ্জির পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন উনি। আর এমনভাবে প্রোগ্রামিং করা ছিল যে, ও মাঝে-মাঝেই হাত-পা নাড়ত। চোখ পিটপিট করত। হাঁটতে-চলতে, লাফাতেও পারত, সে-তো দেখতেই পেলি। আমরা ভেবেছিলাম, কিছুদিন পরই এই শিম্পাঞ্জির ভূত তোর মাথা থেকে নামবে। আর ততদিন এই রোবটটা নিয়েই মেতে থাকবি তুই।"

"তার মানে তোমরা সব জানতে? তুমি, বাবা সবাই?" বুবুন বুঝতে পারল বিরাট রকম ঠকে গিয়েছে সে।

"কী করব বল, তুই যা শুরু করেছিলি! একবারও বুঝলি না যে, শিম্পাঞ্জি কেউ বাড়িতে পোষে না!"

"কিন্তু ও যে মুখ দিয়ে আওয়াজ করত মাঝে-মাঝে!" বুবুন অবাক চোখে তাকাল মায়ের দিকে।

"ওর ভিতরে রেকর্ডার রয়েছে তো। তা থেকে মাঝে-মাঝেই আওয়াজ বেরোত।"

"ও যদি রোবট হয়, তা হলে ফল খেত কী করে?" বুবুন প্রশ্ন করল।

"রোবট কখনও কিছু খায়?" মা হাসলেন।

"তা হলে ফলগুলো সকালে উঠে আর খাঁচায় দেখতে পেতাম না কেন?"

"আমিই সকালে সরিয়ে রাখতাম ওগুলো। না হলে তোর তো আবার চিন্তায় ঘুম হবে না রাতে। খোকন খাচ্ছে না, এই বলে বারবার ফোন করবি পিসেমশাইকে। তবে এসব কিছুই হত না, তুই যদি খোকনের পিঠে লাগানো চাকাটা ঘুরিয়ে না দিতিস। ওটা ঘোরাতেই তো সব গন্ডগোল হয়ে গেল। রোবটটার প্রোগ্রামিংটাই অন্য রকম হয়ে গেল। ওরকম অদ্ভুত আচরণ শুরু করে দিল।"

বুবুন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। কোনও কথা বলল না। তবে এর পর থেকে সে আর শিম্পাঞ্জি পোষার বায়না করেনি।

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

যা হয়েছে

মাদারকে সেন্টহুড

এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে মাদার টেরিজাকে সেন্টহুড দেওয়ার কথা জানাল ভ্যাটিকান সিটি। সেন্টহুড অত্যন্ত মর্যাদার এক উপাধি। যাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয়, মনে করা হয়, তিনি ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ, তাঁর বার্তাবাহক। মাদারের মৃত্যুর দু'বছর পর থেকে তাঁকে এই উপাধি দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল।

নতুন পাঁচ জেলা

পশ্চিমবঙ্গে জেলার সংখ্যা ২০ থেকে বেড়ে ২৫ হচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বড় জেলাগুলো ভেঙে আরও পাঁচটি নতুন জেলা গঠন করা হবে। কালিম্পং, বসিরহাট, সুন্দরবন, ঝাড়গ্রাম এবং বর্ধমান (শিল্পাঞ্চল) নামে নতুন জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। এখন আধিকারিক পর্যায়ে নতুন জেলার চূড়ান্ত সীমানা গঠনের কাজ শুরু হয়েছে।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা

জাপানের ইয়োকোহমা শহরে বিশ্ব ক্লাব কাপের আসর বসেছিল। ফিফার ছ'টি মহাদেশীয় অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ন দল এবং আয়োজক দেশের একটি, সাতটি দলকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট হল। ফাইনালে আর্জেন্টিনার রিভারপ্লেট দলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল স্পেনের বার্সেলোনা। ফাইনালে মেসি একটি এবং সুয়ারেজ দু'টি গোল করেন। এই নিয়ে তিনবার বিশ্ব ক্লাব কাপ জিতল বার্সেলোনা। টুর্নামেন্টে পাঁচটি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন বার্সেলোনার গোল মেশিন লুইস সুয়ারেজ।

চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই

দ্বিতীয় আই এস এল-এর চ্যাম্পিয়ন হল চেন্নাইন এফ সি দল। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে, ঘরের মাঠে গোয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ট্রোফি ধরে তুলে নিল মাতারাজ্জির ছেলেরা। খেলার প্রথমার্ধ গোলশূন্য ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইমে ২-২ অবস্থায়, চেন্নাইয়ের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন স্টিভেন মেন্ডোজা। এবছরে ১৩টি গোল করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন তিনি। টুর্নামেন্টের সেরা গোলকিপার হয়েছেন চেন্নাইয়ের এডেল বেটো।

যা হবে

হাম্পি উৎসব

চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের এক সমৃদ্ধ শহর ছিল হাম্পি। দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে এই শহর ছিল বিশ্বের অন্যতম সেরা। তারপর সময়ের প্রবাহে হাম্পি তার গরিমা হারিয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আজও সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে নানান ঐতিহাসিক নিদর্শন। কর্নাটক রাজ্যের উত্তর-পূর্বে ঐতিহাসিক হাম্পি শহর তাই রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ হেরিটেজ তকমাও পেয়েছে। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই শহরে তিনদিনের হাম্পি উৎসব হয়। এবছরও এই উৎসব পালিত হবে।

পোঙ্গল উৎসব

জানুয়ারি মাসের ১৪ থেকে ১৭ তারিখ তামিলনাড়ুতে পালিত হবে পোঙ্গল উৎসব। চারদিনের এই উৎসবকে কৃষি উৎসবও বলা যায়। উৎসবের দিনগুলোয় কৃষিকাজের জন্য সূর্য ও ইন্দ্রদেবকে (বৃষ্টির দেবতা মনে করা হয়) ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের পুজো করা হয়। বাড়ির বাইরে মাটির পাত্রে দুধ আর চাল ফুটিয়ে সেই ভোগ নিবেদন করা হয় দেবতাদের। তৃতীয়দিনে দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হয় গোরুকে। চতুর্থদিনে ভোগপ্রসাদ বিতরণ দিয়ে উৎসবের শেষ হয়। নতুন জামাকাপড়ে সেজে ওঠা, উপহার বিনিময়, কলা এবং আমপাতা দিয়ে ঘর সাজানো, সাবেকি খেলার আয়োজন, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এই উৎসব পালন করেন সেখানকার মানুষজন।

আন্তর্জাতিক ঘুড়ি উৎসব

দূর আকাশের পিছনে লুকিয়ে থাকা স্বর্গে, দেবতাদের ঘুম ভাঙাতেই মর্তের মানুষেরা ঘুড়ি ওড়ায়। ঘুড়ি ওড়ানোর পৌরাণিক ব্যাখ্যা থেকে মানুষের এমন বিশ্বাসের কথাই জানা যায়। সেই ঘুড়ি ওড়ানোকেই এখন আন্তর্জাতিক উৎসবের চেহারা দিয়েছে গুজরাত। গুজরাত আর রাজস্থানে ঘুড়ি ওড়ানোর পরম্পরা রয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে সেই পরম্পরা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক উৎসবের চেহারা নিয়েছে। এবছর জানুয়ারির ১৪ এবং ১৫ তারিখ এই উৎসব হবে।

দু'টি ছবিতে অন্তত আটটি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তারপর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিও।

উত্তর : ২০ জানুয়ারি সংখ্যায়

গত সংখ্যার উত্তর

১) বাসের সামনের দিকে ছাদের লাইট নেই।
২) বাস-ড্রাইভারের চশমার ডাঁটি নেই।
৩) ব্যাকলাইট উধাও।
৪) ড্রিংক গ্লাস ছোট।
৫) বাসের সবচেয়ে পিছনের যাত্রী, বাচ্চা মেয়েটির কান চুলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে।
৬) বাসের ছায়াটি ছোট হয়ে গিয়েছে।
৭) প্রথম মেঘের স্থান পরিবর্তন হয়েছে।
৮) বাসের ছাদের প্রথম জানলার পাল্লাটি ছোট হয়ে গিয়েছে।

সুডোকু

		৫			৯		৭	২
৭	২				৬			
				৭		৪	৫	
৬		৭					১	
	৪			১			৬	
	৯					৮		৭
	৩	৯		২				
			১				৩	৫
১	৫		৩			৯		

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমন ভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকী, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে।

৭	৩	৫	৪	৮	৯	২	৬	১
৮	১	৯	২	৭	৬	৫	৪	৩
৬	২	৪	৩	১	৫	৯	৭	৮
৯	৮	২	৬	৩	১	৭	৫	৪
১	৪	৩	৫	২	৭	৬	৮	৯
৫	৭	৬	৯	৪	৮	১	৩	২
২	৬	৮	১	৫	৩	৪	৯	৭
৩	৯	১	৭	৬	৪	৮	২	৫
৪	৫	৭	৮	৯	২	৩	১	৬

সুডোকুর সমাধান করে ফোটো তুলে পাঠিয়ে দাও এই ইমেল আইডিতে, anandamelamagazine@gmail.com।

১ ৩
২ ৪

১			
২			
৩			
৪			

আ	ক	ব	র
ম	য়	দা	ন
ল	ং	জা	ম্প
কী	র্ত	নী	য়া

ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পরপর খোপে লিখে ফ্যালো। এবার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। চারটি জিনিসের নাম পাশাপাশি বাংলায় লিখে ফ্যালো, যাতে ওই বিশেষ জিনিসটির নাম উপর-নীচ করে পড়া যায়। পেয়েছ খুঁজে?

এবারের সঙ্কেত: কলস্বরে আওয়াজ।

৫ ডিসেম্বর সংখ্যার সমাধান:

আ ম ল কী

Go Figure

÷ × + −

সহজ

= ৫

৩ ৪ ৬ ১২

মাঝামাঝি

= ৬

২ ৬ ৯ ২৭

কঠিন

= ৩০

২ ৫ ৭ ২০
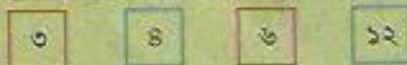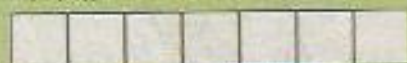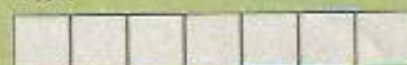
খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তরও হতে পারে।

৫ ডিসেম্বর সংখ্যার সমাধান:

সহজ: (১৯-৫)÷২+৪ = ১১

মাঝামাঝি: (৯×৭-৩)÷৫ = ১২

কঠিন: ৭×২+৩-৪ = ১৩

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

সঠিক উত্তরদাতার নাম

মহসিনা তাসনিম, সপ্তম শ্রেণি, শিবপুর হিন্দু গার্লস হাই স্কুল, হাওড়া; **সৌরীশ বিশ্বাস**, সপ্তম শ্রেণি, কোতুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁকুড়া; **অঙ্কন ঘোষ**, ষষ্ঠ শ্রেণি, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, কলকাতা; **অরিজিৎ ভট্টাচার্য**, অষ্টম শ্রেণি, বাঁকুড়া জিলা স্কুল, বাঁকুড়া; **তরুণিমা গঙ্গোপাধ্যায়**, ষষ্ঠ শ্রেণি, ধানাকুড়িয়া গার্লস হাই স্কুল, বসিরহাট; **নবমিতা দাঁ**, অষ্টম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা।